ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্‌, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৩শ ভাগ
২য় সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮১২
জ্যৈষ্ঠ—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মধুনা পয়সা চৈব সদেবাং স্তর্পয়েদ্দ্বিজঃ।
পিতৃন মধুঘৃতাভ্যাঞ্চ ঋচোধীতেচ যোন্বহং।

যে দ্বিজ প্রতিদিন ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি মধু ও দুগ্ধ দ্বারা দেবতাগণের এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবেন।

যজূংষি শক্তিতোধীতে যোন্বহং সদঘৃতামৃতৈঃ।
প্রীণাতি দেবানাজ্যেন মধুনাচ পিতৃংস্তথা॥

যে দ্বিজ প্রতিদিন যথাশক্তি যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ণ করেন, তিনি ঘৃত এবং জল দ্বারা দেবতাগণের এবং ঘৃত ও মধু দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবেন।

সতু সোমঘৃতৈর্দেবাং স্তর্পয়েদযোন্বহং পঠেৎ।
সামানি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৃণাং মধুসর্পিষা॥

যে দ্বিজ প্রতিদিন যথানিয়মে সামবেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি সোমরস ও ঘৃত দ্বারা দেবগণের এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবেন।

মেদসা তর্পয়েদ্দেবানথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্।
পিতৃংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যা মন্বহং শক্তিতো দ্বিজঃ॥

যে দ্বিজ প্রতিদিন অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি মেদ দ্বারা দেবতাগণের এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃগণের যথাশক্তি তর্পণ করিবেন।

বাকোবাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চগাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাধীতে হি যোন্বহং।
মাংস ক্ষীরোদন মধু তর্পণং স দিবৌকসাং।
করোতি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৃণাং মধুসর্পিষা॥

যে দ্বিজ বাকোবাক্য (বেদের প্রশ্নোত্তর) পুরাণ, নারাশংসী [রুদ্রদৈবত মন্ত্র] গাথিকা ইতিহাস ও বারুণী প্রভৃতি বিদ্যা নিত্য অধ্যয়ন করেন, তিনি মাংস, দুগ্ধ, অন্ন, ও মধু দ্বারা দেবতাগণের এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবেন।

তে তৃপ্তা স্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ।
যং যং ক্রতু মধীতেসৌ তস্য তস্যাপ্নুয়াৎফলং॥

দেবগণ ও পিতৃগণ এই রূপ তর্পিত হইয়া তর্পণকারীর সমস্ত কামনা পূরণ করেন। তর্পণকারী যে ২ যজ্ঞবিষয় অধ্যয়ন করেন, সেই ২ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল তিনি প্রাপ্ত হন।

ত্রির্বিত্তপূর্ণ পৃথিবীদানস্য ফলমশ্নুতে।
তপসো যৎপরস্যেহ নিত্যং স্বাধ্যায়বান্ দ্বিজঃ।

যে দ্বিজ প্রতিদিন বেদ অধ্যয়ন করেন তিনি, তিনবার ধন ধান্যপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী দানের এবং উচ্চ তপস্যার ফল প্রাপ্ত হন।

ক্রমশঃ

পরকাল।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কৌশল অবলোকনে পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার মহিমার অনুভব হয়। পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্ভূত-অবনী মণ্ডল বহুবিধপ্রাণীতে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে মানব জাতি প্রধান, কিন্তু তাঁহারাও বিপুল বুদ্ধি ও আধিপত্য সত্বেও করাল কাল কবল হইতে নিস্তারের উপায় বিধানে সক্ষম হন নাই। ধরাতলে কিয়তকাল সুখাদি ভোগ করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, স্থূল দেহ প্রাকৃতিক উপাদানে গঠিত থাকা নিবন্ধন ক্রমশঃ পুষ্টি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, জরা প্রভৃতির আয়ত্ত হইয়া পরিশেষে ভৌতিক পদার্থেই বিলীন হয়।

দেহরূপ পুরীতে উৎপত্তি হেতু জীবাত্মা পুরুষ নামে অভিহিত। প্রথমতঃ জটরস্থ জরায়ুতে সঞ্চারণ, পরে গর্ভ যন্ত্রনা মুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, অহঙ্কারাদি রিপুবিশেষের পরতন্ত্র হইয়া, দুশ্ছেদ্য মায়া চক্র-পাশে ঘূর্ণিত ও জড়িত হন। ক্রমে বহুবিধ পুণ্য-পাপাত্মক কার্য্যে রত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন, এইরূপে জীবন যাত্রা অবসান হইয়া যায়।

জীবাত্মার কখন লয় নাই সুতরাং কার্য্য-জনিত ফলাফল অনতিক্রম্য। কলেবরত্যক্ত হইলে—আমার কি গতি হইবে এবং কোন্ পুরিতে অধিষ্ঠান হইবে এতাদৃশ পারলৌকিক ভাবনা চিত্তমধ্যে স্বতই উদয় হইয়া থাকে। নির্জীব স্পন্দহীন, স্ফূর্ত্তিশূন্য হিমাঙ্গ কলেবর নিরীক্ষণে ঘোরতর বিভৎসরসের উদ্রেক হয়, প্রণয়াসক্ত আত্মীয় বান্ধবগণ বিরহানলে সন্তপ্ত হইয়া শোকাশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন, পূর্ব্বদীপ্তিপুঞ্জ অন্তর্হিত হয়, অনতি-কাল মধ্যে প্রথানুযায়ী চিতানল সজ্জিত ও প্রজ্বলিত অথবা কবর-গহ্বর খনিত ও প্রস্তুত হইলে এবং এইরূপে মৃত দেহ শ্মশানাভিমুখে নীত হইলে প্রচলিত শাসনানুসারে তাহার সতকারাদি হইয়া থাকে। শরীরের গতি এই রূপ বিহঙ্গমাবাসতুল্য, প্রাণ পক্ষীটি উড়িয়া গেল, আর সব যেন মিটিয়া গেল।

কিন্তু আত্মা অমর ও অবিনশ্বর। সুকৃতি দুষ্কৃতির তারতম্যানুসারে জীবাত্মার পারত্রীক গতি (ফলাফল) অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য পুণ্যাত্মারা স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধাম লাভ করেন. কুকর্ম্ম নিরত নরাধমেরা নীরয় গামী হইয়া থাকে। অবনী মণ্ডলে বহুবিধ ধর্ম্ম শাসন প্রণালী বা উপাসনা পন্থা প্রচলিত। তন্মধ্যে সমস্তই ধর্ম্ম সম্প্রদায় ঈশ্বর পরায়ণ। তাঁহাদের সকলেরই পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস, কেবল দুরাচার পাষণ্ড নাস্তিকেরা পরলোকের অস্তিত্ব অলীক জ্ঞানে সিদ্ধান্তকরে, যে ইন্দ্রীয়াদির অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের স্থায়িত্ব আকাশকুসুমবৎ কাল্পনিক। উন্নতি, অবনতি, সুখ, দুঃখ সমস্তই ইহ কালে ঘটিয়া থাকে। অপরিণাম দর্শী নরাধমেরা প্রাচীন ঋষি প্রণীত সংহিতাদিতে দোষারোপ পূর্ব্বক এই প্রচার করে যে, ধূর্ত্ত মতি শঠ আর্য্যেরা সরল-হৃদয় ব্যক্তিগণের প্রলোভনার্থ কৃত্রিম ব্যবস্থা সকল রচনা করিয়াছে, ব্রাহ্মণেরা প্রবঞ্চক, নচেৎ পরকালাদি সমস্তই অলীক। ইদানিন্তন কতশত আর্য্যকুলতিলক সদ্বংশোদ্ভূত সুশীল মতি যুবকেরা পাষণ্ডদের কুতর্ক জালে পতিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মে জলাঞ্জলী প্রদান পূর্ব্বক নীতি ভ্রষ্ট হইয়া কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে পারত্রীক অস্তিত্ব জাজ্জ্বল্যমান রূপে প্রতীত হইবে।

নিভৃত নির্জ্জন স্থানে অবিচলিত চিত্তে ধ্যান মগ্ন হইয়া বিশ্বরচনা কৌশল ও তৎ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ও সুশৃঙ্খলতা পর্য্যালোচনে ঐশ্বরীক ও পারলৌকিক অস্তিত্ব বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম এবং অবিকল প্রত্যক্ষ বিষয়ের ন্যায় অনুভূত হন, বাস্তবিক সৃষ্টি প্রকরণের নৈপুণ্য ও উদ্দেশ্য দেখিয়া পারত্রীক ভাব অস্বীকার করা নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ভাব, মন হইতে অপসৃত হইলে, সংসারাশ্রম তমসাচ্ছন্ন, বিভীষিকা পূর্ণ ও অসার বোধ হইবে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর অনিশ্চিত দন্দজ ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ হইবে,

যেন সর্ব্বত্রে স্বেচ্ছাচারিতা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিরাজ করিবে।

বিশ্বপতির নিয়মাবলী পালনে যাদৃশ সুখ, তল্লঙ্ঘনে তদ্রূপ দুঃখ স্পষ্টভাবে স্বতঃ পরতঃ উপলব্ধি হয়, সত্ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে আত্ম-প্রসাদ, ও দুষ্কর্ম্ম আচরণে আত্মগ্লানি, স্বভাবতই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং তত্তৎ ক্রিয়া জনিত ফলাফল অপ্রতিবিধেয়ঃ, শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন যথা " অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং "।

কার্য্য কারণ ভাব (causation) আন্দোলন করিলে সর্ব্ব মূলাধার পরমাত্মার অস্তিত্ব ও পরকালের স্থায়িত্ব যুগপৎ অবলীলাক্রমে হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্রিক্ত হয়। ন্যায় অন্যায় কার্য্যোৎপন্ন ফলাফলের দুর্নিবার্য্যতা নিবন্ধন, ভাবী পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য্য।

বাহ্য জগতে নৈসর্গিক পদার্থ সমুদয়ের সংযোগ, বিয়োগ, সন্নিবেশ, শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা আদির তারতম্যানুসারে ফলাফল সংঘটিত হওয়া যাদৃশ প্রত্যক্ষগোচর হয়, তদ্রূপ অন্তর্জগতস্থ সূক্ষ্মতম বিষয়ের গতি প্রবাহ অনুসারেও সুফল কুফল ইত্যাদি সম্পন্ন হওয়াও অনুমান সিদ্ধ ও যুক্তি মূলক।

সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের সমক্ষে মানসিক ভাব ও কার্য্য গোপন করা অসাধ্য, পাপ-পুণ্যাদির বিচারের কর্ত্তা, সর্ব্বত্রে সাক্ষী স্বরূপ, সুগতি দুর্গতির বিধান করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া ভাবী জীবন সম্বন্ধে সংশয় করা বড়ই ধৃষ্টতার কার্য্য। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উচ্চবৃত্তির গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দুর্নিরীক্ষ বিষয়ের বিশ্লেষণেও কোন অপেক্ষা থাকেনা। কোন ২ ধীশক্তি সম্পন্ন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জড় জগতের ভৌতিক উপাদানের অস্থায়িত্ব সপ্রমাণে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তির অনস্তিত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম নহেন, প্রত্যুত আত্মভাব কখনই অপনীত হইবার নহে। এ ভাব অনাদি কাল অবধি বিরাজমান; সুতরাং তদীয় ভাবী সত্তা (future existence) নির্ব্বিশেষে প্রতিপন্ন হয়। অতএব আত্মার উত্তরকালীন অবস্থায় হেতু তাঁহার ফলাফল অবশ্য ঘটিবে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। উদ্ধত স্বভাব কলুষিত বুদ্ধি কুমার্গাবলম্বী নীচাশয়গণের ভ্রম প্রমাদে পড়িয়া কি ধর্ম্ম জগত মুগ্ধ হইবেন? পরকাল না মানিয়া কি স্বেচ্ছাচারী হইবেন? কখনই না। যাহারা ঈশ্বর পরায়ণ নহে, তাঁহারা পরকালের ধার ধারে না—দুরাশয়েরা কেবল নিকৃষ্ট জঘন্য উদর পূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করাকেই [ঐহিক] জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন বোধ করেন? জন্মান্তর মিথ্যা," খাও, পান কর আমোদ কর"।

এরূপ আধুনিক দলের অভাব নাই। অপরিণামদর্শী, সঙ্কীর্ণ পথাবলম্বী দুরাত্মাগণের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ ভিন্ন যেন কিছুই নাই। ফলতঃ অসীম সৃষ্টিকাণ্ডের অন্তর্গত অসংখ্য সৌর জগৎ লোক এবং প্রাণী থাকাও অসম্ভব নহে এমনকি কত ২ উন্নততর প্রতিভা শালী জীবাত্মা অদৃষ্ট লোকে বিচরণ করিতেছে, তাঁহাদের মনোরম পবিত্র আবাস ভূমি, ও সুখ সচ্ছন্দতার সম্ভোগে আধিক্য হয়, তা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতেও সক্ষম নহি। মন বিজ্ঞান বিশারদ ঋষি প্রণীত সংহিতাদি পাঠে উৎকৃষ্টতম লোকের নিদর্শন প্রতীয়মান হইতেছে। এত বিষয়ে প্রতীতি না করা অতীব গর্হিত, এদিকে স্থূল হইতে স্থূলতম ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম কতশত জীব ও পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অন্তর্জগতের কত গুরুতর রহস্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিজ্ঞানাদি ইহার প্রচুর প্রমাণ, যে রূপ অতীতকালীন পদার্থও সংবলা উপকরণের লঘুত্ব গুরুত্বাদি ভেদে নিসর্গ অবশ্য প্রক্রিয়া বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া পর্য্যায়ক্রমে স্বতন্ত্র ২ আকৃতি, রূপ, ও ভাব প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ বর্ত্তমান কালীন পদার্থাদিও গুণ ইত্যাদির তারতম্যানুসারে

পৃথক ২ অবস্থায়, ভিন্ন ২ অবয়বে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, অবিকল তদ্রূপ ভাবে সুকৃতি দুষ্কৃতির ন্যুনাধিক্যানুসারে কর্ম্ম জনিত ফলাফল জীবাত্মা, অবস্থা বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া ভোগ করিয়া থাকে, ইহা যেমন যুক্তি সঙ্গত, তেমনি অনুমান সিদ্ধ। আবার অতীত কালীন কার্য্যাদির ফলাফল যে রূপ বর্ত্তমান কালে প্রকাশ পায়, সেই রূপ বর্ত্তমান কালের কার্য্য সকলের ফলাফল ও ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে কার্য্য কারণ ভাব, এবং গুণের পরিমাণ অনুসারে অবস্থা বিশেষে, জীবাত্মারও অন্তর্জগতে বিরাজিত ও প্রবর্ত্তিত হওয়া কোন অংশে বিচিত্র নহে। ফলতঃ আনুমানিক বিচার দ্বারা দূরতম ও সুক্ষ্মতম অদৃষ্ট ব্যাপারাদি নির্ণয় করা অসাধ্য নহে।

পরকাল শব্দ কর্ণ গোচর হইলেই যেন কোন বিস্তীর্ণ ইষ্ট অনিষ্ট পূর্ণ আধার বা আকরের ধারণা হয়। সুখপ্রদ চিত্তরঞ্জন সামগ্রী পূর্ণ স্বর্গ ধাম বা দুঃসহ যন্ত্রনা বিশিষ্ট নরক। যাহা হউক, ভূমণ্ডলস্থ প্রায় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ীরা কোন না কোন আকারে পরকালে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

আর্য্যদিগের, ক্রীয়াকলাপ আচার ব্যবহার, ব্রত পরহিতৈষিতা, দয়া, দাক্ষিন্য ইত্যাদি দেখিলে ধরাতলে আর্য্যাবর্ত্ত সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম ভূমি ইহা নিঃসংশয় বোধ হইবে। পারত্রিক মঙ্গল বিধানার্থ আর্য্যকুল চূড়ামণী মহাত্মারা যাগ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, মানবলীলা সম্বরণ করিলে ও পারলৌকিক সদ্গতি উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পন এবং মন্ত্রপূত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রাচীনকাল অবধি যুগযুগান্তর পরম্পরা ইত্যাকার বিশুদ্ধ প্রথা সকল ভারতবর্ষে প্রচলিত। ফলতঃ যে পরকালের অস্তিত্ব বিশ্বাস অনাদি কাল হইতে সর্ব্বত্রে প্রবর্ত্তিত ইহা কি অমূলক হইবার সম্ভব? বহুজনপদ ও জাতি সম্মত ব্যবস্থা ও মত অখণ্ডনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

ধরাতলে এবম্প্রকার ঘোর নীচাশয় দর্নীত লোকের অভাব নাই, যাহারা নরহত্যা, অপহরণ প্রবঞ্চনাদি অপরাধে লিপ্ত থাকিয়াও সচ্ছন্দ শরীরে পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, লোক সমাজে সতর্কভাবে ব্যবহার করে, প্রকাশ্য রূপে তাহাদের অনুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না, সাধারণের সমক্ষে সমাদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সে সব মহাপুরুষেদের দুরভিসন্ধি বুঝা সুকঠিন। অন্তর পাপে বিষাক্ত ও কলুষিত, বাহ্যিক ঠিক যেন সাধু প্রকৃতি, এ সব লোকেরও পরকালের নাম শুনিয়া হৃৎ কম্প হয়। তখন এই চিন্তা উপস্থিত হয়, যে সর্ব্ব ঘট অধিষ্ঠাতা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ বিভূ বিচার পূর্ব্বক অবশ্যই প্রতিফল ও শাস্তি দিবেন, আসন্নকাল উপস্থিত হইলে তাহাদের বদন নিঃসৃত আক্ষেপ ধ্বনি শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এরূপ পরিতাপের দৃষ্টান্তের অভাব নাই

পরকালের যাথার্থ্য সম্বন্ধে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্র নিদর্শন, এবং বেদ বাক্য তদীয় অমোঘ অটল মূলভিত্তি। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষী নির্ম্মল প্রতিভা সম্পন্ন ঋষিরা যে সকল বচন লিপীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদয় সংযুক্তি ও সদুপদেশ পরিপূর্ণ, সে সব ঋষিদের মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের কোন স্বার্থ ছিল না, যাহার উপদেশ পালনে মহীয়সী কীর্ত্তি ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় এতাদৃশ শাস্ত্র কখনই ভ্রম শঙ্কুল হইবার নহে!

এতদ্দভিন্ন আর গুরুতর নিদর্শন কোথায়? বিচিত্র কারু কার্য্য সমন্বিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহপুরী, ভৌতিক ও মানসিক উপাদানে নির্ম্মিত, দুর্লভ দেহ পবিত্রতম মহাতীর্থ বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। এতাদৃশ কমনীয় মন্দির নিহিত মনো বৃত্তি সমুদয়ের অধীশ্বর ও নায়ক আত্ম—বিবেক (conscience) চৈতন্য ও সাক্ষী স্বরূপ, আন্তরিক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় প্রভাবে সমগ্র

বিষয়ের অধিষ্ঠাতা দর্শক ও উপদেষ্টা। এই সমুজ্জল বিমল আত্ম জ্ঞানালোকের অবলম্বনে ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইয়া চরমে কৈবল্যধাম লাভ করা যায়। উক্ত আত্ম—বিবেক, অজ্ঞান কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইলে অবনতিমার্গে অধঃ পতিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়। আত্ম তত্ত্বের অনুশীলনে ও সাধনে হিতাহিত জ্ঞান জন্মে, নীচাশয়তা অপনীত হয়, এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। স্বকীয় গৃহে এরূপ অমূল্য নিধি সত্ত্বে উপায়ান্তরের প্রয়োজন কি? সে অক্ষয় দীপ্তি পুঞ্জের কণা মাত্র পাইলে আর ভাবনা কি?

কি প্রাচীন কি আধুনিক, সমগ্র জগৎ যখন একস্বরে ভাবী কালের স্থায়িত্ব স্বীকার করিত, তখন কতিপয় অদূরদর্শী স্বার্থপর সংকীর্ণ প্রথাবলম্বীর প্রতারণা জালে মুগ্ধ হইয়া, কি সারাৎসার পরকাল তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে ধর্ম্ম জগৎ বঞ্চিত থাকিবেন?

সেই বিশ্ব প্রভা-করের অনুমাত্র প্রভাচ্ছটা হৃৎকমলে বিকীর্ণ হইলে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক মহত্ তত্ত্ব উদ্ভাবন করা অসম্ভব নহে, বিশুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞানের আনুকূল্যে মন সহজে সত্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, বৃথা সংশয় ভঞ্জন হইয়া যায়। ফলতঃ সমাহিত চিত্তে শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্যে মনোনিবেশ করিলে, এবং কার্য্য কারণ উপমা দেখিয়া বিবেচনা করিলে,—পরকাল বিষয়ে কোন দ্বিধা থাকে না।

সময়ে২ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থ নির্ন্নয়ার্থ ভ্রম ও সন্দেহ উত্থাপিত হয়, সে স্থলে অপরোক্ষ অদৃষ্ট বস্তুতে তর্ক ও সমস্যা উত্থাপন হইবে ইহা আশ্চর্য্য কি? অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু গণ প্রশ্নকরিতে পারেন পরকালের লক্ষণ কি? পরকালে কি ঘটিবে? পরব্রহ্মেলয় বা মুক্তি কিম্বা সদ্গতি বা স্বর্গ-সুখ অথবা দুর্গতি বা নরক যন্ত্রনা? তদুত্তরে ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ যে মুক্তি বা কৈবল্য সর্ব্বোচ্চ, সে নিত্যধাম হইতে কাহাকেও স্খলিত হইতে হয় না, নচেৎ অন্য ২ অবস্থায় পুনর্জন্ম সম্ভাবিত। স্বর্গাদি রূপ স্তরে আরোহন করিলে, হয় ত দেব দুর্ল্লভ রম্য নিকেতনে বাস ও সুখসেব্য সামগ্রী, সম্ভোগ হয়। এবং ভোগান্তে পুনঃপতন সম্ভাবনা। কিন্তু নির্ব্বাণ রূপ ধাম প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম ফল একেবারে সমূল উন্মূলিত হইয়া যায়।

স্থূল কথা এই যে, মানবকুল দুর্ল্লভ দেহ ধারণ করিয়া ক্রমশঃ পবিত্রতা সোপানে অধিরূঢ় হইলে বিমল আনন্দ উপভোগ করে, কিন্তু নীচ বৃত্তি—প্রবণ হইলে কলুষানলে দগ্ধ হইয়া যম যন্ত্রনা সহ্য করিতে হয়। হৃদয় পবিত্র রাখিলে পর্ণ কুটীরও অশেষ প্রীতিকর ও বিভূতির আকর হয়, পক্ষান্তরে হিরণ্য রত্নাদি খচিত সুরম্য অট্টালিকাও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

যৎকালীন নির্দ্দয়, দুর্দ্ধর্ষ দুরাত্মার ও নৃশংসের উৎপীড়নে মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ হয়, ও হৃদয় জর্জ্জরীভূত হয়, অর্থ গৃধ্নু দুরাচারের ব্যবহারে ও দুর্ব্বিসহ যন্ত্রনায় সর্ব্বসান্ত হইতে হয় সম্মান লোলুপ দুর্ম্মতি পামরদের ঈর্ষা ও বৃথা তিরস্কারে প্রাণ ব্যথিত হয়, অভ্যুদয় আশা স্তিমিত হয়, অন্তরে যখন অন্য প্রবোধ মানেনা তৎকালে একমাত্র অন্তিম ভরসা কেবল পরকাল। সৎপথে থাকিলে ভূত ভবিষ্যত সর্ব্ব-যোগাধিপতি বিপদ-ভঞ্জন, হরি বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক পরম শান্তি বিধান করিবেন, ইহাই একমাত্র ভরসা বিপদের সময় ঈশ্বর ও পরকাল শান্তনা ও প্রবোধ দায়ক।

পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রখর ও অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত হয়, অভিমান খর্ব্ব হয়, স্বার্থপরতার হ্রাস হয়, কুকর্ম্মে আশঙ্কা, এবং মায়াময় সংসারে তুচ্ছ জ্ঞান হয়। উচ্চ প্রবৃত্তি-রজ্জুতে আকৃষ্ট হইলে মহত কার্য্য সম্পাদনে মন ধাবিত হয়, তাই পরকালে ইষ্ট সিদ্ধ হইবে এই আশয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া আর্য্যকুল চূড়ামণী বীর পুরুষগণ সমরাঙ্গনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—সুধাময় পারলৌকিক ভাবে গদ্গদ হইয়া—স্বদেশ রক্ষার্থ বিষাক্ত তীব্র বাণ প্রবাহের

সম্মুখীন হইয়াছেন। লোকহিতৈষীতায় উন্মত্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝম্ফ প্রদানে কাতর হন নাই, ঐহিক সামান্য সম্পত্তি দূরে থাকুক, সসাগরা বসুন্ধরার সাম্রাজ্য ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যে সকল মহোদয়েরা ঐহিক বাসনা বিটপিমূলে কুঠারাঘাত পূর্ব্বক ভাবী সদগতি রূপ জীবন বৃক্ষে আকৃষ্ট হইয়া ভীষণ বিঘ্ন রাশী অতিক্রম করতঃ একমাত্র ভগবানকে পরম পদার্থ স্থির করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় তাঁহারা ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবেন, ও দুঃখহারী ভগবান্ তাঁহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে কুল দিবেন সন্দেহ নাই, তাঁহাদের সুখ প্রবাহ চিরস্থায়ী হইবে, বিশ্বাসের কি অপার মহিমা, পরকালে বিশ্বাস গাঢ় হইলে অন্তরে ঐশ্বরীক প্রেমের উদ্দীপন হয়, এবং অনায়াশে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যাঁহারা জীবন সার্থক করণার্থ আগ্রহ প্রকাশ করেন, ইহ জন্মে-দুরাশয় সংসার ক্ষেত্রোৎপন্ন পাপরূপ কণ্টকের মূল উৎপাটন পূর্ব্বক পুণ্য বীজ রোপন করা তাঁহাদেরই কার্য্য, উক্ত বীজ ক্রমশ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখা প্রসারণ পূর্ব্বক বৃহদাকার বিটপিরূপে পরিনত হইলে শেষে তাঁহারাই তাহার অমৃতময় ফলের আস্বাদনে অধিকারী হইয়া পরম আনন্দ ভোগ করিবেন; যাহারা পরকাল মানেনা তাহারা মরু ভূমির কৃষকের ন্যায় হতাশা হইয়া থাকে, কেবল পরকালে বিশ্বাস না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ।

স্বধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দুদের পরকালে বিশেষ আস্থা। শাস্ত্র নিহিত ব্যবস্থা সমূহ রীতি নীতি পালন পূর্ব্বক তাঁহারা ব্রত, ক্রিয়া কলাপ শ্রাদ্ধ ও অন্য ২ সংস্কার সমাধা করিয়া থাকেন, জীবাত্মার মঙ্গল উদ্দেশে বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, এমন কি জীবন অবসান হইলে প্রেতত্ব মোচনার্থ অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া ও পিণ্ডাদি দান, এবং দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া দ্রব্যাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে, শরীর নাশে আত্মার লোপ হয় না, ইত্যাকার সংস্কার আর্য্য হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে বলিয়াই যত কিছু সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান। প্রতিভা সম্পন্ন ঋষীগণ স্বয়ং সে সকল সাধু তত্ত্বের মীমাংসক। ভাবী জীবনের কল্যাণ সম্পাদনার্থ প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, স্থূল কথা এই যে মানসীক ও শারীরিক পবিত্রতা সমাধানার্থ শাস্ত্রকার গণ বহুবিধ নিয়মাবলী সংস্থাপন করিয়াছেন। আবার কোন ২ ধর্ম্মাবলম্বীর পাপক্ষয়ের জন্য পরিতাপ, অনুতাপাদি বিধান করিয়াছেন, ইঁহাদের সকলের মত ও উদ্দেশ্য মহত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব জন্মার্জিত সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলাফল অপ্রতিবিধেয়, ইহা প্রায় প্রাচীন ও নব্য সভ্য দেশীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন, এবং তাঁহারা অনেকেই পুনর্জন্ম মানেন, এ সব বিষয়ে উদাহরণের অসদ্ভাব নাই।

বহুকাল ব্যাপী হিন্দু ধর্ম্মের ইয়ত্তা করা ও আমূল তত্ত্ব নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। প্রলয়, জল প্লাবন, শত্রুগণের আক্রমণ, অভিনব মতের প্রবর্ত্তন ও প্রচলিত মতের খণ্ডন, সময়ে২ পণ্ডিতগণের নিজ নিজ মত প্রচার ইত্যাদি নানা কারণে আপাততঃ স্থানে ২ শাস্ত্র সকল অযুক্তিকর বলিয়া বোধ হয়, পরন্তু ধীর সাধক প্রণিধান পূর্ব্বক এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্র সাগরে প্রবেশ করিতে ও সদুপদেশ পাইলে, বিলক্ষণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন। চার্ব্বাক ও আর ২ কুতর্ক বাদীর বাক্যজালে মুগ্ধ হইবেন না, এতদভিন্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি ও স্বপ্ন অবস্থায় ভূত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর আভাসও অন্তর্দৃষ্টিতে উদয় হইয়া থাকে, এবং এরূপ শত শত উদাহরণ প্রত্যক্ষ।

পারলৌকিক অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইলে আত্মার উৎকর্ষ সাধন শ্রেয়স্কর। যদ্দ্বারা সুখ-প্রবাহ স্থায়ী হয় ও দুঃখ নিরাকৃত হয়, তদ্রূপ উপায় অনুসরনে তৎপর হওয়া একান্ত বিধেয়। সাধন, ভজন, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদির অনুশীলনে চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা কুপ্রবৃত্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক আত্ম-সংযমে রত ও উদ্যোগী থাকিবে, ক্রমশঃ রিপু সকলকে জয় করিয়া, বৃথা স্পৃহা ও প্রলোভন হইতে অপসৃত হইতে যত্নবান হইবে। এই রূপে

শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরে অটল ভক্তি জন্মিলে, দিব্য জ্ঞানালোকের প্রভায়, চিত্তে অপার স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইবে, তখন ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নব ২ বিশুদ্ধ অনুরাগ দ্বারা একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য ও সত্য জ্ঞান হইবে, বন্ধন বাধা সব কাটিয়া যাইবে, সে সময় আনন্দ ধাম গমনে ও আত্মার সাক্ষাৎ কার সংঘটনে বেশী ব্যবধান রহিবে না, আস্তে২ জগৎ আত্মবৎ, শত্রু মিত্রবৎ ও জীবন্মুক্ত হইয়া, অর্থাৎ পবিত্রনীরে নিয়ত অবগাহন করিতে ২ সমাধি প্রাপ্তি হেতু কর্ম্ম বিপাক হইতে উদ্ধার পাইবে।

বিদ্যা ও বিদ্যাবান্।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

প্রকৃতি কি ?

প্রকৃতি কি, প্রকৃতি কিংস্বরূপ এ সম্বন্ধে আমরা যতটুকু চিন্তা করিলাম, প্রকৃতি কি এ প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার জন্য পরমারাধ্য পরাভক্তি ভাজন বিজ্ঞাননেত্র শাস্ত্র কর্ত্তা দিগকে জিজ্ঞাসা করায়, প্রত্যুত্তরে যাহা শুনিলাম, নিজের স্বল্প বিষয়-মতি, নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি সে জ্ঞান গম্ভীর সারতম বচনের, সে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ভাব ব্যঞ্জক অভ্রান্ত মীমাংসা বাক্যের মর্ম্ম যতদূর বুঝিতে পারিল, সে পবিত্র আপ্তোপদেশের তাৎপর্য্য যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইল, তাহাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে কার্য্য মাত্রেই সকারণ। কারণ শূন্য কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারেনা। কার্য্য দেখিলেই, কার্য্যের সত্তা উপলব্ধি হইলেই, তৎকার্য্য সম্পাদক কারণের সত্তা তৎ কার্য্য জনক হেতুর বিদ্যমানতা স্বীকার করিতেই হইবে। কার্য্য থাকিলেই তাহার কারণ আছে, উপলভ্যমান কার্য্য যে অকারণ হয়-নাই, এরূপ অনুমান অভ্রান্ত, এরূপ অনুমান অব্যভিচারী, এরূপ অনুমান স্বতঃ সিদ্ধ নিয়মেই হইয়া থাকে। জলদকুসুম-সম্পাত নিরীক্ষণ করিলেই, হৃদয় প্রকম্পক অশনিনির্ঘোষ শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইলেই, অচিরদ্যুতির, দিগ্বিভাসক, মৃদু মধুর চপলহাসি নয়ন গোচর হইবা মাত্রই গগনাবলম্বি জলধরের গভীর শ্যামল রূপ হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র করের উজ্জ্বল প্রখর বপু, জলাশয়ের প্রশান্ত মূর্ত্তি, বেগবান সদাগতির স্তিমিত আকৃতি, সকল গুলিই একে একে মনে পড়ে।

এরূপ হইবার কারণ কি? ধারা সম্পাতের সহিত ইহাদের এমন কি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে অশনি-নির্ঘোষের উপরি অচিরদ্যুতির চঞ্চল বিকাশের প্রতি ইহাদের এমন কি প্রাণের টান আছে, যে ধারা সম্পাতকে দেখিতে যাইলেই ইহারাও দৃষ্টিপথে আসিয়া উপস্থিত হয়? যে ইহাদিগকে না ভাবিয়া, ইহাদিগকে মনে না আনিয়া নিছক আসার পাতের চিন্তা করা, অনন্য সম্বন্ধ বৃষ্টি পাতকে ভাবনা করা, কেবল মাত্র বজ্রধ্বনিকে ধ্যান করা অসম্ভব? আছে, প্রাণের টানই আছে, হৃদয়ের আকর্ষণই আছে। পিতা মাতার সহিত সন্তানের যে সম্বন্ধ, মৃত্তিকা কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদির সহিত ঘটের যে সম্পর্ক, অম্লজান যবক্ষার জানের সহিত (oxygen and nitrogen) বায়ুর যে রূপ আত্মীয় ভাব, বৃশ্চিক গোময়ের সহিত, বীজ অঙ্কুরের সহিত যে সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ, অক্ষর অব্যয় সচ্চিদানন্দের সহিত বিশ্বের যে সম্বন্ধ, ধারা সম্পাতাদির সহিত ইহারাও সেই নিগড়ে নিগড়িত, সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট। সমস্ত কার্য্যই এই রূপ আপন আপন কারণের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, নিখিল কার্য্যই এই রূপ সকারণ বুঝিলাম কার্য্য মাত্রই সকারণ, বুঝিলাম বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং ইহাও বুঝিলাম, কার্য্যের কারণ ও প্রকৃতি একার্থ বোধক * কিন্তু কার্য্য মাত্রেই

---

* জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ। পা ১। ৪। ৩০

জনেঃ কর্ত্তা জনি কর্ত্তা, জন্যর্থস্য জন্মনঃ কর্ত্তা [illegible] যা প্রকৃতিঃ কারণং হেতুঃ তৎকারকমপাদান সংজ্ঞং ভবতি। কাশিকাবৃত্তিঃ।

সকারণ এ কথার ঠিক অর্থ কি, কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধই বা কি রূপ ইহা, শাস্ত্র যতদূর বুঝাইয়াছেন তাহাতে বেশ পরিষ্কার রকম বুঝিতে পারা যায় নাই, এতএব আমরা তাঁহাদিগকে ইহার সন্তোষ জনক উত্তর পাইবার জন্য এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। কার্য্য মাত্রেই সকারণ এ কথার অর্থ কি?

শ্রুতি বলেন।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ." । অর্থাৎ ইদম্—এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ, অগ্রে—জগৎ এই নাম রূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বেও, ব্যাকৃত নাম রূপ-জগৎ, ব্যাকৃত অবস্থায় আসিবার আগেও বিদ্যমান ছিল, জগৎ কার্য্য স্বকারণে বিলীনছিল। প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, গগনস্পর্শি বট বৃক্ষ বৃক্ষাকারে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, বৃক্ষ এই নাম রূপ ধরিবার আগে, একে বারে সে ছিল না, তাহা নয়। ছিল, স্বকারণ বটবীজে বিদ্যমান ছিল, অব্যাকৃত অবস্থায় বাস করিতেছিল; সূক্ষ্ম বট বীজ, ইহাকে গর্ভে ধরিয়া রাখিয়াছিল, নিখিল কার্য্যই এইরূপ কার্য্য রূপে আমাদের বুদ্ধি গোচর হইবার আগে, অব্যাকৃত অবস্থায় বা স্বকারণে বিদ্যমান থাকে। শ্রুতি বচনের তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত অনভিব্যক্ত ও অভিব্যক্ত এই অবস্থা ভেদে কার্য্য ও কারণ এই নাম ভেদ হইয়াছে মাত্র। কার্য্য স্বরূপত কারণ হইতে বিকৃতি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে, কার্য্য-কারণ অভিন্ন-অনন্য। কার্য্য, কার্য্য রূপে প্রকটিত হইবার পূর্ব্বে, কার্য্য রূপে আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইবার আগে, যে কারণ রূপে বিদ্যমানছিল, এবং কার্য্য যে কারণ হইতে অনন্যঅভিন্ন, অর্থাৎ কার্য্যও যা কারণও যে তাহাই, শ্রুতির এই অমূল্য, এই সারাদপি সারতম জ্ঞান গম্ভীর পরম কল্যাণ প্রদ উপদেশ বচনের তাৎপর্য্য, সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার জন্য পরমকারুণিক ভগবান বাদরায়ণ স্বপ্রণীত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন নামক উপাদেয় গ্রন্থে যে সকল সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ক্রমশঃ।

প্রকৃতিরুপাদান কারণং ব্রহ্ম চ মায়াশবলং প্রকৃত্যুপাদান কারণম্। বৃত্ত্যা তু পদমপ্যুপাদান কারণ পরমেবোক্ত বোদ্ধ্যম্। শব্দেন্দুশেখর ইত্যস্মিন্ প্রকৃতি গ্রহণং হেতু মাত্র পরমিতি বৃত্তি কৃন্মতম। পতঞ্জলি পদোপাদা জায়ন্ত ইত্যুদাহরণাৎ উপাদান মাত্র রমিতি ভাষ্য কৈয়ট মতম্। তত্রাপি সাধারণ্যমুদাহরণ মাত্র, ব্রহ্মণঃ ইতি। (ব্রহ্মণঃ প্রজা জায়ন্তে সিদ্ধান্ত কৌমুদী) ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ সচ হেতুরেব নতূপাদানম্। কিন্তু মায়াশবলং ব্রহ্ম সর্ব্বকার্য্যোপাদানমিতি বেদান্ত সিদ্ধান্তঃ। মনোরমা।

পাণিনির বৃত্তিকার (কাশিকা নাম্নী বৃত্তি) প্রকৃতি শব্দের অর্থ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন প্রকৃতিঃ কারণং হেতুঃ অর্থাৎ প্রকৃতি শব্দের অর্থ কারণ হেতু। কাশিকাকারের প্রকৃতি শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া আপাততঃ মনে হয় যে তিনি প্রকৃতিকে নিমিত্ত কারণ অর্থেই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু মহাভাষ্যকার ভগবান পতঞ্জলি এবং টীকাকার কৈয়ট ইহাদিগের মতে প্রকৃতি শব্দ উপাদান কারণ বাচক।

ভট্টো দীক্ষিত সেই জন্য দুই মতই বজায় থাকে এরূপ উদাহরণ দিয়াছেন। "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতি এই পাণিনীয় সূত্রের ব্যাখ্যা বসরে তিনি বুঝাইবার জন্য উদাহরণ দিয়াছেন "ব্রহ্মণঃ প্রজা জায়ন্তে" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে ব্রহ্মণঃ এই শব্দে যে পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত হইল তাহার কারণ কি? পাণিনি দেব বলিয়াছেন জায়মান কার্য্যের যে প্রকৃতি (উপাদান বা হেতু মাত্রই) তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হইবে পাণিনি দেবের এই বচনানুশাসনে ব্রহ্ম শব্দ জায়মান কার্য্য "প্রজার" প্রকৃতি বলিয়া পঞ্চমী বিভক্তি পাইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে ব্রহ্ম এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের, উপাদান (সমবায়ি) কারণ কি নিমিত্ত কারণ? বেদান্তের "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যাং ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি, যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম।" এই শ্রুতি বচনের প্রমাণে বলেন, ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ; ব্রহ্ম ও তাঁহার মায়া (Absolute Reality and Relative Reality) হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ভট্টোজি দীক্ষিত বলেন এ মত গ্রহণ করিতে হইলে প্রকৃতি শব্দ উপাদান কারণ বাচক বলিয়া জানিতে হইবে, এবং ইহাই ভাষ্যকার ও কৈয়টের জানিতে হইবে, এবং ইহাই ভাষ্যকার ও কৈয়টের অভিমত। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহাদের মতানুবর্ত্তন করিতে হইলে বৃত্তিকার প্রকৃতি শব্দের যে হেতু "কারণ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন সেই নিমিত্ত মাত্র অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। শব্দেন্দু শেখর প্রণেতা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নাগেশ ভট্ট বলেন তাহা নয়। বৃত্তি কারের হেতু বা কারণ শব্দ উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করিতেছে।

জ্ঞানদেব চরিত।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া জ্ঞানদেব বীর মঙ্গলকে তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ দিলেন। বীর মঙ্গল নব জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার আর এ নশ্বর দেহে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি জ্ঞানদেবের পদতলে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। জ্ঞানদেব নিজ হস্তে বীর মঙ্গলের দেহকে সমাধিস্থ করিলেন। এই স্থানে বীর মঙ্গলের স্মরণার্থে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইল। এবং তাহার মধ্যে মঙ্গলেশ্বর মহাদেব স্থাপিত হইলেন। উজ্জয়নীতে দুই দিন অবস্থিতি করিয়া জ্ঞানদেব সাধুগণ সহ প্রয়াগ ধামে যাত্রা করিলেন। এখানে উপনীত হইয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিলেন। পরে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ও লোপামুদ্রার স্থান দর্শন করিলেন। এই স্থানে তিন দিন থাকিয়া জ্ঞানদেব ভক্তগণ সহ কাশী ধামে গমন করিলেন। এই সময়ে, কাশীধামের মুদ্গল আচার্য্য একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে বড় ২ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর এই অনুষ্ঠান সমাধা হইতেছিল। যে সকল পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন সকলেই মহাজ্ঞানী, কে বড় কে ছোট তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সুতরাং, অগ্রে কাহাকে অভিবাদন করিবেন মুদ্গল আচার্য্য স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে, একটী কৌশল অবলম্বিত হইল। তিনি একটী হস্তীর শুণ্ডে এক গাছি মালা পরাইয়া দিলেন এবং এই স্থির করিলেন যে সে যে ব্যক্তির গাত্রে তাহা ফেলিয়া দিবে সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাগ্রে পূজা পাইবে। হস্তী মালা ধারণ করিয়া নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু, কোন ব্যক্তির গাত্রে তাহা ফেলিয়া দিল না, এমন সময়ে জ্ঞানদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র হস্তীটী তাঁহার অঙ্গে মালা পরাইয়া দিল এবং ভূমে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মুদ্গল আচার্য্য, জ্ঞানদেবের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানের সহিত যজ্ঞের মধ্য স্থলে বসাইলেন। ইহা দেখিয়া অন্যান্য পণ্ডিত রোষ-পরতন্ত্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন—এ কোন্ কথা, হস্তী এই ব্যক্তির গাত্রে মালা ফেলিয়া দিয়াছে বলিয়াই কি ইনি সকলের অগ্রে পূজা পাইবেন? পশুর জ্ঞান কি? তাহার কি ভাল মন্দ বিবেচনা আছে? কে বড় কে ছোট এ বিচারের ভার কি তাহার উপর দেওয়া উচিত? এই সকল কথা শুনিয়া নামদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে কোন ব্যক্তি অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য? মণ্ডলীর মধ্য হইতে এক জন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন যে যিনি যজ্ঞের পুরোডাশ লইয়া গিয়া বিশ্বেশ্বরকে খাওয়াইতে পারিবেন তিনিই সর্ব্বলক্ষণে শ্রেষ্ঠ, বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এ কথা শুনিয়া কোন পণ্ডিতই অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে, জ্ঞানদেব পুরোডাশ হস্তে লইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলেন। অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। পরে, মন্দির প্রবেশ করত বিশ্বেশ্বরের সমক্ষে দাঁড়াইয়া কর-যোড়ে নিবেদন করিলেন—হে প্রভো! আমি তীর্থ দর্শন জন্য এখানে আগমন করিয়াছি। যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সকলের অগ্রে পূজা গ্রহণ করিব আমার এরূপ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিভো! তুমিই হস্তীর দ্বারা এই মালা গাছটী আমার অঙ্গে পরাইয়া দিয়াছ, সুতরাং ইহা তোমার ইচ্ছা যে আমি সকলের অগ্রে পূজা প্রাপ্ত হই। অতএব নিবেদন এই যে, আমার হস্ত স্থিত পুরোডাশ তুমি ভক্ষণ কর। জ্ঞানদেবের প্রার্থনা শেষ হইবা মাত্র, বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা সহ, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দেখিবা মাত্র, জ্ঞানদেব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পরে বিশ্বেশ্বর, জ্ঞানদেবের হস্ত হইতে পুরোডাশ ভক্ষণ করত অন্তর্হিত হইলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল, জ্ঞানদেব যে ঈশ্বরের অবতার তাহা সকলে স্থির করিল

এবং ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহারা তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিল, তদনন্তর সকলে যজ্ঞ ভূমিতে উপনীত হইল। চারি দিক্ হইতে জয় জয় ধ্বনি উপস্থিত হইতে লাগিল এবং আপামর সাধারণ জ্ঞানদেবকে পূজা করিতে লাগিল। তখন মুদ্গল আচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, যেমন শুক্রাচার্য্যের আগমনে ধর্ম্ম রাজার যজ্ঞ পূর্ণ হইয়াছিল সেই প্রকার জ্ঞানদেবের আবির্ভাবে তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। জ্ঞানদেব কাশী ধামে সাত দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রামানন্দ স্বামী ও কবির কর্ত্তৃক তিনি সমাদর পাইয়াছিলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে, দত্তাত্রেয়, মৎস্যেন্দ্র এবং গোরক্ষনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে তাঁহার দ্বারা ভক্তি মার্গ প্রকাশিত হইবে এবং লোকে মুক্তি লাভ করিবে। ইহার পর জ্ঞানদেব প্রভৃতি কাশীধাম ত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মোৎসব।

কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় গত ১২ চৈত্র ধুবড়িতে শুভাগমন করিয়া প্রায় ২০ দিবস পর্য্যন্ত এস্থানে অবস্থিতি করিয়া অত্রত্য বিজনীহলে ক্রমান্বয়ে গত ১৩ ও ১৪ চৈত্র "আমরা ও আমাদের," ১৫ চৈত্র আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন, এবং ১৬ চৈত্র প্রাতে ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে নগর সংকীর্ত্তন হয়; ঐ দিবস বৈকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ লাল বাগচি মহাশয়ের উদ্যোগে, শ্রীযুক্ত কৃপানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় "হিন্দু ললনার কর্ত্তব্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৭ চৈত্র "সনাতন ধর্ম্ম" ২০ চৈত্র "উপাসনা" ২১ চৈত্র "সাকার ও নিরাকার" ও ২২ চৈত্র "কৃষ্ণলীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার মনোহারিণী ও ভক্তি ভাবময়ী জ্বলন্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়, অতি কঠোর নাস্তিকের হৃদয়ও বিচলিত হয় এবং সনাতন আর্য্যধর্ম্ম কুসংস্কারাপন্ন পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলিয়া যে সকল অহিন্দুর বিশ্বাস, তাঁহাদের কুসংস্কার রূপ হৃদয় কবাট উন্মোচিত হয়। কুমার কৃষ্ণ প্রসন্নের বক্তৃতার নূতন পরিচয় কি দিব? তাঁহার বক্তৃতা বাহিরে খর স্রোতে প্রবাহিনীর ন্যায় অজস্র অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু ভিতরে অন্তঃ সলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ অথচ প্রাণ মন মুগ্ধ করিয়া কখন হাসি কখন কান্নার স্রোতে ডুবাইয়া দেয়। যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহারা জানেন যে, সে বক্তৃতার মনোহারিণী শক্তির গুণে অহিন্দু বা উপধর্ম্মীর হৃদয়ে কি আবর্ত্ত উপস্থিত করে। যিনি ক্ষণেকে হাসাইতে, ক্ষণেকে কাঁদাইতে পারেন, তাঁহার শক্তি কিরূপ, তাহা গুনি গণ বুঝিতে সক্ষম। "সাকার ও নিরাকার" "আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র" ও "সনাতন ধর্ম্ম" এই দীর্ঘকাল ব্যাপী বক্তৃতা ত্রয়ে আর্য্য ধর্ম্মের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া আর্য্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও মহত্ত্ব, ঋষিগণের অলৌকিক জ্ঞান ও সাধন তত্ত্ব অতি সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অবশেষে "কৃষ্ণ লীলায়" ভগবানের অবতারের প্রয়োজনীয়তা ও তাঁহার লীলাবর্ণন এবং তাহাতে ভগবানের যে গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা অতি পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করেন। কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বলিয়াছেন, "প্রকৃতি যখন নিজসত্য প্রকাশ করিতে পারেন না, যখন সেই সত্য মলিন হইয়া যায়, তখন ভগবান্ আসিয়া তাহার মলা পরিষ্কার করিয়া, তাহা পরিস্ফুট করেন। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতির নির্ম্মলতা সাধন করিবেন কেন? তোমার আমার তাহা বুঝিবার বা সমালোচনা করিবার সামর্থ্য নাই। তাঁহার গুহ্য পেটিকা মধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত আছে, তিনি দয়া করিয়া দেখাইয়া না দিলে কে দেখিতে পায়? সাধক গণ যখন তাহার গুহ্য তত্ত্ব দেখিবার জন্য আকুল হন তখন তিনি তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত, ভক্তের প্রাণের পরিতোষ জন্য

দেখাইয়া দেন। প্রহ্লাদ যখন ব্যাকুল হইয়া তাঁহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে দেখা দিয়া ভক্তের পরিতোষ সাধন করিয়াছিলেন। অবতারের প্রয়োজন কি না, তাহা ভক্তের তত্ত্ব পাঠ করিলে বোধগম্য হইবে। "অতঃপর তিনি বলেন যে এই শ্রীকৃষ্ণাবতারই ভগবানের পূর্ণাবতার; এই পূর্ণ রূপে জগতের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা দেখাইবার জন্য কৃষ্ণাবতারের অবতারণা। যাত্রার দলে যে কৃষ্ণ দেখা যায়— তাহার মধ্যে কোন সারত্ব নাই। মহামুনি বেদব্যাসের লিখিত যাহা তাহাই ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব; ভাগবতে যে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাঁহার বিষয়ই বক্তব্য"। তৎপরে বলেন যে "কামের দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ও গুহ্য রূপে অনাসক্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজলীলা করিয়াছিলেন; বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে ভগবানে উপাসনা হয় বটে; কিন্তু কাম ভাবে যেরূপে সহজে হয়, অন্যান্য ভাব সেরূপ সহজে আয়ত্ব নয়। তাঁহার নিকট ভিতর বাহির কিছু নাই, তিনি ত সর্ব্বান্তর্যামী; সুতরাং তাঁহার গোপিকা গণের বস্ত্র হরণ ও ব্রজবিহার প্রভৃতি ব্যাপারে লাম্পট্য প্রভৃতি দোষের উল্লেখ করা মূর্খতার পরিচয় মাত্র। ফলতঃ যিনি ভাগবতে পূর্ণব্রহ্ম রূপে বর্ণিত যিনি সদসৎ বর্জ্জিত; মায়োপহিত হইয়া পৃথিবীর কল্যাণের জন্য যিনি অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে লম্পট ধূর্ত্ত বলিলে অজ্ঞানতাই প্রকাশ পায়; তাঁহারা শাস্ত্র না বুঝিয়া আধা হস্তী দর্শনের ফললাভ করুন তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু দুঃখ এই যে, নিজের ঘরে অন্ন থাকিতে যে অন্নকে অন্ন জ্ঞান না করিয়া অথবা অন্ন থাকার বিষয় না জানিয়া যে পরের দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষার প্রয়াশী হয় তাঁহারা কি প্রকারের লোক তাহা জ্ঞানীগণ বুঝিবেন।

গত ১৬ই চৈত্র অষ্টমী তিথিতে পরিব্রাজক মহাশয়ের স্বরচিত "হরি হরিবোল ও মন বলনা" সংকীর্ত্তন অতি মধুর স্বরে গাহিতে গাহিতে ও ভক্তি ভাবে ভক্ত মণ্ডলীর সহিত নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান ক্রিয়া সমাহিত হইয়াছিল, সে দিনের সে ভাব বড়ই পবিত্র ও চিত্তাকর্ষক। বালকবৃদ্ধাদি নগরের বহু লোক যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র ধুবড়ী।

১। ধুবড়ী হইতে কুমার পরিব্রাজক মহাশয় কামরূপ কামাখ্যা যাত্রা করেন। তথায় তিনি তিন দিন অবস্থিতি পূর্ব্বক দর্শন পূজাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন। নীলাচল নিবাসী বর্গের নিতান্ত অনুরোধে তিনি তথাকার পীঠ প্রাঙ্গনে একটি বক্তৃতা করেন। মায়ের কাছে মায়ের ছেলের মুখে মায়ের কথা শুনিতে অনেক লোক একত্র হইয়াছিলেন। জ্ঞান ও ভক্তিময়ী কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মনঃপ্রাণ প্রীত হইয়াছিল।

২। কামরূপ হইতে কুমার গৌহাটিতে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করেন। তথায় দুই দিন বক্তৃতা করিয়া গৌহাটী বাসী বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও এখানে ইতি পূর্বে কয়েক দিন ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন।

৩। গোয়ালপাড়া নিবাসী বর্গের সবিশেষ অনুরোধে পরিব্রাজক মহাশয় গৌহাটী হইতে তথায় সমাগত হয়েন। একদিন দুই দিন করিয়া ভক্তগণের কার্য্যার্থ তিনি তথায় একসপ্তাহ থাকিয়া পাঁচদিন ধর্ম্মোপদেশ দান করেন, শাস্ত্রীয় রহস্য কথা বিদিত হইয়া লোক সকল অতীব আনন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন। মহাসংকীর্ত্তনের তুমুল হিল্লোলে কয়েকদিন গোয়ালপাড়া টলমল করিয়াছিল। তথায় হরিসভা ও সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইল। কুমার তথাকার ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গকে উপদেশ দিবার জন্য একদিন সাগ্রহে আহুত হয়েন। তাঁহার নীতি ও জ্ঞান পূর্ণ উপদেশ শ্রবন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও বহুল ভদ্রলোক অনেক নূতন শিক্ষা লাভ করিলেন। গোয়ালপাড়ায় কুমারের শুভ সমাগম স্মরণার্থ ও বালক গণের নীতি শিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মান্যবর শ্রীযুক্ত গঙ্গা চরণ সেন মহাশয়—"সাধুতাই জীবনের পরম সম্বল" এই বিষয়ে যে ছাত্র উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, তাহাকে একটী রৌপ্য পদক দান করিবেন, স্বীকার করিলেন। পদকে "কুমার মেডেল" বলিয়া লিখিত থাকিবে।

৪। মান্যবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কয়েক মাস ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন, তিনি ধুবড়ী গোয়ালপাড়া, গৌহাটী কামাখ্যা হইয়া ডিব্রুগড় গিয়াছিলেন, ইংরাজ রাজ্যের প্রান্তবাসীগণ তাঁহার মুখে সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় কথার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়া চমৎকৃত ও চরিতার্থ হইয়াছেন। তিনি ডিব্রুগড় হইতে শিবসাগরে আসিয়া কয়েক দিন অবস্থিতি করেন। তথাকার লোক সকল তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা শ্রবণে সনাতন ধর্ম্মে নিতান্ত আস্থাবান্ হইয়াছেন। একটি ধর্ম্মসভাও স্থাপিত হইয়াছে।

৫। শ্রদ্ধাস্পদ চূড়ামণি মহাশয় তথা হইতে ধুবড়ী হইয়া ফুলবাড়ী সভার বার্ষিক উৎসবে গমন করেন। তথায় কয়েক দিন ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া দিনাজপুর গিয়া লোক সকলকে সনাতন ধর্ম্মের সব্যাখ্যা দ্বারা প্রবুদ্ধ করেন।

৬। কুমার-পরিব্রাজক ও তর্কচূড়ামণি মহাশয় উভয়েই কুচবিহারের মহারাজা কর্ত্তৃক সাগ্রহে আহূত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। তথাকার বিবরণ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

দিনাজ পুর উদয় গ্রাম।

অত্র গ্রামের শ্রীশ্রী ৺ হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন, ১০ই বৈশাখ হইতে ১২ বৈশাখ পর্য্যন্ত ৩ দিবস হইয়া গিয়াছে।

প্রথম দিবস ৺ হরি মূর্ত্তির ষোড়শোপচারে পূজা, দ্বিতীয় দিবস, অরুণোদয় কাল হইতে রজনী প্রভাত পর্য্যন্ত অষ্ট প্রহর অবিরাম হরিনাম সংকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণব গণের মহোৎসব। তৃতীয় দিবস, নগর সংকীর্ত্তন, এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ধর্ম্ম বিষয় বক্তৃতা। এই সভাটী গ্রাম বাসী গণের যত্নে ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বেদ বিদ্যালয়ের বৈশাখ মাহার আয়।

মুষ্টি ভিক্ষা।

শ্রীগোপালচন্দ্র লাহিড়ি পরজনা পাবনা ২৲
" প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পালড়া ময়মনসিংহ ২৲
" উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও } বারাসত ১০/০
" হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় }
" জগবন্ধু মজুমদার নারায়ণগঞ্জ ১৷৵৫
" রাজেন্দ্র কিশোর রায় দিগের আসমা ময়মনসিংহ ১৷৵০
" রোহিনী কুমার চক্রবর্ত্তী পুরাণাড়া ঢাকা ২৲
৺ কাশীধামের ফাল্গুন ও চৈত্র মাহার ভিক্ষা আদায় ৩৫৷৵১৫

শ্রীহরেন্দ্র কুমার সান্যাল মিরপুর কাছারি ঢাকা ৪৲
" অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রহমতপুর বরীশাল ২৷৵০
" কালী কুমার রায় লক্ষ্মীবাজার ঢাকা ১৷০
" রামসুন্দর রায় ইটিণ্ডা ভেদিয়া ৩৲
" দীননাথ দাস উকিল পিরোজপুর বরীশাল ২৸০
" গোবিন্দ চন্দ্র সুর শ্যামপুর ঐ ১০৲
" শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী ভালাইপুর গোকুলথানা ৯৲
" রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় শিকারপুর নদিয়া ১৷৶
" সনৎকুমার চৌধুরী ধর্ম্মপুর শ্রীহট্ট ৯৲
" নবীনচন্দ্র দে হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট ৮/০
" কালীব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় গদাইপুর রঘুনাথগঞ্জ ১/০
" রমনীমোহন মল্লিক আঃ ধঃ প্রঃ সভা মেহেরপুর ১০৲
" প্রকাশচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী শিলচর কাছাড় ১৫৷/০
" বিপিনবিহারী রায় গয়া ৶০
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরীশাল ১৫৲
" রাজিবলোচন দাস মৈনাকানাই বাজার শ্রীহট্ট ৭৷৵০
" রক্ষাহরি সেন কড়িধ্যা বীরভূম ৮০
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়িয়া কুঠি ২২৷৵০
" ঈশানচন্দ্র রায় সারারচর ময়মনসিংহ ৪৸০
" রমনীমোহন বসু দাস ঘাসিপাড়া দিনাজপুর ১০৲
" প্রাণকৃষ্ণ দে দুর্গাকোলা বাগিচা শিলিকুরি ৪৲
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট ৫৲
" গিরিশচন্দ্র মহলানবীস করিমগঞ্জ ময়মনসিংহ ২/০
" গোবিন্দ চন্দ্র সুর শ্যামপুর বরীশাল ৭৸৵০
" কালীকুমার ভট্টাচার্য্য সামনগর মুরসিদাবাদ ৪৷৵০
" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজপুর কাঁচরাপাড়া ২৷০
" যাত্রা মোহন দত্ত ডেঙ্গাপাড়া পটীয়া চট্টোগ্রাম ৩/০
" দীনবন্ধু পালীত দাদপুর মুরসিদাবাদ ৮৸০
" রামরত্ন শিরোমনী খোকসাবাড়ি সিরাজগঞ্জ ৮৲
" ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট ৩৲
" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ছাতক শ্রীহট্ট ১৸০

এককালীন দান প্রাপ্তি।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধারওয়ার ৫৲
" প্রসন্নকুমার দত্ত শ্যামনগর ১৲
" কালীচরণ সেন, উকিল গৌহাটী ১৲
" বিনোদ গোপাল চট্টোপাধ্যায় গৌহাটী ২৲

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্‌, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৩শ ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১২
৩য় সংখ্যা	শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	আসাঢ়—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্য সন্নিধৌ।
তদভাবেস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেপি বা॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আচার্য্য সন্নিকটে বাস করিবেন। আচার্য্যের অভাব হইলে তাঁহার পুত্র কিম্বা পত্নীর নিকটে বাস করিতে পারেন। অথবা আচার্য্যের অগ্নি-হোত্রের অগ্নির সন্নিধিতে অবস্থান করিতে পারেন।

অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্‌ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোক মবাপ্নোতি নচেহাজায়তে পুনঃ॥

যে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে নিজ দেহের পবিত্রতা সাধন করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

গুরবে তু বরং দত্ত্বা স্নায়ীত তদনুজ্ঞয়া।
বেদ ব্রতানি বা পারং নীত্বা হ্যুভয় মেব বা॥

গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া অথবা বেদ ব্রতাদি পরিসমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন স্নান করিবেন।

অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তাং অসপিণ্ডাং যবীয়সীং॥

গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য হইতে অবিচ্যুত থাকিয়া সুলক্ষণ যুক্ত অন্য কর্ত্তৃক অপরিণীত অসপিণ্ড ও বয়ঃ-কনিষ্ঠ কন্যার পাণি গ্রহণ করিবেন।

অরোগিনীং ভ্রাতৃমতীং অসমানার্ষগোত্রজাং।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃত স্তথা॥

যে কন্যার শরীর অসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত, যাহার ভ্রাতা বিদ্যমান আছে, যাহার গোত্র ও প্রবর স্বামীর গোত্র ও প্রবর হইতে ভিন্ন, এই রূপ মাতৃকুলে পঞ্চম পুরুষ হইতে ঊর্দ্ধ ও পিতৃকুলে সপ্তম পুরুষ হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী কন্যাকে বিবাহ করিবে।

দশ পুরুষ বিখ্যাতাচ্ছ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারি রোগদোষ সমন্বিতাৎ।

যে বেদাধ্যায়ীর কুল দশপুরুষ হইতে বিখ্যাত, তাদৃশ কুলোৎপন্ন কন্যাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু যে বংশে কোন সংক্রামক রোগ রূপ দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সে বংশ সুপ্রসিদ্ধ হইলেও তাহা হইতে কন্যা গ্রহণ করিবে না।

এতৈরেব গুণৈ র্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্‌ জনপ্রিয়ঃ॥

বরও পূর্ব্বোক্ত গুণ সম্পন্ন হওয়া চাই। যে যুবক সবর্ণ, শ্রোত্রিয়, বুদ্ধিমান্‌ ও সাধারণের প্রীতিভাজন,

এবং যাঁহার পুংস্ত্ব [পুরুষত্ব] যত্ন পূর্ব্বক পরীক্ষিত হইয়াছে, তাদৃশ বরই বিবাহে প্রশস্ত।

ক্রমশঃ।

মিলন।

মিলনই সৃষ্টির ভিত্তি। মিলনই সৃষ্টির গূঢ় রহস্য। মিলন লইয়াই জগৎ। একটি পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত মিলিত হইতেছে, নদ নদীর সহিত মিলিতেছে, পাহাড় পর্ব্বত আকাশের সহিত মিলিতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র পরস্পর মিলিতেছে, বৃক্ষ লতার সহিত মিলিতেছে, পতি পত্নীর সহিত মিলিতেছে, পুত্র পিতার সহিত মিলিতেছে। চারিদিকেই মিলনের বিচিত্র লীলা! জগৎ মিলনের জন্য লালায়িত। জগতের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখিতে পাই, মিলনের বিচিত্র প্রহেলিকা। মনুষ্য সমূহ মিলিত হইয়া মনুষ্য সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, পশুসমূহ মিলিত হইয়া পশুসমাজ প্রস্তুত হইয়াছে, বৃক্ষ সমষ্টি মিলিত হইয়া গহন কানন রূপে উদ্ভূত হইয়াছে। ক্ষুদ্র জল কণারাশি মিলিত হইয়া মহাসাগর রূপে আবির্ভূত হইয়াছে, ক্ষুদ্র বালু কণা স্তরে ২ জমিয়া প্রকাণ্ড তট প্রদেশ সৃষ্টি করিতেছে, বিকীর্ণ প্রস্তর খণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া বিশাল পর্ব্বতের বিরাট দেহের জন্ম দিতেছে, বিচ্ছিন্ন পরমাণু কণা সম্মিলিত হইয়া অনন্ত পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছে, সুতরাং মিলনই সৃষ্টির শিরোদণ্ড, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের অস্থিতে২ মজ্জায় ২ মিলনের সূক্ষ্ম সূত্র বিরাজ করিতেছে। যেমন একটি পুষ্প মালার সূত্র ছিঁড়িয়া গেলে পুষ্প গুলি চারিদিকে ছত্রাকার হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, সেই রূপ জগতের অন্তর্নিবিষ্ট এই মিলন-সূত্রের তিরোভাব হইলে পরমাণু কণা বিশীর্ণ হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া, কোথায় উড়িয়া যাইতে পারে। মিলনই জগৎকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, মিলনের সূক্ষ্ম শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া অলক্ষিত ভাবে জগৎকে নিয়মিত—পরিচালিত করিতেছে।

বাহ্য জগতে যেমন মিলনের মহামেলা, অন্তর্জগতেও সেই রূপ মিলনের বিচিত্র প্রভাব। যাত্রার দলে বেহালাদার যে সুর দেয়, সেই সুরে সুর মিশাইয়া গায়ক গণ যেমন গাহিয়া যায়, সেই রূপ মনোময় জগতে অন্তঃকরণ যে ইঙ্গিত করে, সেই ইঙ্গিতানুসারে ইন্দ্রিয়গণ মিলিত হইয়া কার্য্য করে। মধু মক্ষিকা শ্রেণির মধ্যে মক্ষিকাগণের দলপতি যে দিকে উড়িতে থাকে সমস্ত মধু মক্ষিকা সেই দিকেই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। হস্তি যূথের মধ্যে হস্তিরাজ যে দিকে দৌড়িয়া যায়, হস্তি সমূহ সেই দিকেই প্রধাবিত হয়। সেই রূপ ইন্দ্রিয়াধিপতি অন্তঃকরণ যে পথের পথিক হন, ইন্দ্রিয়গণের সেই দিকেই বৃত্তি [ক্রিয়া] হইয়া থাকে। যূথ ভ্রষ্ট হস্তী যেমন উন্মার্গ গামী হয়, সেই রূপ দল ভ্রষ্ট মনের অবাধ্য ইন্দ্রিয় বিপথগামী বিকার-গ্রস্ত হয়।

রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ এই কয়েকটি উপভোগ্য বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে রহিয়াছে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যখন রূপকে বিষয় করে, অর্থাৎ রূপ যখন চক্ষুর গোচরীভূত হয়, তখন দর্শনাত্মিকা বৃত্তির উৎপত্তি হয়। এই রূপ রসনা রসকে যখন বিষয় [গ্রহণ] করে, তখন আস্বাদাত্মিকা বৃত্তির উদয় হয়। এই যে দর্শনাদি বৃত্তি, [জ্ঞান] ইহার উৎপাদনে কেবল একাকী ইন্দ্রিয় সমর্থ নহে। বিষয়, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও আত্মা এই চারি জনে মিলিত হইয়া এক একটি বৃত্তিকে উৎপাদন করে। প্রথমে বিষয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, ইন্দ্রিয় মনের সহিত, অনন্তর মন আত্মার সহিত সংবদ্ধ হয়, তবে বৃত্তির উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ কোন দ্রষ্টব্য বিষয়কে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রথমে গ্রহণ করিলে, সেই বিষয়ের একটা প্রতিবিম্ব অন্তঃকরণে পতিত হয়, অন্তঃকরণ আবার সেই প্রতি-বিম্ব আত্মাতে সংক্রামিত করে। তখন "আমি ঘট দেখিতেছি" ইত্যাকার বৃত্তির উদয় হয়। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ উভয়েই জড় পদার্থ। কোন বস্তু প্রকাশ

করিতে ইহাদের স্বতঃ সামর্থ্য নাই। ইহারা যে বিষয়-টিকে আহরণ করে, আত্মার চৈতন্যাংশ তাহাতে প্রতি-ফলিত হইয়া তাহাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং বৃত্তির উৎপত্তিতে আত্মার সাহায্য অপেক্ষিত হইতেছে। আবার কেবলই আত্মা দ্বারা বৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না। আত্মা স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়, নিঃসঙ্গ নির্লেপ, যেমন স্থির সমুদ্রের অগাধ গম্ভীর জল গতিহীন—নিস্তরঙ্গ, আত্মাও সেই রূপ নিস্তরঙ্গ। সমুদ্র হইতে খাল কাটিলে সেই গতিহীন জলেরও যেমন নিম্নাভিমুখী ক্রিয়া হয়, সেই রূপ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মার প্রকাশ শক্তির প্রবাহ হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় আত্মার প্রকাশ শক্তি প্রবাহিত হইবার যন্ত্র স্বরূপ অর্থাৎ দ্বার স্বরূপ। এই দ্বার দিয়াই আত্মা উপভোগ্য বিষয় সমূহে বৃত্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং বৃত্তি সম্বন্ধে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়েরও আবশ্যকতা আছে। সুতরাং পরস্পরের মিলিত সাহায্যেই বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা বুঝা গেল। অতএব আধ্যাত্মিক জগতেও মিলন শক্তি রাজত্ব করিতেছে, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল।

সৃষ্টির মূল তত্ব কার্য্য কারণ বাদ অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাই মিলনের অলঙ্ঘ্য নীতি সর্ব্বত্র ক্রিয়া করিতেছে। একটি মৃন্ময় ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে দণ্ড, চক্র চীবর, কপালদ্বয় ও কুম্ভকার এই কারণ সমষ্টি চাই। কেবল একটা দণ্ড, কেবল একটা চক্র কি কেবল একজন কুম্ভকার একটা ঘটকে কখনও উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু দণ্ডাদি কারণ সমূহ মিলিত হইয়া একটা ঘটকে উৎপন্ন করে। কোন কারণ একাকী কার্য্য জননে সমর্থ নহে। কার্য্যোৎপত্তি জন্য কারণ সমষ্টির প্রয়োজন। এই জন্য সাংখ্য-কারিকা ব্যাখ্যা কালে বাচস্পতিমিশ্র এক স্থানে বলিয়াছেন—"নহি কিঞ্চিদেকং স্বকার্য্যে পর্য্যাপ্তং কিন্তু সম্ভুয়"। কোন কারণ একাকী স্বকার্য্যজননে পর্য্যাপ্ত [সমর্থ] নহে কিন্তু কারণান্তরের সহিত মিলিত হইয়া। কারণের এই মিলন-নীতি অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম-বাদীরা একটা আশঙ্কার উত্তর দিয়া থাকেন। নাস্তিকেরা আশঙ্কা করিয়া থাকে, যে ঈশ্বর আস্তিকের মতে নিঃস্বার্থ কারুণিক, অপক্ষপাতী। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তিনি জগতে কাহাকেও দুঃখী করিয়া কাহাকেও বা সুখী করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? ইহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এতদুত্তরে আস্তিক বলেন, কোন কারণই একাকী স্বকার্য্যজননে সমর্থ নহে, ইহা যখন সার্ব্ব-ভৌমিক অখণ্ড নিয়ম হইল, তখন ঈশ্বরেও এ নিয়ম খাটিতে পারে। জগদীশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ সহকারি-কারণের সহিত মিলিত হইয়া এই জগৎ রূপ কার্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং কর্ম্ম বৈচিত্র্য নিবন্ধন জীব সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, ইহাতে ঈশ্বরকে দোষী করা যাইতে পারে না। কারণান্তরের সাহায্য লইয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তারও ত্রুটি হইতেছে না। কারণান্তরের সাহায্য লওয়াও সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তি ও ইচ্ছার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে।

সাংখ্য মতে প্রকৃতিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী, কেননা কর্ত্তৃত্বাদিগুণ জড় প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। আত্মা জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, তাঁহার কোন চেষ্টা নাই, কোন ব্যাপার নাই। তাঁহাকে ক্রিয়াবান্ স্বীকার করিলে প্রকৃতির মত তিনিও পরিণামী অনিত্য হইয়া পড়েন। সুতরাং জগতের আদি কারণ প্রকৃতি, আত্মা আদিকারণ নহেন ইহাই সিদ্ধান্ত। প্রকৃতিই যদি একাকী জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী হইলেন তাহা হইলে এখানে মিলনের নিয়মত রহিল না? ইহার উত্তরে সাংখ্য বলিতেছেন, ঈশ্বর [আত্মা] সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, বটে, কিন্তু তিনি "অধিষ্ঠাতা"। কথাটার একটু ব্যাখ্যা আব-শ্যক। প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে আত্মা যে কিছু

মাত্র সাহায্য করেন না তাহা নহে। আত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারে না। চেতনের সংযোগেই অচেতনের ক্রিয়া হইয়া থাকে। চেতন পুরুষের হস্তে থাকিয়াই অচেতন কুঠার কাষ্ঠচ্ছেদন-রূপ ক্রিয়া করিতে পারে। সুতরাং প্রকৃতি যে কোন ক্রিয়াই করুন না কেন, আত্মার সান্নিধ্য তাঁহার প্রয়োজন। প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি ক্রিয়া বিষয়ে আত্মা নিজ সান্নিধ্য মাত্র দ্বারা প্রকৃতিকে উপকৃত করিয়া থাকেন। প্রকৃতির পরিচালনে তিনি কোন ব্যাপার করেন না, প্রকৃতিকে জগৎ সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি কোন সঙ্কল্প করেন না, তাঁহার সন্নিধি মাত্রেই নিদ্রিত প্রকৃতি জাগিয়া উঠে, জড় প্রকৃতিতে ক্রিয়া শক্তি ফুটিয়া উঠে। আত্মার বৈদ্যুতিক সাহচর্য্যে বিচলিত—সংক্ষুব্ধ হইয়া প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টিতে অগ্রসর হয়। অয়স্কান্ত মণির [চুম্বক পাথর] সাহচর্য্যে বক্ষবিদ্ধলৌহ-শলাকা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে কেন? অয়স্কান্ত মণি ত লৌহশলাকাকে হাত দিয়া টানিয়া বাহির করে না, তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার জন্য ত তাহার কোন সঙ্কল্পেরই উদয় হয় না, তথাপি কি জানি সেই মণির সাহচর্য্যের এমনি গুণ, যে লৌহ-শলাকা বহির্নিসরণ-ক্রিয়া না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই রূপ আত্মার কোন ব্যাপার না হইলেও তৎসান্নিধ্যেরই এমনি গুণ, যে প্রকৃতি সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মা জগতের অধিষ্ঠাতা, কারণ (কর্ত্তা) নহেন। যেমন কুম্ভকার কুম্ভের কর্ত্তা, (নিমিত্ত কারণ) আত্মা সে রূপ জগতের নিমিত্ত কারণ নহেন। কুম্ভ নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রথমে কুম্ভকারের মনে একটা সঙ্কল্পের উদয় হয়, তদনন্তর কুম্ভকার হস্ত প্রয়োগাদি ব্যাপার দ্বারা দণ্ডাদি পরিচালন পুরঃসর কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আত্মা সেই রূপ সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া হস্ত প্রয়োগাদি ব্যাপার দ্বারা প্রকৃতির পরিচালন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন না। (কেননা আত্মা সঙ্কল্প বিকল্প বিবর্জ্জিত, ব্যাপার-রহিত) কিন্তু কেবল তাঁহার সান্নিধ্য মাত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতি ক্রিয়া করিয়া থাকে। সুতরাং আত্মা কারণ নহেন। যে ব্যাপার-বিহীন, তাহার কারণতা সম্ভবেনা। জগতের সম্বন্ধে আত্মার ব্যাপার-করণ রূপ কর্ত্তৃত্ব নাই, এই জন্য তাঁহাকে কারণ বলা যাইতে পারে না. বেশ কথা, কিন্তু জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার সান্নিধ্য রূপ সাহচর্য্যও ত অপেক্ষিত হইতেছে, সুতরাং তাঁহাকে একবারে ছাড়িয়া দিলেও চলিতেছে না। এই জন্য সাংখ্য শাস্ত্র মাঝামাঝি গোছের তাঁহার একটা নাম রাখিলেন "অধিষ্ঠাতা"। তাঁহার কারণতা না থাকুক, কিন্তু অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। যদি তাঁহার কিছু মাত্র সাহায্য না লইয়া পূর্ণ স্বাধীন ভাবে প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে জগতের একাকী সৃষ্টি কর্ত্তা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত হয় না। যখন প্রকৃতিকে সৃষ্টি সম্বন্ধে পদে ২ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে হইতেছে, তখন সৃষ্টির এই মৌলিক ভিত্তিতেও মিলনের নিয়ম সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করিতেছে ইহা স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইতেছে।

বুঝা গেল, সৃষ্টির উৎপত্তি মিলনে, সৃষ্টির বিকাশ মিলনে, সৃষ্টির পরিণতি মিলনে। অদ্বৈত-বাদী জগতের এ মহামিলন সূত্র পুড়াইয়া ফেলিতে চাহেন। তাঁহার মতে জগতের কোথাও কিছুই নাই, সকলই মিথ্যা, সকলই ভোজবাজী, একমাত্র তিনি (পরম ব্রহ্ম) সত্য। যখন তাঁহা ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন কে কাহার সহিত মিলিত হইবে। অবিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা অদ্বৈত বাদীরা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে অবিদ্যা মিথ্যা, সুতরাং অবিদ্যার মিলনও মিথ্যা। এই মিথ্যা হইতে মিথ্যাভূত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ব্যাবহারিক অবস্থায় মিলন, সৃষ্টি কার্য্য কারণ ভাব এসমস্ত সত্য

হইতে পারে কিন্তু পারমার্থিক অবস্থায় এ সমস্ত বস্তুতঃ অসৎ। এক মাত্র ব্রহ্ম সৎস্বরূপে বিদ্যমান। মিলিত হইবার বস্তুই যখন নাই, তখন মিলনও নাই। সুতরাং অদ্বৈত বাদী মিলনকে ঘৃণা করেন। দুইটি নহিলে মিলন হয় না, সুতরাং মিলন দ্বৈতদৃষ্টিকে ডাকিয়া আনে, দ্বৈতদৃষ্টি অদ্বৈতবাদীর চক্ষে বন্ধনের কারণ, তাই অদ্বৈতবাদী মিলনকে পদাঘাত করেন। অদ্বৈত বাদী মিলনের সূত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্মশানে নিক্ষেপ করেন, দ্বৈতবাদী ভক্ত মিলনের সেই ছিন্ন পুষ্পমালা কুড়াইয়া গলদেশে দুলাইয়া বিভুর দরবারে যাইতে চাহেন। অদ্বৈতবাদী মিলনের প্রসাদেই জগৎ দেখিতে পাইয়াছেন, মিলনের শক্তিতেই জগতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এই মিলনের অন্নে প্রতি পালিত—পরিপুষ্ট হইয়া পরিশেষে মিলনের বিরুদ্ধেই তিনি অস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু দ্বৈতবাদী ভক্ত মিলনকে সাধনা জগতের অনুকূল করিয়া লইয়া মিলনের মঙ্গলময় বিজয় গাথা গাহিতে ২ পরম বিভুর প্রেম সম্মিলনে মিলিত হইয়া তাঁহার অনন্ত সত্তায় মিশিয়া যান।

অভাব হইলেই মিলন হয়, আকাঙ্ক্ষা হইলেই পরিপূরণ হয়। শূন্যতার পরই সৃষ্টি ইহাই নিয়ম। সুতরাং অভাব মূলকই মিলন। মিলনের হেতু অভাববুদ্ধি। যে বাস্তবিকই ধনের অভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে, লক্ষ্মী নিশ্চয়ই তাহাকে দয়া করিবেন, যে বাস্তবিকই বিদ্যার অভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় করিবেন। ধন বল, বিদ্যা বল, যশ বল, ধর্ম্ম বল, ইহাদের কোন একটির প্রকৃত অভাব বুদ্ধি জন্মিলে তাহা কিছুতেই অপূর্ণ থাকেনা। তবে প্রকৃত অভাব বুদ্ধি জন্মান কঠিন কথা। আমাদের হৃদয়ে শত সহস্র অভাব বুদ্ধি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোন একটি অভাবের পূরণ হয় না কেন? কেননা কোন বিষয়ে আমরা তীব্র অভাব অনুভব করিতে পারি না, যদি মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া কোন একটি অভাবে নিয়োজিত করিতে পারিতাম তাহা হইলে শত সহস্র অভাব ঘুরিয়া বেড়াইবে কেন? তীব্র অভাব কখনই অপূর্ণ থাকেনা। পৃথিবীতে জলীয় শক্তির অভাব হইলে তৎক্ষণাৎ বর্ষার সমাগম হয়, পিপাসু চাতকের জলের অভাব হইলে তৎক্ষণাৎ মেঘের উদয় হয়। জগতে ধর্ম্মের অভাব হইলে তৎক্ষণাৎ ভগবানের অবতার রূপে আবির্ভাব হয়, অভাব হইলেই পূরণ হয়, অভাব হইলেই প্রার্থিত বস্তুর মিলন হয়, কিন্তু প্রকৃত অভাববুদ্ধি জন্মিতে তবে ত।

সাম্য।

অন্য কথা বুঝিবার পূর্ব্বে "মনুষ্যের" প্রাকৃতিক অবস্থার বিষয় একটু আলোচনা করা আবশ্যক। বিলাতী পণ্ডিত হবস্ সাহেবই প্রথমে এই State of Nature "প্রাকৃতিক অবস্থা লইয়া একটু আন্দোলন করেন। তিনি বলেন যে একদিন মনুষ্যের অবস্থা ইতর জন্তুগণ অপেক্ষা বিশেষ উন্নত ছিলনা। মানুষের তখন সামাজিক কোন গুণই পরিপুষ্ট হয় নাই। উদ্দাম প্রবৃত্তির বেগ যেমন উথলিয়া উঠিত, তেমনই তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্য ব্যস্ত হইত। দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া নগ্ন, অসভ্য বর্ব্বর অবস্থায় ইতস্তত "মনুষ্যপশু" পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। তখন উচ্চনীচ ভাল মন্দ, ধনী দরিদ্র কিছুই ছিল না। সকলই সমান, সকলই এক, সকলই স্বাধীন ছিল। ক্রমে ক্রমে, ক্রমোন্নতির প্রভাবে মনুষ্যের অবস্থা উন্নত হইতে লাগিল, ধীরে ২ মনুষ্য কাপড় পড়িতে শিখিল ভাত রাঁধিতে আরম্ভ করিল, বিবাহ প্রথা বুঝিল। কোনও সময়ে যে দেশ বিশেষের মনুষ্য সমাজ এই রূপ অসভ্য অবস্থাপন্ন ছিল তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি, এবং এখনও এইরূপ বর্ব্বর জাতি

অষ্ট্রেলিয়ার স্থানে২ দেখা গিয়াছে। কিন্তু এক নির্দ্দিষ্ট সময়েই যে মনুষ্য মাত্রেরই এই প্রকার দুর্দ্দশা ছিল তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে সৃষ্টি ক্রিয়া অনন্ত অনুমান হয়। উন্নতি অবনতির ক্রীড়া অনন্তকাল হইতে অনন্ত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। আজ যে দেশ অসভ্যতার অন্ধতামসে নিমগ্ন, হয়ত সেই খানেই পূর্ব্বে সভ্যতার কৌমুদীচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িত, আবার হয় ত ভবিষ্যতে এই প্রদেশই জগৎকে সদাচার, সভ্যতা শিখাইবে। সুতরাং এক সঙ্গে একেবারে মনুষ্য মাত্রেই যে পশু প্রবৃত্তির দাস ছিল ইহা আমরা হঠাৎ স্বীকার করিতে পারি না। অনন্ত প্রক্রিয়াকে স্নান্ত করিয়া মনের মত গুছাইয়া লইয়া সাজাইলে ত চলিবে না। যাহা প্রকৃত সত্য, ঐতিহাসিক ঘটনার উপর যাহা অবস্থাপিত, সেই সকল বিষয় লইয়া বিচার বিধেয়। এই জন্যই কিছু দিন হইতে Historical method অর্থাৎ "ঐতিহাসিক প্রথা" নামের একটি নূতন প্রথা এই সকল বিচারের জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইতিহাস পাঠ করিয়া মনুষ্য সমাজের যে সকল ভিন্ন ২ অবস্থার কথা জানা গিয়াছে, তাহাই সঙ্কলিত করিয়া নূতন কোন তত্ত্বের উদ্ভাবন করিতে এই প্রথা অনুমতি দিয়া থাকে। নিজের খেয়ালের উপর মনগড়া কোন এক স্বতঃসিদ্ধি অবলম্বন করিয়া বিচারে অবতীর্ণ হইলে এই প্রথানুযায়ী মহা দোষ ঘটে। ইদানীং পাশ্চাত্য সকল বড় ২ পণ্ডিতেই এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক "আলোক প্রাপ্ত মহাপ্রভুরা" সেই পুরাতন কাহিনী এখনও ভুলেন নাই।

সকল মনুষ্যই সমান, ভগবানের চক্ষে ইহা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য সমাজে মানুষের চক্ষে ইহা কখনই প্রকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। প্রকৃতিই বৈচিত্র্যময়ী—একবৃন্তের দুইটি গোলাপ এক নহে, এক গর্ভের দুই সন্তান সমান নহে। কিছু না কিছু পার্থক্য আছে। আকারে, ব্যবহারে, বুদ্ধিতে, প্রবৃত্তিতে একটু না একটু বিভিন্নতা থাকিবেই। এতদ্ব্যতীত জীব প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন হইতে পারে না। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে অবস্থাপিত। একটি আর একটির উপর হেলিয়া রহিয়াছে, অনন্ত শৃঙ্খলার একটি চক্র আর একটির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তজ্জন্য আমরা মনুষ্যকে প্রকৃত স্বাধীন বলিতে সাহসী নহি। পাশ্চাত্য সমাজে আহার বিহারের স্বাধীনতা থাকিতে পারে, কিন্তু অর্থের জন্য একটি বেশ বৈষম্য আছে। "জোর যার মুলুক তার" কথাটা খুব খাঁটি। জোর যাহার, তাহার পায়ে সকলেই মাথা লুটাইয়া থাকে। প্রাকৃত অবস্থাতেও এই ব্যবস্থা, এবং সুসভ্য পাশ্চাত্য সমাজেও এই প্রথা। সুতরাং এক না এক রূপে বৈষম্য মনুষ্য সমাজে চিরদিনই বিদ্যমান আছে। এবং এই বৈষম্যের খাতিরে সমাজে সকলেরই কিছু, ২ ঘাটি স্বীকার করিতে হয়, স্বাধীনতার একটু খর্ব্ব হয়,। পরন্তু যখন বৈষম্যের তাড়নায় সমাজের অধিক লোকের কষ্ট হয়, ইহার দোহাই দিয়া যখন অত্যাচার অবিচার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, তখনই সেই বৈষম্য-বিশেষকে দলিত করিয়া নূতন ভাবে সমাজ নির্ম্মাণের সকলেরই চেষ্টা হয়। সমাজ বিপ্লবের ইহাই মূল কারণ, এবং সেই সময়ে সাম্যের ধুয়া ধরিয়া দলিত লোক সংখ্যা সমাজে এক মহাব্যাপারের বোধন করেন। প্রথম চার্লসের সময়ে ইংলণ্ডে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজ শক্তির বিপক্ষে এই জন্যই বিদ্রোহ অগ্নি জ্বালিয়াছিল। মার্কিণে বিশেষ বৈষম্যের বিষম তাড়নায় তৃতীয় জর্জ্জের বিপক্ষে দেশশুদ্ধ লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, এবং পরিশেষে স্বাধীন হইয়া রাজ্য পরিচালন ভার লইয়াছিল। সকল দেশেই এইরূপ হইয়া থাকে এবং হইবেও, কিন্তু তাই বলিয়া কি তত্তদ্দেশে বৈষম্য বিচার নাই? ভিন্ন আকারে, ভিন্ন নামে নূতন হইয়া সমাজে উহা প্রচলিত হইতেছে।

গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় সমাজ গতির একটা কোন বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়ম কাহারও জানা নাই। ইহার নিগূঢ় কার্য্য প্রণালী মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা এখনও সম্যক উপলব্ধি করা হয় নাই। কোন্ এক অজ্ঞেয় শক্তি প্রভাবে মনুষ্য সমাজ কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। সকলেই নিজ ২ মুখরোচক এক একটা নিয়ম খাড়া করিয়া নিজের প্রণালী চালাইতে চাহেন। প্রকৃত সত্য কি তাহা কেহই জানে না। সময় বিশেষে, অবস্থাবিশেষে সমাজ অঙ্গের ব্যাধি নিবারণের জন্য সকলে আন্দাজী একটা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকে। প্রয়োগ কর্ত্তার বুদ্ধি প্রভাবে সেই উপায় বিশেষে যদি সামাজিক ব্যাধির উপশম হয় তাহা হইলেই যে উহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে অখণ্ড্য সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে এমন কিছু কথা নহে। একরোগে ধাতু বিশেষে এক ঔষধি খাটে না মাত্রাতেও একটু পার্থক্য থাকে। আজ শত-বৎসর পূর্ব্বে যে সকল কারণের জন্য সাম্যবাদের দোহাই দিয়া ফরাসীস সমাজে রুসো এবং ভল্টেয়ার এক মহা বিপ্লবের অঙ্কুর উৎপন্ন করিয়া ছিলেন, যে অত্যাচার উৎপীড়ন নিবারণের জন্য, যে অন্তর্জ্বালা নিভাইবার জন্য ফরাসীস গণ জ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মাদিনী শক্তির এক ফুৎকারে সমাজ-শরীরকে ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন, আমাদের হিন্দু সমাজে ঠিক সেই সকল উপদ্রব, উৎপীড়ন উপস্থিত হইয়াছে কি? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে কি সে সকল ফরাসীস আকারে দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি? রোগের লক্ষণ, বিরাম, বৃদ্ধি কি একই ভাবে একই নিয়মে হইতেছে? এতটা হইলেও তথাপি দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ঔষধের মাত্রা কমিবে। কিন্তু দেখিতেছি "সাম্যের" তান তেমনি দীপক রাগে সপ্তমে চড়াইয়া গীত হইতেছে। যে উপায়ে ইউরোপীয় সমাজ সংস্কৃত এবং উন্নীত হইয়াছে এবং হইতেছে, ঠিক সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া পতিত হিন্দু সমাজ কখনই সংস্কৃত এবং সম্মার্জ্জিত হইবে না। আমরা স্বীকার করি হিন্দু সমাজ হীনতেজ হইয়াছে, আমরা স্বীকার করি হিন্দু সমাজে পাপের বৃদ্ধি হইতেছে, মানিলাম হিন্দুর শান্তি নিকেতনে পাষণ্ডের বিলাস বিভ্রম বিস্তারিত হইতেছে, মানিলাম ধর্ম্মের নামে, পুণ্যের আবরণে দেশে শত ২ পাপকর্ম্ম হইয়া থাকে; কিন্তু সেই জন্যই কি বিলাতী উপায়ে, সমাজে আমরা বৈদেশিক ব্যবহার প্রচলিত করিয়া মনুষ্যহীন দেশে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করিতে হইবে? হিন্দু সমাজের গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র, হিন্দু সমাজের ধাতু ভিন্ন, উহাতে বৈষম্যের বিচার, প্রথা বিশেষের দ্বারায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে; সুতরাং সংস্কার করিতে হইলে হিন্দুয়ানী ভাবে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া উন্নতি করিলে বাহাদুরী আছে। নচেৎ হিন্দুর ছেলেকে চুনাগলীর অপূর্ব্ব জীব সাজাইয়া তেজস্বী (?) করিলে লাভ কি? আমাদের হিন্দুর শাস্ত্রে সাম্যের কথা আছে, একতার মন্ত্র আছে। হিন্দুও জ্ঞানের কথা, সমাজের ব্যথা বুঝিত, হিন্দুও সব একাকার করিতে জানিত; রুসোর মন্ত্র ভল্টেয়ারের তত্ত্ব, কোম্তের তন্ত্র হিন্দু শাস্ত্রের এক কোণে লেখা আছে কিন্তু সকলই হিন্দুয়ানি মাখান হিন্দুভাবাপন্ন; উহাতে সমাজের ধাতু নষ্ট হয় না, সমাজের চেহারা বদ্লায় না, হিন্দু সন্তান ফিরিঙ্গী সাজে না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল কালের প্রবাহে সকলেই নষ্ট হইবে, যাহা ছিল তাহা নাই, যাহা আছে তাহাও থাকিবে না, তবে কথা এই যে খরতর সময়স্রোতে ভাসিতে ২ যেন আমরা আত্মবিস্মৃত না হই। পৌরাণিক আর্য্যগণের মত আমরা কেহই নহি, অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তত্রাচ অনেক ভাবগত সাদৃশ্যও আছে, এখনও আকৃতি দেখিয়া পরিচ্ছদ দেখিয়া অন্যজাতি হইতে হিন্দুকে বাছিয়া লওয়া যায়, ভারতের সকল হিন্দু জাতির একটা কেমন প্রাণের টান আছে। যাউক, এখন আমাদের হিন্দু সমাজ-

শৃঙ্খলা একটু বুঝা আবশ্যক, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে বিলাতী সাম্য আমাদের কত অনিষ্টই করিয়াছে দেশের দেশীয়ত্ব টুকু ধীরে ২ কেমন ডুবিয়া যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

সাধু! সাবধান!

আর্য্যধর্ম্মের এই তুমুল আন্দোলনের দিনে সাধনা-সিদ্ধির দিকে, তন্ত্রমন্ত্রের দিকে, ভক্তি উপাসনাকাণ্ডের দিকে লোকের মন যেন দিন ২ ফিরিতেছে। পুরুষের নব যৌবনে যেমন নবানুরাগের সঞ্চার হয়, সেই রূপ আর্য্যসন্তানের প্রাণে ২ এ নব ধর্ম্ম পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে। ঘোর গম্ভীর নিশীথ কাল চলিয়া গেলে উষার মৃদু মধুর মুখ কান্তিতে অরুণ দেবের স্নিগ্ধ আলোক রেখা যেমন ফুটিয়া উঠে. সেই রূপ দারুণ দুর্দ্দিনের পর আজ বহুদিন বাদে আর্য্য সন্তানের হৃদয় কন্দরে ধর্ম্ম পিপাসার বিমল কিরণচ্ছটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিকার গ্রস্ত রোগীর বহুদিন রোগ-শয্যার পর তাহার শরীর যখন নীরোগ হয়, তখন তাহার বিশুষ্ক প্রাণে যেমন আশা ভরসার নবাঙ্কুর গজাইয়া উঠে, সেই রূপ আর্য্যসন্তানের বিশুষ্ক হৃদয়-তরুতে কি জানি কোন্ অলক্ষিত মলয় সমীরণের প্রভাবে অদ্ভুত বল্লরী অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। লতার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়া চাই, তবেত শোভা উথলিয়া উঠিবে। ক্ষুধা জাগিয়াছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত খাদ্য চাই, তবেত পরিপুষ্টি মিলিবে, পিপাসা জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু সুশীতল সলিল চাই, তবেত প্রাণে শান্তির ফোয়ারা খুলিবে।

ক্ষুধা যে জন্মিয়াছে তাহা ঠিক। তাহা প্রমাণ করিতে বোধ হয় আমাদের চেষ্টা না করিলেও চলে। ক্ষুধা জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত খাদ্য মিলিতেছে কি? সাধনা ২ বলিয়া দেশে একটা চীৎকার উঠিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত সাধকের চরণে কেহ শরণ পাইতেছেন কি? যাঁহারা কৃতী. তাঁহারা নীরবে বিনাড়ম্বরে আপনার কার্য্য আপনি সাধন করিতেছেন। যাহারা সম্প্রদায় পাতাইতে চাহে তাহারাই কেবল আসর জমাইয়া স্বার্থের জাল সমাজে ছড়াইয়া বসিয়া গিয়াছে। যাঁহারা সাধনা জগতের ফুটন্ত ফুল, তাঁহারা সমাজের বিলাসোদ্যানে দেখা দেন না, জগতের নিভৃত কোণে বিরলে বসিয়া তাঁহারা নিজ গুপ্ত ধনের সৌন্দর্য্যামৃত-ধারা পান করিতেছেন। তাঁহাদের খোঁজ কেহ করে না, তাঁহাদের তত্ত্ব কেহ লয় না কেননা তাহা যে পরিশ্রম সাধ্য। ধর্ম্মার্থী শিক্ষিত বাবু সংসারের জন্য গাধা খাটুনি খাটেন কেন, সাংসারিক উন্নতির জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন কেন, কেননা তিনি বুঝেন, অর্থাৎ অনুভব করেন সাংসারিক উন্নতি না হইলে আধিভৌতিক মৃত্যু গ্রস্ত হইতে হয়, সেই রূপ তিনি আরও বুঝেন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি না হইলে আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয়। সকলের কথা বলিতেছি না, যাঁহারা এই রূপ অনুভব করেন, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। ভগবানের কৃপায় দেশে আজ কাল এরূপ লোক নিতান্তই বিরল নহেন। বাস্তবিকই যাঁহারা ঐরূপ অনুভব করেন. তাঁহারা সংসারের জন্য যত টুকু পরিশ্রম. যত টুকু অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির চালনা করেন, ধর্ম্মের জন্য তত খানি করা আবশ্যক মনে করেন না কেন? অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা ধর্ম্মোপার্জ্জন অবশ্যই গুরুতর পদার্থ। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনে যত খানি পরিশ্রমের প্রয়োজন, ধর্ম্মোপার্জ্জনে তদপেক্ষা দ্বিগুণতর পরিশ্রমের আবশ্যকতা। আজ অর্থোপার্জ্জনের জন্য কেহ কোয়েটায় যাইতেছেন, কেহ সুদূরস্থিত ব্রহ্মদেশে যাইতেছেন. কিন্তু ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য—গুরু-অনুসন্ধানের জন্য অন্ততঃ কিছুদিনের অবসর লইয়া কয় জন পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারের কক্ষে ২ ঘুরিতেছেন। হিন্দুস্থানীর মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে বটে, কিন্তু বঙ্গবাসীর মধ্যে নিতান্তই বিরল। কেহ ২ বলিয়া থাকেন—

"অক্কে চেৎ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ"। গৃহকোণে যদি মধু পাওয়া যায়, তবে মধুর জন্য পাহাড়ে ২ ঘুরিতে হইবে কেন? আমরা বলি, গৃহ-কোণে যে মধু পাওয়া যায়, তাহা সমাজের আবদ্ধ বায়ু-বিদূষিত—বিষাক্ত, তাহাতে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। পর্ব্বতের উন্মুক্ত পবনে যাহা বিশুদ্ধ, তাহাই স্বাস্থ্যকর। পচা নর্দ্দামার ময়লা মাটি মাখা জল পরি-ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের বিমল স্ফটিকস্বচ্ছ ঝরনার জল পান করিতে কাহার না সাধ যায়? কিন্তু তাহার জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন। এত খানি পরিশ্রম করিতে যে কেহই প্রস্তুত নহে। তাই শিক্ষিত বাবু দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছেন। রূপা ফেলিয়া রাং লইয়া আনন্দ করিতেছেন, সোনা ফেলিয়া গিল্টিতে মজিতে-ছেন। টুকটুকে মাকাল ফলের বাহ্য সৌন্দর্য্যে ভুলিতে-ছেন, বাহ্য চটকে ভুলিয়া গিয়া পরম অসাধককে সাধক বলিয়া স্থির করিতেছেন। ভণ্ডের খর্পরে পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন। এ সমস্তই আলস্যের দোষ। আলস্য যে তমোগুণের ধর্ম্ম। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য পিপাসু, তাঁহাদের প্রকৃতিতে অবশ্যই সাত্ত্বিকাংশের আধিক্য আছে, তবে তমোগুণের ধর্ম্ম আলস্য তাঁহাদের সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে স্থান পায় কেমন করিয়া?

কথাটা খুলিয়া বলিতে হইতেছে। এই ধর্ম্মান্দোল-নের অবসরে কতক গুলি পেসাদার সাধক, পেসাদার গুরু, পেসাদার যোগী দেখা দিয়াছেন। ধর্ম্মান্দোলনের সুবিধা পাইয়া নাট্যালয় সমূহ যেমন ধর্ম্মময় অভিনয় দেখাইয়া বাহবা পাইতেছেন, ইঁহারাও সেই রূপ সুবিধা পাইয়া নিজ ২ পসার বৃদ্ধি করিবার অবকাশ পাইতে-ছেন। কেহ বলিতেছেন, আইস, তোমায় যোগ দিব, কেহ বলিতেছেন আইস তোমায় ব্রহ্ম জ্যোতিঃ দেখাইব। কেহ বলিতেছেন আইস তোমায় চন্দ্রলোকে লইয়া যাইব। এই রূপ নানাবিধ সুরে পেসাদার সাধক সম্প্র-দায় আসরে গান জমাইয়া দিতেছেন। ব্যাধের মোহন সুরে প্রলোভিত হইয়া হরিণ গণ যেমন ছুটিয়া আসে, সেই রূপ শিক্ষিত বাবু মুগ্ধ হইয়া ঝাঁকে২ দলে২ আসিয়া ধর্ম্মব্যাধের জালে জড়াইয়া পড়িতেছেন। বড় বিষম সময় পড়িয়াছে। কে সাধু, কে অসাধু কে খাঁটি কে মেকি, ইহা চিনিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাঁহাকে তুমি শ্রদ্ধা কর, ভক্তি কর, যাঁহার উপ-দেশ শুনিতে তুমি আগ্রহ প্রকাশ কর, এমনতর ব্যক্তি নিজ সাধনার গুহ্য কথা প্রকাশচ্ছলে তোমাকে হয় ত বলিলেন, এই মহাত্মা বেদব্যাস সূক্ষ্ম শরীরে আমাকে দেখা দিয়া গেলেন, এই মহাত্মা বশিষ্ঠ লিঙ্গ শরীরে আসিয়া আমার তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন, এই সমস্ত কথা শুনিয়া তুমি ভাবিবে, "গুরু আমার সিদ্ধ পুরুষ"। যাঁহার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তিনি ঐরূপ কথা বলিলে কাযেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে হয়। তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতেও তুমি শিহরিয়া উঠ, সুতরাং তিনি যে সিদ্ধ, ইহা তোমার কাছে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইল। কিন্তু ইহাই কি সিদ্ধির পরিচয়? ঐ রূপ দুই চারিটা ফাকা কথাই কি সিদ্ধির লক্ষণ? সিদ্ধির ফল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ব্যারামে কাতর হইয়া যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছি, এমন সময় গুরুদেব পদ্ম হস্ত বুলা-ইয়া দিলেন, ব্যাধির শান্তি হইল, এই রূপ একটু আধটু শক্তির সঞ্চার না হইলে সিদ্ধি বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর সিদ্ধি না হইলেও গুরু চিনিবার উপায় নাই। সাংসারিক জগতের উন্নতি যেমন ঋদ্ধি, ধর্ম্মজগতের উন্নতি সেই রূপ সিদ্ধি! নিষ্কাম ধর্ম্ম এবং মুক্তি এ সমস্ত ফাঁকি দিবার কথা। "যাহারা কামনার দাস, তাহারাই সিদ্ধি চায়, যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা সিদ্ধি চাহেন না," এ কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু ইহা তোমার আমার মত নিম্নাধিকারীর জন্য নহে। আমাদের মত জীব সকাম উপাসনার ভিতর দিয়াই নিষ্কাম মার্গে যাইবে। সিদ্ধির ভিতর দিয়াই

মুক্তি পথের পথিক হইতে পারিবে। সিদ্ধি মুক্তি পথের বাধক নহে কিন্তু সাধক। যাঁহারা সিদ্ধিকে অকিঞ্চিৎকর, মুক্তি পথের প্রতিকূল বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহাদের কথাটা বিচার করিয়া দেখিতে হইতেছে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"বিষয়বতী বা প্রবৃত্তি রুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী"।
যোগসূত্র ১ম পাদ, ৩৫ সূত্র।

মহর্ষি বেদব্যাস ইহার নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "যোগী যখন নাসিকাগ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনকে স্থির করিতে পারিবেন, তখন তাঁহার স্বর্গীয় গন্ধানুভব রূপ এক সিদ্ধির উৎপত্তি হয়, এই রূপ যখন জিহ্বাগ্রে মনকে স্থির করিতে পারিবেন, তখন স্বর্গীয় রসানুভব রূপ সিদ্ধির উৎপত্তি হয়, এই সমস্ত সিদ্ধি উৎপন্ন হইলে যোগীর মন যোগমার্গে দৃঢ় হয়—মুক্তি মার্গে তাহার আন্তরিক বিশ্বাস জন্মে। যদিচ শাস্ত্রোপদিষ্ট তত্ত্ব রাশি সমস্তই সত্য সমস্তই বিশ্বাস যোগ্য, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একটা তত্ত্ব প্রত্যক্ষগোচর না হয়, ততক্ষণ কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ততটা প্রাণের বিশ্বাস জন্মেনা। সুতরাং বিশ্বাস বর্দ্ধনের জন্য, শাস্ত্রীয় উপদেশের যাথার্থ্য পরিপুষ্ট করিবার জন্য কোন রূপ বিশেষ, কোন রূপ শক্তি, কোন রূপ সিদ্ধি অর্জ্জন করা যোগীর পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই রূপ শক্তি লাভ হইলে মুক্তি আদি সূক্ষ্ম তত্ত্ব শ্রদ্ধালু যোগীর পক্ষে প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে ধাবিত হইতে পারেন। সুতরাং সিদ্ধি মুক্তি ক্ষেত্রের প্রতিকূল নহে, কিন্তু অনুকূল। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণির যোগী তাঁহাদিগকে সিদ্ধি চাহিতে হয় না। নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছিলে সিদ্ধি স্বয়মেব আসিয়া তাঁহাদের পদানত হয়। যাঁহারা এই সিদ্ধির প্রলোভনে পড়িয়া ইহাতেই মজিয়া থাকেন তাঁহারাই মুক্তিপথ-ভ্রষ্ট হন। উচ্চ শ্রেণির সাধকেরা সিদ্ধি শক্তির পরিচালনা করেন না, তাঁহারা সিদ্ধিকে প্রকৃত পথের পরিচয় স্বরূপ মনে করিয়া মুক্তি পথেই অগ্রসর হন। শাস্ত্রে যে কোথাও ২ সিদ্ধিকে মুক্তিপথের প্রতিবন্ধক বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধির নিন্দা নহে, কিন্তু সিদ্ধি শক্তির পরিচালনারই নিন্দা করা হইয়াছে। শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই তাহা। কি জ্ঞানমার্গ, কি কর্ম্মমার্গ, কি যোগমার্গ, কি ভক্তিমার্গ এই সমস্ত মার্গে সাধক ঠিক যাইতে পারিতেছেন কিনা, সিদ্ধিই তাহার এক মাত্র পরিচয়। সিদ্ধিই সাধকের প্রাণে ভরসা আনিয়া দেয়, ঘোর অন্ধকারে জ্বলন্ত দীপের ন্যায় সিদ্ধিই সাধককে নিগূঢ় মার্গের সূচনা করিয়া দেয়। বিচিকিৎসা-পরায়ণ ব্যাকুল-জীবন সাধকের প্রাণে সিদ্ধিই শান্তি ঢালিয়া দেয়। বিভীষিকার বিষম দুর্দ্দিনে কল্যাণকাঙ্ক্ষিণী জননীর ন্যায় সিদ্ধিই সাধককে বুকে করিয়া রক্ষা করেন। যে সিদ্ধির অভয়বাণী—মৃদু মধুর মন্দ্রধ্বনি শ্রবণ করিয়া, আশার আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া সাধক উর্দ্ধশ্বাসে সাধনার পথে ছুটিতে থাকেন, যে সিদ্ধি দূতীর ন্যায় রাজরাজেশ্বরী মুক্তির অদূরে আগমন বার্ত্তা সাধকের কানে ২ বলিয়া দেয়, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া—মুক্তির শত্রু বলিয়া যিনি উড়াইতে চাহেন, তিনি হয় ভ্রান্ত, নয় প্রতারক। বহুদিনের রোপিত পুষ্পলতা যখন ফুলরাশি বুকে করিয়া সৌন্দর্য্যের মাধুরীতে ভরপুর হইয়া উঠে, তখন রোপণ-কর্ত্তার প্রাণে কেমন আনন্দ হয় বল দেখি? সেই রূপ চিরদিনের পোষিত সাধনালতিকা যখন সিদ্ধিরূপ পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত হইয়া সাধকের চরণ তলে উপহার দেয়, তখন তাঁহার উৎসাহ আনন্দের মর্ম্মগাথা তুমি আমি জগতের লোক তাহা কি বুঝিব?

প্রকৃত সাধক সিদ্ধি কুসুমের সৌরভ আঘ্রাণ করেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে মজিয়া যান না, সৌগন্ধে তাঁহার প্রাণ প্রফুল্ল হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি অন্ধীভূত হয়েন না। মৃগমদ কস্তুরির সৌগন্ধে উন্মত্ত

হইয়া মৃগ যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, তেমন তিনি অধীর হন না। স্থির ধীর গম্ভীর সাগরের ন্যায় অটল অচলের ন্যায় তিনি নিস্তরঙ্গ নিথর হইয়া থাকেন। তাঁহার ভিতরে যে রত্নরাজি জ্বলিতেছে, জগৎকে ডাকিয়া তাহা তিনি দেখাইতে চাহেন না, নিজের শোভায় নিজে মাতিয়া আপনার রসে আপনি পাকিয়া বনভূমি আলো করিয়া তিনি বিরাজ করেন। পুষ্করিণীতে কমল যখন ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার সৌগন্ধের আকর্ষণে ভ্রমর আপনা আপনি ছুটিয়া আসে, কমল ত ভ্রমরকে ডাকিতে যায় না। সাধনার সরোবরে সাধক যখন ফুটিয়া উঠেন, তখন তিনি জগৎকে ডাকিতে যান না, জগৎ তাঁহার মাধুরী দেখিবার জন্য আপনা আপনি দৌড়িয়া আসে। মনুষ্য শরীরের ভিতরে মন মাঝারে যখন কোন আহ্লাদ বৃত্তির উদ্রেক হয়, তখন মনুষ্য শরীরের বাহিরে পুলকোদ্গম হাস্যাদি রূপে তাহা আপনা আপনিই যেমন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেই রূপে সাধকের অন্তঃকরণ রূপ রত্ন বেদীতে সিদ্ধি রূপ মণি মুক্তা যখন জ্বলিয়া উঠে, তখন তাহার অতুল শ্রী চারিদিকে সহস্র ধারে আপনা আপনিই বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। দাড়িম্ব ফল সুপক্ক হইলে তাহার অন্তস্থিত দানা গুলির শোভা দাড়িম্বের গর্ভকোষ ভেদ করিয়া যেমন স্বয়মেব বাহির হয়, সেই রূপ সাধকের হৃদয়াকাশ ভেদ করিয়া সিদ্ধি-চন্দ্রমার নির্ম্মল আলোকের ছটা আপনা আপনি ফুটিয়া বাহির হয়। তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হয় না, দুন্দুভিনাদে তাঁহাকে নিজ মাহাত্ম্য জগতে বিঘোষিত করিতে হয় না।

সুতরাং সিদ্ধ পুরুষের কথা স্বতন্ত্র, আর ভণ্ড দলের কথা স্বতন্ত্র। এই ভণ্ডদের কথায় যাঁহারা আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু উপায় তদ্‌বিপরীত, তাই ভ্রান্ত বলিতেছি। কতক গুলি নিম্ন শ্রেণির মুদ্রা কতক গুলি সামান্য হঠ যোগের প্রক্রিয়ার কল্যাণে যাঁহারা আপনা দিগকে ব্রহ্মজ্ঞ—যোগানন্দ-নিমগ্ন মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তাহাদের বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি শারীরিক প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে [নাম করিবার প্রয়োজন নাই] সেই প্রক্রিয়াটি করিলে সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়া "আঃ বড় আরাম" এই রূপ একটি আরামের অনুভব হয়। প্রক্রিয়া বিশেষের এমন গুণ আছে। এখন স্বার্থপর গুরু তোমাকে সেই টুকু শিখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন, ইহাই ব্রহ্মানন্দানুভূতি। দেখুন দেখি, কি ভয়ানক প্রতারণা! যে ব্রহ্মানন্দানুভূতি নির্ব্বিকল্পসমাধি-গম্য ইন্দ্রিয়গণ সহিত মনের সম্পূর্ণ বিলয় হইলে যে তুরীয় পদার্থের অনুভব হয়, আজ তুমি আমি সংসারের কীট ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস, সেই আনন্দ অনুভব করিবার কি অধিকারী? শাস্ত্রে আছে বটে ব্রহ্ম রসস্বরূপ—আনন্দ স্বরূপ, কিন্তু তাই বলিয়া সাংসারিক আনন্দ—শারীরিক আনন্দ আর ব্রহ্মানন্দ কি এক জিনিষ? যদি তোমার প্রক্রিয়াজনিত আনন্দ ব্রহ্মানন্দ হয়, তাহা হইলে আরামান্তে দুগ্ধ ফেণ নিভ শয্যায় শয়ন করিলে যে আরাম টুকু হয়, সেই শারীরিক প্রক্রিয়া জনিত আরামকে ব্রহ্মানন্দ বল না কেন? এক রূপ মুদ্রা আছে, চক্ষু বুজিয়া তাহা করিতে হয়। চক্ষুকে রগড়াইলে চক্ষুর ভিতরে যে এক রূপ আলো দেখা দেয়, পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাতেও ঐ শ্রেণির একটা আলোক দর্শন হয়। গুরু তোমাকে বুঝাইলেন উহাই ব্রহ্মজ্যোতিঃ। তুমি যোগ সম্বন্ধে নূতন ব্রতী, ইংরাজি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইলেও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে তোমার হাতে খড়ি, সুতরাং গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিতে তোমার দ্বিধা নাই। এমন অবস্থায় তোমার চক্ষে ধূলি দেওয়া গুরুর দিব্য সামর্থ্যায়ত্ত। আমি বলিতেছি না, পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া গুলির দ্বারা কিছু মাত্র উপকার পাওয়া যায় না [অন্ততঃ অর্থাগমেরও ত সুবিধা হইতেছে] আমরা ইহাই বলিতেছি, কাচকে হীরা বলিয়া বুঝাও কেন? গিল্টিকে সোনা বলিয়া প্রতিপন্ন

কর কেন? যাহা নয়, তাহাকে তাহাই বলিয়া বাহাদুরি লও কেন? কতক গুলি শারীরিক কসরৎকে মনোবৃত্তি-নিরোধ রূপ যোগ বলিয়া বুঝাওকেন? যোগের সহিত যে মনের এবং আত্মার সম্বন্ধ, পূর্ব্বোক্ত মুদ্রা গুলির সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধই নাই। এই কাশীধামের রাস্তায় ২ একটি লোক কত রকমের হঠযোগের প্রক্রিয়া (আসন মুদ্রাদি) দেখাইয়া বেড়াইতেছে। একটি পয়সা দিলেই তাহা তুমি দেখিতে পাইবে। একটি পয়সা খরচ করিয়া যাহা দেখিতে পাও, তাহার জন্য পাঁচটি টাকা ফিস্বরূপ খরচ কর কেন? এই যে লোকটি হঠযোগের প্রক্রিয়া দেখাইয়া বেড়াইতেছে, ইহাকে কি তুমি যোগী বলিতে চাও? এ ব্যক্তি যদি যোগী হয়, তবে ইহাকে গুরুতে বরণ করিতে তুমি কি প্রস্তুত আছ? তাই বলিতেছি সাধু! সাবধান! বাহ্য ভুলিওনা। সিদ্ধির কষ্টি পাথরে কসিয়া দেখ যে গুরুর গুরুত্ব জন্মিয়াছে কিনা? শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দেখ প্রকৃত লক্ষণ গুলি তোমার গুরুতে ফুটিয়াছে কিনা। যাহা শাস্ত্রের সহিত মিলিতেছে না, স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেও তাহা মানিব না। কাহারও চোখ রাঙ্গানিতে ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত অশাস্ত্রীয় কাণ্ডের তীব্র মর্ম্মভেদী প্রতিবাদ হওয়া উচিত। দেশে শাস্ত্র জ্ঞানের অভাব হইয়াছে বলিয়াই ধূর্ত্তগণ নিজ পছন্দসই মত, নিজ স্বার্থ সাধক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিবার অবসর পাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফাঁকা কথায় ভুলিয়া কাহারও চরণ তলে লুণ্ঠিত হইওনা। বিভূতি দেখিয়া, শক্তি দেখিয়া গুরুর চরণে শরণ লও। কেহ হয়ত বলিবেন, তুমি কি ছেলে মানুষ, গুরুর কি দায় পড়িয়াছে, তিনি তোমাকে সিদ্ধি দেখাইয়া উদ্ধার করিতে আসিবেন। একথার উত্তরও পূর্ব্বে ইঙ্গিতে দিয়াছি। আরও একটু বলিতে চাই। যে কামিনী স্বভাব সুন্দরী, তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নিজ সৌন্দর্য্য শত বার লুকাইতে চেষ্টা করিলেও তাহার দীপ্তি ঝলকে ২ বাহির হইয়া আসে, সেই রূপ মহাত্মাগণ নিজ শক্তি লুকাইতে চেষ্টা করিলেও তাহার প্রতিভা কোথা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। যে সমস্ত মহাত্মা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ, সময়ে ২ দয়ার টানে পড়িয়া ভস্মস্তূপ ভেদ করিয়া তাঁহাদের শক্তি-অগ্নির আলোকরেখা পতিত জীবের আঁধার কুটিরে দেখা দেয়। সুতরাং নানারূপে মহাত্মাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। জীবের সুসময় হইলেই তাহা ঘটিয়া থাকে।

বেদ বিদ্যালয়।

কাছাড় শিলচর হইতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেনগুপ্ত কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আমি এক জন ক্ষুদ্র চিকিৎসক। বেদবিদ্যালয়ের সাহায্য কল্পে আমার বিশেষ উৎসাহ আছে। আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে বেদবিদ্যালয়ের কিরূপ সাহায্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সহজ উপায় হওয়া চাই যাহাতে লোকের কোন কষ্ট না হয়। ভাবিতে ২ আমার মনে উদয় হইল যে প্রত্যেক রোগীর কাছ হইতে বেদবিদ্যালয়ের জন্য ／০ এক আনা করিয়া লইলে বেশ সুবিধা হইতে পারে। আমি সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে অনেক স্থানে ফল লাভ করিয়াছি। এ যাবৎ যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা হইতে ৫৲ পাঁচ টাকা গত অগ্রহায়ন মাসে শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠ চন্দ্রগুপ্ত মহাশয়ের সহিত একযোগে বেদ-বিদ্যালয়ের লেখাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়াছি। অদ্য রাণিগঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত অমর চাঁদ মিত্র মহাশয়ের ১০ টাকা মনি অর্ডারের সহিত ৫৲ টাকা পাঠাইলাম। বক্রি টাকা পরে পাঠাইব।

" কাশীপুর নিবাসী " পত্রিকা লিখিয়াছেন—"

কাশীধামে পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উদ্যোগে বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার কার্য্য অতীব উৎসাহের সহিত নির্ব্বাহ হইতেছে। পরিব্রাজক মহাশয় যদ্যপি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তবে আবার এই ভারত ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশে ২০ পূর্ব্বের ন্যায় বেদপারগ ব্রাহ্মণ দিগের অভ্যুদয় হইবে। উল্লিখিত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে মুষ্টি ভিক্ষার নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে তাহা অতীব মঙ্গলজনক। অত্রজেলায় যে সকল মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে, বরিশাল, পিরোজপুর ও গাভা প্রভৃতি বহুসংখ্যক স্থানের অধিবাসীগণ দ্বারা বেদবিদ্যালয়ের সাহায্য হইতেছে।

রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ লিখিয়াছেন—

কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ৯ই জ্যৈষ্ঠ কাকিনার আগমন করেন, ইনি যে কয়েক দিন এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সে কয়েক দিনই খুব ধর্ম্মালোচনা ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল, কাকিনার রাজা বাহাদুর কুমারের যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, নানা স্থানের অনুরোধ জন্য তিনি এখানে বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রঙ্গপুর গমন করিয়াছেন, সেখান হইতে কলিকাতা যাইবেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের বেদবিদ্যালয়ের জন্য কাকিনীয়াধিপতি মাসিক ১০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

বেদ বিদ্যালয়ের জ্যৈষ্ঠ মাসে সাহায্য প্রাপ্তি।

মুষ্টি ভিক্ষা।

শ্রীগতিনাথ রায় কাকিনীয়া রঙ্গপুর ॥০
" রমানাথ ঘোষ মগুলাই বারাসত ১॥০
" বক্‌সী রামদাস গোলা হাজারিবাগ ১২।০
" ভুবন মোহন সেন আমিনপুর ঢাকা ২॥৵০
" হরিনাথ বসু হেতমর্থা রাজসাহি ২।০
" রাজ গোপাল শর্ম্মা কেশবপুর শ্রীহট্ট ১।০
৺কাশীধামের চৈত্র মাহার বাকী মুষ্টি ভিক্ষার মূল্য ১৲
শ্রী নীলকমল মজুমদার মাতলাখালী পাবনা ২৷৵০
" মেঘবরণ মিশ্র দেওয়ান বড়কোপ গড়া ৪।/০
" বিপিন বিহারি রায় গয়া ৵০
" রামসুন্দর রায় ইটাভা ভেদিয়া ৩/০
" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মৈদাবাদ ৩॥০
" রমনীমোহন বসু ঘাসিপাড়া দিনাজপুর ৯৶০
" রাজেন্দ্র মোহন দত্ত আজিমগঞ্জ ২৲
" বিশ্বম্ভর দাস ঘোষ পিপলন মেমারী ১৵০
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশাল ২০৲
" কালীদাস চক্রবর্ত্তী আমড়পুর মেমারী ০৷/০
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় চেলেপাড়া ভবানীপুর ১৲
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় কুগুলা বীরভূম ২০৲
" রাজিব লোচন দাস মৈনা শ্রীহট্ট ।৵০
" দীননাথ পাত্র রামপুর হাট ৪॥/০
" রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় শিকারপুর [illegible]
" হরলাল দাস গুপ্ত ধুবড়ি ৮০
" মুরারী চরণ পাল মেদিনীমহল শ্রীহট্ট ২./০
" চৈতন্য চরণ দাস চোহট্টা শ্রীহট্ট ৫৲
" ব্রজ কুমার দে ধাতাইল শ্রীহট্ট ৪৲
" হরনাথ সেন গুপ্ত নারায়নদিয়া ঢাকা ॥০
" রাখালদাস সেন জামালপুর ১॥/০
" রামকৃষ্ণ পুরী রামকোলা সারণ ৬./০
" কুঞ্জমোহন গোস্বামী সুনামগঞ্জ শ্রীহট্ট ৬৲
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়িয়া ২০৲

এক কালীন দান প্রাপ্তি।

শ্রী গোরাচাঁদ সরকার কান্দী ১৲
" উমাচরণ রায় ৺ কাশীধাম ২৲
" কিশোরীলাল মিত্র গাজিপুর ১৵০
" রাজমোহন চক্রবর্ত্তী কেওটখালী ঢাকা ৫৲
" তারাপ্রসন্ন মৈত্রেয় শিকার পুর ১৲
" সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩নং সিমলাপটী কলিকাতা ১৲

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৩শ ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১২
৪র্থ সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	শ্রাবণ—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্ মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্।

যাঁহারা বলেন, দ্বিজাতি শূদ্রজাতির কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, তাঁহাদের মত আমার অনুমোদিত নহে। কেননা আত্মা স্বয়ং স্ত্রীতে পুত্র রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমং।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং ভার্য্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ।

বর্ণের অনুলোম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ক্রমান্বয়ে তিনটি দুইটি ও একটি ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নিজবর্ণের এবং ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের কন্যা, ক্ষত্রিয় নিজবর্ণের ও বৈশ্যের কন্যা এবং বৈশ্য কেবল নিজ বর্ণের কন্যা পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারেন। শূদ্রও কেবল নিজ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যালঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেক বিংশতিং।

বিধি বিহিত নিয়মানুসারে জামাতাকে আহ্বান করিয়া কন্যাকে নিজ শক্ত্যনুসারে অলঙ্কৃত করিয়া যে সম্প্রদান করা যায়, তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। এই প্রকার বিবাহে উৎপন্ন পুত্র ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ এবং নিজ পিতৃপুরুষ এই এক বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকেন।

যজ্ঞস্থ ঋত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোদ্বয়ম্।
চতুর্দ্দশ প্রথমজঃ পুনাত্যুত্তরজশ্চ ষট্।

যাজ্ঞিক পুরোহিতকে যে কন্যা সম্প্রদান করা যায়, তাহার নাম দৈব বিবাহ। এই বিবাহে উৎপন্ন পুত্র চতুর্দ্দশ পুরুষকে পবিত্র করেন। দুইটি শুক্লগাভী গ্রহণ করিয়া যে কন্যার সম্প্রদান হয় তাহার নাম আর্ষ বিবাহ। এই বিবাহোৎপন্ন পুত্র ষট্ পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করেন।

ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তের্থিনে।
স কায়ঃ পবেয়েত্তজ্জঃ ষট্ষট্ বংশ্যান্ সহাত্মনা।

তোমরা দুই জনে মিলিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, এই প্রকার বলিয়া বিবাহ-প্রার্থীকে যে কন্যা সম্প্রদান করা হয়, তাহার নাম কায় বিবাহ। তাদৃশ বিবাহোৎপন্ন পুত্র দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করেন।

আসুরো দ্রবিণাদানাৎ গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্ মিথঃ।
রাক্ষসো যুদ্ধ হরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ।

বহুধন পণ স্বরূপে লইয়া যে কন্যা সম্প্রদান, তাহার নাম আসুর বিবাহ। কন্যা ও বর এতদুভয়ের পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি ক্রমে যে বিবাহ, তাহাকে

গান্ধর্ব বিবাহ বলে। বল পূর্ব্বক যুদ্ধ দ্বারা কন্যাকে অপহরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ, আর ছল পূর্ব্বক যে বিবাহ, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।

ক্রমশঃ।

ভ্রম।

ভ্রম মধুর, সুন্দর। সত্যের অতলস্পর্শী অনুসন্ধানে মনুষ্যের অনেক সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। তুমি জ্ঞানী, তুমি তত্ত্বজ্ঞ, তুমি বলিবে ভ্রম অন্ধকার, ভ্রম দুঃখ, ভ্রম অসভ্যতা; সত্যের আলোকে, সত্যের পবিত্রতায় মনুষ্য ধীরে ২ উন্নতির এবং সভ্যতার সোপান আরোহণ করিতেছে। আমার ধারণা স্বতন্ত্র ও বিপরীত। আমি বুঝি, ভ্রম না থাকিলে সংসারে কেহই সুখী হইতে পারিত না, ভ্রমে না পতিত হইলে সৌন্দর্য্যের, কোমলতার, মাধুর্য্যের আস্বাদ পাওয়া যাইত না।

ক্ষুদ্র পৃথিবীর এক স্থানে বসিয়া শারদেন্দুর ভুবন-ভুলান জ্যোৎস্নাচ্ছটায় পরিস্নাত হইয়া তুমি ভাবিতেছ যে জগৎ আলোকময়, কোমলতাময়। আকাশ পথে চন্দ্র কিরণের ছুটাছুটি গড়াগড়ি ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যে যদি সমীরণ হইয়া হাঁসিয়া ২ দুলিয়া ২ আকাশের উপর সাঁতার দিয়া ভাসিয়া যাই-তাম, মাঝে ২ অগাধ চন্দ্রালোকে ডুব দিয়া তারা-মাছের সহিত খেলা করিতাম, আহা হইলে কত সুখই হইত। কিন্তু যদি সত্যের চক্ষে, জ্যোতিষের চক্ষে দেখ, ত জানিতে পারিবে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারময়। অন্ধকারের উপর অন্ধকার রাখিয়া, পরতে ২ অন্ধতামস মাখাইয়া অনন্ত অন্ধকার-সাগরের উপরে ক্ষুদ্র ২ বুদ্‌বুদের ন্যায় অনন্ত গ্রহ উপগ্রহতারামালা পুট্ পুট্ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে আবার অন্ধকার গর্ব্বে ডুবিয়া যাইতেছে। নীলাম্বুর নীলিমাকে প্রগাঢ় করিয়া জ্যোতিষ্ক-গণ কেমন যেন চিক্ চিক্ করিতেছে। এই বিশ্বব্যাপী তমিস্রার ভিতরে শ্যামা শক্তির বিরাট ক্রীড়া হইতেছে, কালো আকাশের উপর এই খেলার গরমে কি যেন চমকিয়া উঠিতেছে, এই চমক্ এই কম্পনই আলোক; ক্ষুদ্র ২ তারা গুলি এই আলোক লইয়া নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করিতেছে কিন্তু মহাকালীর শ্যাম শোভায় সে জ্যোতি নিভিয়া যাইতেছে, স্তূপে ২ অন্ধকার আসিয়া জমাট বাঁধিতেছে। অতএব বুঝিলাম যতক্ষণ ভ্রমে ছিলাম, ছিলাম ভাল; মনে ২ মনের সাধ মিটাইবার চেষ্টা করিতাম; কিন্তু বিজ্ঞান কর্কশ স্বরে আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।*

যৌবন প্রারম্ভে সুখের সংসার পাতাইয়াছি। আশার জল সিঞ্চন করিয়া, উৎসাহ, উদ্যমের বেড়া দিয়া সুখের তরু শিশু পালন করিতেছি। প্রাণ পুত্তলি পুত্রকে কোলে করিয়া কত আশার ফাঁদ পাতিয়া কত সুখের মৃগ ধরিয়া থাকি। মনে হয় আমি চিরজীবী, আমার পুত্র অমর, আমার মাতাপিতা সবল এবং দীর্ঘায়ু; চেষ্টায় ও পরিশ্রমে কত অর্থ উপার্জ্জন করিব, বিলাসময় প্রাসাদ প্রস্তুত করিব, কত সাধ মিটাইব। ধীরে ২ কল্পনা প্রসারিত হইতে থাকে, সম্ভব, অসম্ভব কত ইচ্ছা আসিয়া জুটে। দরিদ্র হইতে গৃহস্থ, গৃহস্থ হইতে ধনী, ধনী হইতে রাজা, রাজা হইতে সার্ব্বভৌম সম্রাট, একে ২ সকল আকাঙ্খা গুলি সুখের সরোবরে কমলরূপে ফুটিতে থাকে, আশার মলয় পবন হিল্লোলে তাহারা একটির উপর একটি কেমন হেলিয়া দুলিয়া পড়ে, বিলাস-ভ্রমের ভ্রমর আসিয়া কেমন গুণ ২ গুঞ্জনে চারি দিক্ মাতাইয়া তোলে। বাসনার রাজহংস সকল কেমন ভাসিয়া ২ ঘুরিয়া ২ বেড়ায়, আমার আনন্দের আর সীমা থাকে না। কিন্তু "কাজের লোক" হঠাৎ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

---

* See Mr. Steven Allan's article on the "Newly discovered Law in Physics" in the April number of the "Arena."

বলিল "দেখ"। আমি দেখিলাম—মহাশ্মশান। হতাশা, যন্ত্রণা, অত্যাচার, অপবিত্রতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা আদি মহাপাপ সকল ডাকিনী, প্রেতিনী রূপে অট্ট ২ হাঁসিতে ২ সেই শ্মশানে নৃত্য করিতেছে; প্রকাণ্ড চিতাকুণ্ডে জগতের লোক পুড়িতেছে। সেই ভীষণ অগ্নিজ্বালার মধ্যে দেখিতে পাইলাম আমার সকল আত্মীয় পুড়িতেছে, আমার সর্ব্বস্ব, আমার আমিত্ব পুড়িয়া জ্বলিয়া খাক্ হইতেছে। অমনি সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল, ভ্রমের দিব্য জ্যোতি দূরে গেল, সত্যের তমিস্রা আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিল; ভ্রমের মধুরতা ভুলিলাম, সত্যের বিকটতা আসিয়া ভীত করিল।

মায়ার উপাদানে, ভ্রমের ভিত্তিতে সংসার চিত্রিত; এমত অবস্থায় কি সত্যের প্রচার করা উচিত? কামিনীর কমনীয়তা কিছুই নহে ছায়া মাত্র, ভাব মাত্র। সেই মাংস, সেই মজ্জা, সেই মেদ আমারও ভিতরে আছে তাহাতেও আছে, তবে কি—জানি একটা কেমন মোহ আছে তাহাতেই যত গোল ঘটায়। এই কি-জানি-কিই ভ্রম, এবং মাধুর্য্য। জন্মিলেই মৃত্যু, তাহা আমিও জানি, আমার মাতাও জানেন, পিতাও জানেন, গৃহিনীও বেশ বুঝেন; তবে প্রকৃত কথাটার উত্থাপন করিলেই যত গোল বাধিয়া যায়। নেশা ভাঙ্গিবার ভয়ে গুলিখোর যেমন জলের আবশ্যকতা বুঝিয়াও জলে নামে না, তেমনি সংসারী মোহ ভাঙ্গিবার ভয়ে সকল কথা বুঝিয়াও বুঝেনা। কারণ ভ্রমেই প্রকৃত সুখ। রাজা হইব ভাবিলে যে সুখ, প্রকৃত রাজা হইলে সে সুখ নাই, আশাপথ চাহিয়া থাকিলে যে আনন্দ-উদ্বেগ, আশার সামগ্রী কাছে পাইলে সে আমোদ নাই, তবে প্রার্থিতবস্তু পাইলে যে একটা আমোদ হয় তাহা ক্ষণ স্থায়ী, এবং কেবল প্রাপ্তি জন্য নহে। আশার আশায় সাহস করিয়া যে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, পাইব ভাবিয়া মনে ২ যে কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি জন্য, সেই স্বপ্নের পূর্ণতার জন্য বিদ্যুদ্দিকাশবৎ প্রাণের ভিতর দিয়া কেমন একটা পরিতৃপ্তির লহর চলিয়া যায়। কত হাত ঘুরিয়া অর্থ আমার হাতে আসিয়াছে তাহাতে আমার কিছু নাম লেখা নাই, ক্ষেত্রের উপর গ্রামের উপর অনাদিকাল হইতে কিছু আমার দখলিস্বত্ব নাই। কত কোটী ২ লোক তাহাদের অধিকারী হইয়া আবার ধূলিসাৎ হইয়াছে, তত্রাচ কেমন আমার বলিয়া জ্ঞান জন্মিলেই সেটা আমার হইল। জমীদারী অবস্থিত বেহারে, তুমি কলিকাতায় বসিয়া আমার মুখের উপর বল যে উহা তোমার নহে আমার, তবেই যত গোল যত মোকদ্দমা। কেননা আমার ভ্রমের ভিতরে কেমন যে একটা সুখ নিহিত আছে, যাহার ইহ সংসারে আমার বলিবার আছে সেই বুঝিতে পারিবে। তাই বলিতে ছিলাম ভ্রমপ্রমাদ ত সবই, তবে বৃথা একটা খট্‌কা লাগাইয়া আমার সুখের তন্দ্রা কেন ভাঙ্গিয়া দাও?

ভ্রম দুঃখ, ভ্রম ভয়। কিন্তু সে দুঃখ, সে ভীতির ভিতর দিয়া কেমন লুক্কায়িত ভাবে সুখের স্রোত ঝির ২ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। যাহাকে বড় ভাল বাসি, বড় ভয় হয়, পাছে সে আমার সহিত বাদ সাধিয়া, আমাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায়; মৃত্যু আসিয়া আমার প্রণয়ের বাসর ভাঙ্গিয়া দেয়। ভয় হয় বটে, এবং সেই ভয় জন্য একটা অনির্ব্বচনীয় শোক আসিয়া হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া তোলে; তত্রাচ অত ভয়, অত উদ্বেগের মধ্যেও একটা সুখ আছে। সেটা ভালবাসার অনুভব সুখ—না ভাল বাসিলে ত সে গূঢ় সুখ অনুভব হইত না। ভ্রমে পড়িয়া ভাল বাসিয়াছি, ভ্রমবশতঃই প্রীতিপাত্রের অমঙ্গল চিন্তা আসিয়া সদাই মনকে আকুল করিয়া তোলে; আবার সেই ব্যাকুলতার মাঝে যে একটু সুখানুভব হয় তাহাও ভ্রমবশতঃ। স্নেহময়ী জননী পুত্রের জন্য বুক চিরিয়া হৃদয়ের সকল শোণিত ঢালিয়া দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রের প্রতি মুখবিকৃতিতে, ঔদাস্য ভাবে, সামান্য অসুখে তিনি মৃত্যুর করাল ছায়া

দেখিতে থাকেন। এমন অমঙ্গলের কথা স্মরণ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হয় না—হাত দিয়া ঠেলিয়া এ বিভীষিকা দূরে ফেলিতে চাহেন, তবুও সে "পোড়ার" চিন্তা আসিয়া স্নেহের হৃদয়কে তমসাচ্ছন্ন করে। ভ্রমের জন্যই এত দুঃখ, এত ভয় তিনি পাইয়া থাকেন; কিন্তু ভ্রম না হইলে ইহার মধ্যে যে একটু অনুভব সুখ, একটু পরিতৃপ্তির সুখ আছে তাহা ভোগ করিতে পাইতেন না।

কিন্তু বাস্তবিক ভ্রম ব্যতীত এ জগতে আর কিছু আছে কি? তোমরা কাহাকে সত্য বল জানিনা; পরন্তু তোমাদের মাপ কাটিতে যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিতে যাই; তাহাই আবার একটু চক্ষু ফুটিলে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সেই শৈশব-উষা হইতে এই যৌবন মধ্যাহ্ন মধ্যেই কত সত্য মিথ্যা হইল, কত মিথ্যা সত্য হইল। আবার তুমি যেটাকে সত্য বল, আমি তাহাকে মিথ্যা বলি। সংসারটা ভ্রমের বটে, ভ্রমান্ধ হইয়া সংসারে কত বাজার বসাইতেছি, কত বেচা কেনা করিতেছি; তবে এ ভ্রম রাজ্যে সত্যের কথা কে তুলিল? এইটিই বিষম প্রহেলিকা; কখনও এ বিষয় ভাল করিয়া কেহ বুঝাইল না হয়ত কেহ তেমন বুঝিলও না। তবে আমার এত মাথা ব্যথা কিসের? জগৎ শুদ্ধ সকলেরই কিন্তু এই প্রকার মাথা ব্যথা। বুঝি মায়ার সংসারে মায়াতেই সুখ, মায়াতেই আনন্দ, মায়াতেই অনেকটা পরিতৃপ্তি—সকলি ত বুঝি তত্রাচ সময়ে ২ কেমন যেন একলা হইয়া তফাতে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করে। মনে হয় আমি *একলা আসিয়াছি, একলা যাইব, আমার ইহারা কেহই* নহে। পরন্তু ইহাদের লইয়াই আমাদের "আমিত্ব; আমার পিতা, আমার পুত্র, আমার বাটী, আমার সংসার না থাকিলে আমি কি? এই সকল সম্বন্ধের সমষ্টিই ত আমি, কিন্তু আবার এই সম্বন্ধ, মায়ার সম্বন্ধ—ভ্রম সম্বন্ধ—মিথ্যা সম্বন্ধ। বুঝিলাম না কোথাকার লুক্কায়িত একটা "আমি" জ্ঞান আসিয়া আমাকে একলা করিয়া ফেলে—আমাকে সম্বন্ধ-হীন করিয়া তোলে। দর্শন শাস্ত্রের তর্ক দ্বারা আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিও না। কেননা আমি জানি ভ্রমবশতঃ লোকে তর্ক বিচার করিয়া থাকে, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত লইয়া লোকে নব ২ উপপত্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে; সুতরাং ভ্রম ঘুচাইতে হইলে, ভ্রমের কথা তুলিলে চলিবে না। তোমার চক্ষে যাহা সত্য, আমি তাহাকে সত্য বলিব কেন, তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা ঠিক কি না কেমন করিয়া জানিলে? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এখনও কত কথা লুকান আছে। ক্ষুদ্র মনুষ্য কীটাণু তুমি, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? তবে আমাকে বুঝাইতে হইলে এমন করিয়া বুঝাইতে হইবে যে আমি মনে মনেই মনের মত বুঝিয়া যাইব, আপনা আপনিই আমার সকল অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে। ইহা বড় কঠিন, অথবা আমার খেয়াল।

তাই বলিতেছিলাম যে এই ভ্রমের দুঃখ, ভ্রমের ব্যথা ভ্রম দিয়া মিটাইলে হয় না কি? ভ্রান্ত হইলেও বুঝি যে অনেক আশা, অনেক বাসনা এক জীবনে মিটে না একেবারে পরিতৃপ্ত হয় না। অনেকবার মন ভাঙ্গা হইয়া থাকিতে হয়। মনে হয় স্বপ্নের সংসারে স্বপ্ন দেখিতে ২ সুখের নন্দনকানন জুড়িয়া বসি। যাহা সহজে পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে যাহাকে অনায়াসে দেখা যায় তাহার জন্য ভ্রান্ত হইয়া ছুটিলে সে ঘুমের ঘোর শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। পরন্তু যাহাকে পাওয়া যায় না, মাথা কুটিলেও সহজে যিনি দেখা দেন না, পণ্ডিতে *যাহাকে মনুষ্যের চিন্তাবহির্ভূত, ভাবনার পরপারে,* কল্পনার সীমৈকদেশে আছেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তেমনই অচিন্ত্য, অননুভূত, অজ্ঞাত সুতরাং অপরিমেয় অনন্ত ব্যক্তির সেবা না করিলে নেশার ঘোর জমে না ভ্রমের মধুরতা বিকশিত হয় না। আমি মনে ২ কত সাজে তাঁহাকে সাজাইব, কত

খেলা তাঁহার সহিত খেলিব, হৃদয়ের যত সাধ, যত বাসনা একে ২ সকলিই প্রাণ ভরিয়া মিটাইব, আমার রুচিতে যাহা সুন্দর দেখি, ভাল দেখি, তেমিনই করিয়া তাঁহাকে সাজাইব—মানাইব ; তুমি তত্ত্বজ্ঞ—সত্যনিষ্ঠ, তুমি কিন্তু আমার প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, আমার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া আমাকে পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিতে পারিবে না—কারণ তুমি ত তাঁহাকে দেখ নাই। আমার ভ্রম আমি রাখিব, আমার স্বপ্নের সাগরে আমি সাঁতার দিব । আমি তাঁহাকে বাঁশি ধরাইব, আবার বাঁশি ছাড়িয়া অসি ধরাইব, আমার প্রবৃত্তি-মনশ্চক্ষুতে যাহা মনোহর দেখিতে চাহিবে, কল্পনা তেমনি করিয়া তাঁহাকে সাজাইবে। কিন্তু বিষম ভ্রান্ত সংসারের এই সুখ টুকুও সহে না—এমন পর সুখকাতর জগৎ কি আর কোথাও দেখিয়াছ ? আমার সুখের ভ্রমের উপর তাহারা একটা বিকট ভ্রম আনিয়া চাপিয়া দেয়। স্নেহ-ভালবাসার ভ্রম সুখকর—কিন্তু ঘৃণা-তুচ্ছ ঈর্ষ্যার ভ্রম যন্ত্রণাদায়ক। এই টুকু বুঝিলেই সুখ, নহিলে ত্রিভুবনে সুখ নাই, শান্তি নাই ।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্ম প্রচারে বিষম বিভ্রাট।

[কুচবিহার]

বিগত বৈশাখ মাসে কুচবেহারের মহারাজা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া কুমার-পরিব্রাজক ও তর্ক চূড়ামণি মহাশয় নিগূঢ়-গর্ভ আর্য্য শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য উদ্ভেদ করিয়া ব্যাখ্যা করিবার জন্য কুচবেহারে গমন করিয়াছিলেন। ১০। ১২ দিন ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি, ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা হওয়ায় তথাকার হিন্দু আবাল বৃদ্ধ বনিতা গণের হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের আর্য্য-শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানরহস্য-পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া আর্য্যধর্ম্মী মাত্রেই সুখানুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্ম-গণের স্বধর্ম্ম-প্রচারের ভবিষ্যৎ আশালতা উন্মূলিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন। কুমার-পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা-শ্রবণে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই যেমন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন তেমনই ব্রাহ্মগণ তাঁহার মুখে তীব্রাতিতীব্র উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় উপধর্ম্মরাশির অসারত্ব ও অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করিতে শুনিয়া মর্ম্মভেদী মনোবেদনায় কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন, খরতর তরঙ্গিনীর প্রবল প্রবাহে তৃণ ভাসিয়া যাওয়ার ন্যায় ব্রাহ্ম সমাজের চিরপোষিত মত গুলি ভাসিয়া যাইতেছে, তখন তাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাওয়া বন্ধ করিলেন এবং ভাবিলেন বুঝি আমরা না গেলে সভা শোভাহীন হইবে। কিন্তু যেখানে সহস্র সহস্র লোকে সাগ্রহে আসিয়া উপস্থিত হইত, যেখানে সুশিক্ষিত বিদ্বন্মণ্ডলী ও উচ্চ-পদস্থ মহোদয়গণ সকলেই আসিয়া নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তাঁহাদিগের ন্যায় অহিন্দু ২। ৪ জন না আসিলে সেই বৃহতী ধর্ম্মসভার কি ক্ষতি হইতে পারে! যখন দেখিলেন সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রচণ্ড বজ্রদণ্ডে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অস্থিরাশি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, আমরা শুনিলাম, তখন তাঁহারা অভিমানে ক্রোধে এবং বৈর-নির্যাতন-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীমন্মহারাজা ভূপ বাহাদুরের নিকট গিয়া কুমার পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে গোপনে অভিযোগ করিলেন। যাহাতে মহারাজা বাহাদুর পরিব্রাজকের বক্তৃতায় বাধা দিবার জন্য রাজকীয় বিধির ব্যবস্থা করেন, তাহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়। মহারাজাকে তাঁহারা এই রূপে বুঝাইলেন যে পরিব্রাজক অযথাভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা মহারাজার মহারাণীর ও মহারাজার শ্বশুরের ধর্ম্ম-মতকে অগত্যাই অবৈধ আক্রমণ করা হইতেছে। এরূপ ধর্ম্ম-বিরোধীর কার্য্যক্ষেত্র যাহাতে রাজ্য মধ্যে বিস্তৃত হইতে না পারে, রাজানুশাসন দ্বারা তাহার ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, মহারাজা যখন

স্বাধীন রাজা, তাঁহার রাজ-বিধি বিধান যখন ইংরাজ রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে কুমারী-পরিব্রাজকের কুচবেহারে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিতে পারেন অথবা তিনি তাঁহাকে নিজরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এই কুচবেহারস্থ ব্রাহ্মগণের হৃদয় যে রূপ সংকীর্ণ, বুদ্ধিমান্ ও রাজনীতিজ্ঞ শ্রীমন্মহারাজার হৃদয় সেরূপ নহে। তিনি রাজোচিত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ও ধর্ম্মপ্রচারক দিগের স্বাধীন স্বত্বের উচ্চ মর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে স্বধর্ম্ম প্রচার কালে যে আচার্য্যগণ পরধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করেন, তাহাতে পরধর্ম্মকে অক্রমণ করা বলা যায় না; স্বধর্ম্ম-সমর্থনার্থ স্বধর্ম্মের সারবত্তা এবং পরধর্ম্মের অসারতা প্রদর্শন করা সকল ধর্ম্ম-প্রচারক গণেরই আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে কিছু বিরুদ্ধ ভাব পরিব্রাজক নিজ বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মগণের অপ্রিয় হইলেও তাঁহার পক্ষে অযথোচিত হয় নাই এবং ইহাও প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার কএক জন আশ্রিত ব্যক্তি মাত্র ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য, কিন্তু তাঁহার প্রজা ও কর্ম্মচারী মণ্ডলীর অধিকাংশই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এবং সমস্ত হিন্দুই যখন পরিব্রাজকের বক্তৃতার একান্ত পক্ষপাতী ও অনুরাগী, তখন তাঁহার সাধু কার্য্যের বাধা দেওয়া রাজোচিত নহে এবং ইহাও দেখাইলেন, 'যদি পরিব্রাজক মহাশয়ের কার্য্যের বাধাই দেওয়া যায়, তবে তিনি এখন কুচবেহার রাজ্য ছাড়িয়া মোগল হাট হইতে ভারতের দূরাদ্দূরতরবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত এই রূপ বক্তৃতা করিতে থাকিবেন তখন আমরা তাঁহার কি করিতে পারিব! বরং তখন আমার আরও দুর্নাম বিঘোষিত হইবে। অতএব রাজবিধি এখানে পরিচালনা করিতে নাই। মহারাজা হিন্দু আচার ব্যবহার-পরিত্যাগী হইলেও শিষ্টাচার ও রাজনৈতিক ব্যবহারে বিলক্ষণ বিচক্ষণ; অল্পবয়স্ক এমন সুচতুর ও নিরভিমানী রাজা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজা বলিলেন, তোমরা অন্যবিধ প্রতিবাদ করিতে পার।'

মহারাজের নিকট নিরাশ হইয়া ব্রাহ্মগণ এক দিন নিজ ধর্ম্মের উপদেশ করিবার জন্য সভা আহ্বান করিলেন, তাহাতে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র শ্রোতা উপস্থিত হওয়ায় এবং তৎপর-পরদিন তাঁহাদের নগর-সংকীর্ত্তন কালে ২০।২১টি মাত্র লোক সমবেত হওয়ায় তাঁহাদের মনঃক্ষোভের আর সীমা থাকিল না। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক তাহার পরদিনই কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বুঝিয়া গেলেন—যে কেশব বাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ হইলনা। ব্রাহ্ম সমাজ কুচবেহারে এত দিন স্থাপিত হইয়াছে, মহারাজা, মহারাণী যে সমাজের সহায় ও ভরসা, কৈ তাহার কার্য্য ক্ষেত্র এখনও ত বিস্তৃত হইলনা। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের কএকদিন আন্দোলনে "মদন মোহনের" রাজ্য ভূমি আবার টলমল করিয়া উঠিয়াছে, আর্য্যভাবের উত্তাল তরঙ্গে সমস্ত কুচবেহার আনন্দে নাচিতেছে।

হা ব্রাহ্মগণ! তোমাদের এত দুর্দশা হইয়াছে তাহা আমরা জানিতাম না। ধর্ম্মবিস্তারের জন্য রাজরাজেশ্বর ভগবানের শরণাপন্ন না হইয়া তোমাদিগকে কুচবিহার-মহারাজের শরণাপন্ন হইতে হইল!! বুঝিলাম, নববিধানীদলের হৃদয়ের বল তিরোহিত হইয়াছে, জীবনের আশা অতি অল্প।

ব্রাহ্মগণ যখন অভিযোগ ও বক্তৃতাদ্বারা আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বিগণের কার্য্য পথ রোধ করিতে পারিলেন না, তখন 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ" নামক ব্রাহ্ম-সংবাদ পত্র হইতে "আর্য্য সমাজ ও মূর্ত্তিপূজা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ কুচবেহার স্টেট্ প্রেস হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করিয়া লোক মণ্ডলীতে বিতরণ করিলেন। ইহাতে আছে—দয়ানন্দের স্তুতিবাদ সহ আর্য্যধর্ম্মের ও সমাজের বিরুদ্ধ কয়েকটি অসার গর্ভ কথা।

দয়ানন্দ মূর্ত্তিপূজা মানিতেন না, গঙ্গা মানিতেন না, ফুল চন্দনাদি সহ পূজা মানিতেন না, তিনি বাল্য বিবাহের পরিবর্ত্তে ষোড়শী যুবতীর বিবাহ চাহিতেন, বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই বলিতেন, এই সমস্ত ধুয়া ধরিয়া হিন্দুসমাজকে একটু আক্রমণ করিয়াছেন,—সঙ্গে ২ তর্কচূড়ামণি ও কুমার পরিব্রাজক মহাশয় ও বঙ্গবাসীর দিকে একটু কুটিল কটাক্ষ করিয়াছেন। দয়ানন্দ বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র জানিতেন, এই মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য লিখিয়াছেন "স্বামীজির আচার্য্য (অধ্যাপক) মহাশয় তাঁহাকে যে" সরস্বতী "উপাধিদান করিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত দান হইয়াছিল বলিতে হইবে"। লেখকের অগাধ গম্ভীর বিদ্যা ও শাস্ত্র-জ্ঞান বিদিত হইয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। "সরস্বতী" এই উপাধিটি দয়ানন্দের অধ্যাপক-দত্ত, ইহা তাঁহাকে কে বলিল? টোলে বা সংস্কৃত কলেজে যে সরস্বতী উপাধি প্রদত্ত হয়, দয়ানন্দ সরস্বতীর উপাধি সেরূপ নহে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রচলিত দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যে [তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতি, ও পুরি] উপাধি প্রসিদ্ধ আছে "সরস্বতী" দয়ানন্দের সেই আশ্রমিক উপাধি, এ সরস্বতী উপাধিতে বিদ্যা বুদ্ধি শাস্ত্র জ্ঞানের কোন পরিচয় নাই। যিনি "সরস্বতী" সম্প্রদায়ের নিকট মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিবেন, তিনি পণ্ডিত হউন বা অপণ্ডিত হউন, তিনিই "সরস্বতী" উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

দয়ানন্দ তন্ত্র জানিতেন বলিয়া লেখক বড় গৌরব করিয়াছেন। তিনি তন্ত্র জানিলে জানিতে পারেন, কিন্তু বুঝিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তিনি "থিয়সফিষ্ট" নামক পত্রে নিজ-জীবন-চরিত-লিপিতে লিখিয়াছিলেন যে, এক বার তিনি তন্ত্রোক্ত মেরু-মধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ী ও মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান আদি ষট্‌চক্র পরীক্ষা করিবার জন্য একটা মৃত দেহ ছুরিকা দ্বারা স্বহস্তে কাটিয়া দেখিয়া ছিলেন, তাহাতে ষট্‌চক্র দেখিতে না পাইয়া তন্ত্রশাস্ত্রকে কল্পনার গ্রন্থ ও ধূর্ত্তের রচিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। দয়ানন্দ ত কোন মেডিকল কালেজে পড়েন নাই, স্নায়ু শিরা কিরূপে কাটিয়া দেখিতে হয়, তাহা তিনি জানিবেন কোথা হইতে! ইহা ত আলু বেগুন নহে যে তাহা যে রূপে হউক কাটিলেই হইল। শারীর তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্নায়ু শিরা অস্থি আদির ব্যবচ্ছেদ করিতে দেওয়া—আর বানরের হাতে খনিত্র প্রদান করা একই কথা। বিশেষতঃ ষট্‌চক্রাদি চর্ম্মগম্য নহে, উহা যোগাধিগম্য বলিয়া তন্ত্রে উক্ত আছে। যেমন কাষ্ঠের মধ্যস্থ অগ্নি কাষ্ঠ দ্বয়ের ঘন ঘর্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু কাষ্ঠকে শতখণ্ডে চিরিয়া কাটিয়া দেখিলেও সে অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায়না, সেই রূপ শরীরকে খণ্ড ২ করিয়া চিরিলেও ষট্‌চক্র দেখিতে পাওয়া যায়না। কিন্তু সদ্গুরু-প্রবোধিত যোগ-সাধনের কৌশল অবগত হইলে সাধক তাহা অন্তর্জ্জগতে দেদীপ্যমান দেখিতে পান। পাঠক আপনি এতাবৎ পাঠে দয়ানন্দ সরস্বতীকে কি তন্ত্রজ্ঞ বলিতে চাহেন? আজ তাঁহার ন্যায় একজন যোগানভিজ্ঞ পণ্ডিত যদি তন্ত্রকে ধূর্ত্ত-রচিত গ্রন্থ বলেন, তাহা হইলে কি সাধক-হৃদয়ের সম্পত্তি তন্ত্রের কিছু মাত্র ক্ষতি আছে?

দয়ানন্দ পুরাণের প্রমাণ মানিতেন না, স্মৃতির প্রমাণ মানিতেন না, তন্ত্রের প্রমাণ মানিতেন না, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের প্রমাণ মানিতেন না, তবে যখন তাঁহার মতের সঙ্গে মিল হইত তখন তিনি সকল স্থানের প্রমাণই মানিতেন—সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি আপনার কথাই প্রমাণ মানিতেন। তিনি বেদের মন্ত্র ভাগকে অপৌরুষেয় মানিতেন বটে, কিন্তু তাহাও তাঁহার নিজ অর্থানুসারে।

বাঙ্গলা দেশ নিবাসী ব্রাহ্ম সমাজ! তুমিত বাঙ্গলা-দেশ ভিন্ন অন্য দেশের বড় খোঁজ খপর রাখনা। দয়া-

নন্দ প্রথম যখন কাশীতে আসিয়াছিলেন তখন এই মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে ২১৪টি কথা কহায় আনন্দ বাগে যে মহতীসভা হইয়াছিল তাহার খোঁজ খবর রাখ কি? সে সভায় স্বর্গীয় কাশীনরেশ ও বেথিয়ার মহারাজা এবং অন্যান্য গণ্য মান্য অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পরিব্রাজকাচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বালশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী আদির সহিত দয়ানন্দস্বামীর বিচার হইয়াছিল এবং সে বিচারে তিনি সম্পূর্ণ পরাভূত ও হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতে তিনি পণ্ডিত দিগকে অনেক গালি বর্ষণ করিতেন। তিনি তাঁহার বিরচিত সত্যার্থ প্রকাশে যে বেদার্থ প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কাশীস্থ মানমন্দিরের মহাসভায় বেদবিদ্ বিদ্বন্মণ্ডলী কর্ত্তৃক যথাবিধি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশই যেমন অশাস্ত্রজ্ঞ পশ্চিমোত্তর ও বোম্বাই বিভাগের দয়ানন্দী আর্য্য-সমাজের অধিকাংশই সেইরূপ অশাস্ত্রজ্ঞ। সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারের তাড়নায় ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন মুমূর্ষু দশাগ্রস্ত, দয়ানন্দী আর্য্য সমাজের অবস্থাও অনেক স্থানে প্রায় সেই রূপ। দয়ানন্দের অমূলক উক্তির, অসার যুক্তির দোহাই দিয়া ব্রাহ্ম সমাজ ভারতের অগণ্য পণ্ডিত-মণ্ডলী-পরিসেবিত হিন্দু সমাজকে ভয় দেখাইতেছেন দেখিয়া বড় হাঁসি পাইল।

ব্রাহ্ম সমাজ হুঙ্কার করিয়া বলিতেছেন যে দয়া-নন্দী সমাজের মুখপাত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "আর্য্যাবর্ত্ত" কাগজে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে পাষা-ণাদি মূর্ত্তি পূজাতে ঈশ্বর পূজা সিদ্ধ হয়, ইহা যিনি ছয় মাস মধ্যে চারিবেদ হইতে সপ্রমাণ করিতে পারিবেন, তিনি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। অল্প দেশ-দর্শী ব্রাহ্মগণ আপনারা দেবাক্ষরে লাহোর হইতে প্রকাশিত দয়ানন্দ মত মর্দ্দন" কি পাঠ করেন নাই? কাশী হইতে প্রকাশিত "দয়ানন্দ মত মূলোচ্ছেদ" কি দর্শন করেন নাই? এই সকল পঠিত থাকিলে আজ দয়ানন্দকে লইয়া হিন্দু সমাজের সমক্ষে আসিতে সাহস করিতেন না। দয়ানন্দ সরস্বতী জৈনধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী-চালনা করিয়া গুজরানওয়ালা জৈন মঠাধ্যক্ষের হস্তে আইন অনুসারে কি রূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানেন কি? যদি না জানা থাকে, তবে হিন্দি ভাষায় লিখিত "দয়ানন্দ মুখ চপেটিকা" পাঠ করিবেন। বিগত ১৮০০ শকাব্দায় হরিদ্বারের মহাকুম্ভমেলায় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের বিচারসভায় আহূত হইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা জানা আছে কি? যদি না থাকে, তবে "দয়ানন্দ পরাভূতি" পাঠ করিয়া দেখিবেন। আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রোচিত তর্কাস্ত্রে দয়ানন্দের মতরাশি কত স্থানে কত বার খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। পাঁচহাজার টাকার পারিতোষিকর কথা প্রচারিত হই-বার পূর্ব্বেই বৈদিক প্রমাণ সহিত মূর্ত্তি পূজার শাস্ত্রী-য়তা প্রমাণিত হইয়া দেবনাগরী অক্ষরে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। যদি বল "আর্য্যাবর্ত্ত" কাগজের তবে এত গভীর গর্জ্জন কেন? তাহাও বলিয়া দিতেছি। দয়ানন্দ বেদের এ দিক ও দিক ছাট্ ছোট দিয়া যে টুকু বেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তিনি যে শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তদনুসারে মূর্ত্তিপূজা প্রমাণ করিতে কেহ পারিবে না। যদি কেহ বেদের কোন মন্ত্র দ্বারা মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা দেখাইলেন অমনি দয়া-নন্দী দল বলিলেন এ মন্ত্রটি আমরা মানি না, অথবা উহা প্রক্ষিপ্ত, তবেই সকল গোল মিটিয়া গেল। বৃথা বিতণ্ডাবাদী দিগের সহিত কোন পণ্ডিতই শাস্ত্রালাপ করিতে ইচ্ছা করেন না। আর ইহাও মনে রাখিবেন যে চতুর্ব্বেদের সহস্র ২ শাখার মধ্যে এক্ষণে কতিপয় শাখা মাত্র অসম্পূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দয়ানন্দ তাহারও মধ্যে আবার অনেক ছাটছুট দিয়াছেন। সুতরাং দয়ানন্দের বেদ ও আমাদিগের বেদ এক

বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যখন চতুর্ব্বেদ সম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, সেই সময়ে যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাহা অধ্যয়ন ও মন্থন করিয়া প্রমাণ সহিত মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা শুনিব, না বেদের অল্পাংশদর্শী কলির ক্ষুদ্র জীব দয়ানন্দের কথা শুনিব?

ব্রাহ্মসমাজ! আর পরের দোহাই দিবার প্রয়োজন কি? হিন্দু কুলে জন্মিয়াছ, হিন্দু শাস্ত্র ভক্তি পূর্ব্বক অধ্যয়ন কর, হিন্দু ধর্ম্মের শরণাগত হও, সর্ব্বমঙ্গলা তোমার কল্যাণ করিবেন। শুভম্

ব্রাহ্মের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ।

ধর্ম্মাত্মা পাঠক বর্গ বিদিত আছেন, যে কুমার-পরিব্রাজক মহাশয় বিগত ৺ দোলযাত্রার সময়ে যখন প্রথম কুচবিহার রাজধানীতে সনাতন ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলন করিয়া স্বধর্ম্মের সারবত্তা ও নিগূঢ় রহস্যাদি প্রচার করেন, সেই সময়ে অনেক স্বধর্ম্ম-পরায়ণের প্রাণ মন নাচিয়া উঠিয়াছিল, অনেক স্বধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ পুরুষের প্রাণমন টলিয়া গিয়াছিল, এবং উপধর্ম্ম-সমাজের নেতৃ দলের প্রাণ মন উৎকণ্ঠিত ও কম্পিত হইয়াছিল। সেই সময়েই যজ্ঞোপবীত-পরিত্যাগী শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্ম যুবক নিজকৃত অকার্য্য কুকার্য্য বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত-হৃদয়ে একদিন মহতী সভায় প্রায় সহস্রাধিক লোকের সম্মুখে ব্রাহ্ম-সমাজের কুহকে পড়িয়া যজ্ঞো[illegible]ত পরিত্যাগ আদি অপরাধ জন্য ক্ষোভ প্রকাশ ক[illegible]ন ও হিন্দু সমাজের নিকট সবিনয় ক্ষমা চাহিয়া বলেন, যে আমি যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরুপনীত হইয়া স্বধর্ম্মের সেবা করিব, সকলে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন। তিনি সেই দিন হইতে ব্রাহ্ম সমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর নৈহাটীতে আসিয়া মস্তক মুণ্ডন, গঙ্গাস্নান ও যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। আপাততঃ পুনরুপনয়নের জন্য অর্থসংগ্রহ ও অন্যান্য আয়োজনে ব্যাপৃত আছেন। শুভদিনে শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। তিনি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না। পুত্রের প্রাণ বাহির হইয়া গেলেও স্নেহময়ী অবোধ জননী যেমন শিশুর দেহটি ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে থাকেন, সেই রূপ শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দের কায়া চলিয়া গেলেও ব্রাহ্মসমাজ কেবল ছায়া লইয়া টানা টানি করিতেছেন ও এখনও মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের দল হইতে একজন "আনুষ্ঠানিক" বাহির হইয়া গেলেন, এই সমাচার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রাণ আন্ চান্ করিয়া উঠিল, উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, মন উন্মত্ত হইল আর এদিক্ ও দিক্ তাকাইয়া বিচার করিবার অবকাশ হইল না। সত্য সমাচার গোপন করা দোষ, ইহা ভুলিয়া গিয়া নববিধান সমাজের মুখপত্র ২ রা জ্যৈষ্ঠের "ধর্ম্ম তত্ত্ব" নামক পাক্ষিক পত্রে লিখিয়াছেন—

"কোচবেহারস্থ একটি যুবক ব্রাহ্ম শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী কিছুকাল হইল নববিধানে দীক্ষিত হইয়াছেন। ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের কোচবিহারে অনুপস্থিতি কালে একজন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক তথায় যাইয়া বক্তৃতাদি করেন। কৃষ্ণানন্দ সেই বক্তৃতার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কখন কখন সেই প্রচারক মহাশয়ের নিকটে গিয়াছিলেন। তাহাতে তখনই সে দেশে ও নানা স্থানে জনরব উঠিয়াছে এবং তৎপর অনেক হিন্দুধর্ম্ম-পরিপোষক পত্রিকায় মহা-আস্ফালন ও আড়ম্বরের সহিত লিখা হইয়াছে যে উক্ত দীক্ষিত ব্রাহ্ম পুনঃ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছে। আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দের পরিবর্ত্তন হয় নাই, এখনও তিনি যথারীতি ব্রাহ্ম সমাজে যাইয়া উপাসনাদিতে যোগদান করিতেছেন। লেখা লিখি ও জনরব মিথ্যা। উপরি উক্ত জনরবে ব্যথিত হইয়া ভাই প্রাণকৃষ্ণকে সেই ব্রাহ্ম যুবকটি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "মনে নানা প্রকার ভাব হয়, উপাসনা করিতে বসি, তাহাতে কেবল আপনার চিন্তা [illegible], মন্দিরে যাই সেখানেও ভাল লাগে না, বাটীতেও থাকিতে ইচ্ছা করেনা। তাহাতে আবার লোক দিগের কত তিরস্কার সহ্য করিব। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নসেনের বক্তৃতা আগাগোড়া শুনিয়াছি, এবং তাঁহার কাছে বরাবর যাই। তাহাতে লোক সকল আমাকে হিন্দু বলিয়া তিরস্কার

করে। কি করি আমি কি কোন লোকের নিকটেও যাইতে পারিব না। একবার ইচ্ছা হয় কলিকাতায় যাইয়া আপনার কাছে থাকি, তাই বা, কি প্রকারে হইবে”?

পূর্ব্ব স্নেহের বশীভূত হইয়া যদি কৃষ্ণানন্দ এই পত্র লিখিয়াও থাকেন, কৈ তাহাতেও তো “যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিব না,” এরূপ কোন আভাসই নাই, তবে “ধর্ম্ম তত্ত্বের” এত বৃথা আস্ফালন কেন! ধর্ম্মতত্ত্বের এই অমূলক পত্র পাঠ করিয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী স্বয়ং নিজাক্ষরে যে পত্র কুমার-পরিব্রাজক মহোদয়কে লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবিকল নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আশা করি “ধর্ম্ম তত্ত্বের” বিকার-প্রলাপ এইবার নিবৃত্ত হইবে।

পত্র।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৯৭।

“—আমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়কে এই রূপ পত্র আমি কখন লিখি নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার মূল্য আমি ইতি পূর্ব্বে দিয়াছিলাম, সেই কাগজ পাইবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি। নৈহাটীতে যাইয়া গঙ্গাস্নানাদি যাহা ২ করিয়াছি, তাহা মহাশয়ের সাক্ষাতেই নিবেদিয়াছি। অর্থ অভাবে এতক উপনয়ন হয় নাই, তাহারই চেষ্টায় আছি। বোধ হয় সত্বরে এ কার্য্য সম্পন্ন করিব। ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করি না। “ধর্ম্ম তত্ত্ব” পত্রিকায় যে আমার লিখিত চিঠি কি অনান্য কথা যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা সমস্তই অলীক। আমি হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিব বলিয়াই সেই প্রবীণ-সভায় প্রকাশ করিয়াছি।

আমি যে “বেদ বিদালয়ে” পড়িবার নিমিত্ত মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা যাহাতে আমার সফল হয়, তাহা করিতে আজ্ঞা হইবে, নিবেদন ইতি।

অনুগত
(স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী
কুচবিহার—হিবারকুটা।

শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দের এই রূপ সৎসাহসের দৃষ্টান্ত অনেকেরই অনুকরণীয়। যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই লোক লজ্জাভয়ে নিজের পূর্ব্বকৃত ত্রুটি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। আশা করি শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দ যেন পুনরায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রলোভন স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া না যান।

মধ্যে ২ অনেক বালক ও যুবা পিতা মাতাকে না বলিয়া বা কোনরূপ অপরাধ করিয়া ৺ কাশী ধামে পলাইয়া আসে। তন্মধ্যে যাহাদের এখানে আত্মীয় বন্ধু নাই, তাহারা সত্রালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। আজ কাল আবার এই রূপ অনেক দুষ্ট ছেলে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট ছাত্র সাজিয়া আসিয়া বিরক্ত করিতেছে। সদ্বংশ, সচ্চরিত্রতা, পূর্ব্ব-বিদ্যাভ্যাস আদির বিশেষ প্রশংসাপত্র তাঁহার স্বদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে না পাইলে কেহ বেদ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না, এই নিয়মে বাধ্য হইয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাদিগকে ছাত্রাবাসে স্থান দেন না, বলিয়া সেই দুষ্ট গণ নানা স্থানে বেদ বিদ্যালয়ের বৃথা নিন্দা করিয়া বেড়ায়। দুষ্টের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। যে সকল বালক বেদবিদ্যালয়ের মন্ত্রণা মণ্ডলের নিরূপিত নিয়মাবলীর বশবর্ত্তী হইয়া না চলিবেন, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে না। পত্র দ্বারা এখানকার অনুমতি পত্র না পাইলে কেহ যেন একেবারে কাশীতে বেদ পড়িব বলিয়া আসিয়া উপস্থিত না হয়েন। যত লোক আসিবে, তত লোককেই যে আমরা আহারাচ্ছাদনের সাহায্য করিতে পারিব, ইহাও সম্ভব নহে। সভার অর্থ-সঙ্গতি যেমন ২ বৃদ্ধি পাইবে, তেমনি ২ আমরা উপযুক্ত ছাত্রও গ্রহণ করিতে থাকিব। অধ্যক্ষের বিনানুমতিতে যিনি আসিবেন, তাঁহার জন্য অধ্যক্ষ দায়ী নহেন।

সমালোচনা।

১। কাশী খণ্ড (বঙ্গানুবাদ)—কাশীধাম, দশাশ্বমেধ ঘাট শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত ও খণ্ড চতুষ্টয়ে প্রকাশিত—সম্পূর্ণ পুস্তকের মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র। ইতি পূর্ব্বে কয়েক জন কয়েক বার কাশী খণ্ডের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াও

সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। মা অন্নপূর্ণা ও ৺ বিশ্বনাথের কৃপায় নিবারণ বাবু যে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ খানি নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রথম ধন্যবাদ। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, ভক্তি আদি গূঢ় রহস্য পূর্ণ হিন্দু হৃদয়ের পরম সম্পত্তির অধিকারী যিনিই হইতে চাহেন, কাশীখণ্ড তাঁহার অবশ্য পাঠ্য। জ্ঞানের গভীর গর্ভে প্রবেশ করিতে, ভগবৎ প্রেমের সুধা সিন্ধুতে নিমগ্ন হইতে, বিষম যম-যাতনা হইতে নিস্তার পাইতে এবং অষ্টপাশ-বিনির্ম্মুক্ত হইতে যাঁহার ইচ্ছা, কাশীখণ্ড পাঠ করিলে তাঁহার মনঃক্ষোভ নিবারণ হইবে। পুস্তকের মুদ্রণাদি পরিপাটী হইয়াছে। পুস্তকের আকৃতি ও প্রকৃতি বিচার করিলে মূল্য অল্পই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আশা করি হিন্দুর গৃহে ২ কাশীখণ্ড সাদরে গৃহীত হইবে। কাশীখণ্ড পাঠ করিলে কাশীদর্শন, কাশীবাস ও কাশীপ্রাপ্তির ফলও অলভ্য থাকে না।

২। শিবলিঙ্গ পূজন বিধিঃ। ৩য় সংস্করণ। কাশী-ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার মুখ্য সভাসদ্ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক নানা পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতাদি হইতে প্রমাণ প্রয়োগ ও বঙ্গানুবাদ সহ সংগৃহীত। কাশী-ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্য; মূল্য ১৷০ মাত্র। যাঁহারা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী, যাঁহারা শিবপূজার তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিতে চাহেন, যাঁহারা পূর্ণ প্রবন্ধ সহ প্রাণ ভরিয়া শিব পূজা করিতে চাহেন, এ পুস্তক খানি তাঁহাদের বড় আদরের সামগ্রী হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় প্রথম দুই সংস্করণ বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়া হিন্দু সমাজের চির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ৩য় সংস্করণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নূতন ২ জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৩। তন্ত্র-তত্ত্ব। বিখ্যাত বাগ্মিবর ও ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় কর্ত্তৃক খণ্ডে ২ প্রকাশিত। ৪ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে—১২ খণ্ডে একবর্ষ মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। ১২ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের ন্যায় ওজস্বিনী মধুর ভাষা অন্য লেখকের হস্ত হইতে অল্পই বাহির হইয়া থাকে। তিনি বহু শাস্ত্রদর্শী, তন্ত্রশাস্ত্রে আবার তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে, তাহাতে আবার তাঁহার হৃদয় ভক্তিভরা। তাঁহার তন্ত্র-তত্ত্ব যে একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। তন্ত্রের গুহ্য কথা অনেকে না বুঝিয়াই আজ কাল তন্ত্রের উপর খড়গহস্ত, বিদ্যার্ণবের তন্ত্রতত্ত্ব পাঠ করিয়া সকলে একবার সে ভ্রম দূর করুন ও করুণা-কল্পলতা মা মঙ্গলময়ীর করুণা লাভ করুন।

ধর্ম্মোৎসব।

১। কুচবেহার—বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে এখানকার মদনমোহনজীর নব মন্দির প্রবেশোপলক্ষে মহামহোৎসব হইয়া গিয়াছে। রাজকীয় সমারোহ-পূর্ণ সজ্জায় সুশোভিত ৺ মদন মোহনের সঙ্গে ২ সহস্র ২ হিন্দু যে দিন হরিসংকীর্ত্তন করিতে২ চলিয়াছিলেন, সে দিনের ন্যায় পবিত্র দৃশ্য কুচবেহারে আর কখনও দেখা যায় নাই। কয়েক দিন তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের ও পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতায় কুচবিহার বাসী ও অন্যান্য বহু স্থান হইতে সমাগত বহুতর ব্যক্তির উপকার ও আনন্দের সীমা ছিল না। মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপ বাহাদুরও এক দিন এতন্মহাত্মা দ্বয়ের সহিত সদালাপে বড় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। রঙ্গপুর—মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ লাহিড়ী মহাশয়ের সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় রঙ্গপুর ধর্ম্ম-সভার একটি সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে কুমার-পরিব্রাজক তথায় গমন করেন। উপর্য্যুপরি তাঁহার ৫।৬টী বক্তৃতায় ও নগর-সংকীর্ত্তনে আবাল বৃদ্ধের ধর্ম্মভাব মেঘ-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিব্রাজক এক দিন তথাকার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মহোদয় কর্ত্তৃক অনু-

রুদ্ধ হইয়া ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র গণকে নীতি উপদেশ দান করিয়াছিলেন। বঙ্গ ভাষাভিজ্ঞ সাহেব ও অন্যান্য শ্রোতা মাত্রেই তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও সারময়ী বক্তৃতা শ্রবণে নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

৩। কাকিনা—রঙ্গপুর হইতে আহূত হইয়া পরিব্রাজক ককিনায় গমন করেন ও ৪ দিন জ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর, তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর অতি সাধু হৃদয় ও সুশীল; পরিব্রাজক ধর্ম্মালাপ কালে তাঁহাকে সনাতন ধর্ম্ম মতের পক্ষাশ্রয় করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। যিনি হৃদয়বান্ ও ভগবদভক্ত, তিনি আজ হউক কাল হউক এক দিন আর্য মতকে আদর করিবেনই করিবেন। রাজা বাহাদুর দয়া করিয়া বেদ বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন এই রূপ অনুমতি করিয়াছেন। কাকিনার অধিকাংশ লোকেই কয়েক দিন বড় আনন্দোৎসবে মাতিয়াছিলেন। মান্যবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গুরু গোবিন্দ সিংহ মহাশয়ও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

৪। কলিকাতা—শিমলাষ্ট্রীট্ শ্রীমান্ মানিকচন্দ্র গোস্বামী মাহাশয়ের ঠাকুরবাটীতে কুমার পরিব্রাজক একদিন “ভব সিন্ধুপার” বিবরিণী বক্তৃতা করেন। সে দিন বক্তা ও শ্রোতা সকলেরই প্রেমাশ্রু ধারা প্রবাহে ঠাকুর বাটী বৈকুণ্ঠ পুরী হইয়া উঠিয়াছিল। সভারম্ভ কালে মান্যবর ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় কিঞ্চিৎ শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

৫। মহম্মদ বাজার—বিগত ১৬ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার পর্য্যন্ত মহম্মদ বাজার কাঁইজুলি হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার ৪র্থ বার্ষিক মহা মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। গ্রাম্যদেবতা-পূজা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ যাত্রা প্রভৃতি উৎসবের সমুদায় অঙ্গেরই অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই উৎসবোপলক্ষে ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্ম বক্তা কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের শুভাগমনে দেশ পবিত্রীকৃত হইল; দিগ্ দিগন্ত হইতে এই উৎসবানন্দ ভোগার্থ সম্মিলিত অসঙ্খ্য নরনারীর শুষ্ক নীরস হৃদয়ে প্রেম ভক্তির স্নিগ্ধমন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইল, কত কুসংস্কার কদাচার রাশি জ্ঞান বিজ্ঞানের সুশানিত খড়্গমুখে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কত তাপিত প্রাণ শীতল হইল, কত সন্তপ্ত ঊষর ক্ষেত্রে হরি-ভক্তির অন্তস্তলভেদী অমল শীতল প্রস্রবণ সমুচ্ছ্বসিত হইয়া কল্পান্ত-সঞ্চিত ত্রিতাপের জ্বালামালার নির্ব্বাণ করিল। একদিকে এই সাধুমহাত্মার মধুময়ী অমৃতময়ী আবেশময়ী অথচ সংশয়চ্ছেদী বক্তৃতা, এবং অপরদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূত পূর্ব্ব প্রচারক শ্রীযুক্ত আদিনাথ অধ্যেতা [এক্ষণে অনুতপ্ত বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত গদাধর মহান্ত] মহাশয়ের প্রহ্লাদ চরিত্রাদি যাত্রার একাকী অনুষ্ঠান, এবং নানা দেশ হইতে [রামপুরহাট, কুণ্ডলা, ভবানীপুর প্রভৃতি সভা হইতে] সম্মিলিত ধর্ম্মপ্রাণ ও সাধু হৃদয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের সমাবেশ এই উৎসবকে বড়ই সুখকর করিয়াছিল। নিরন্তর ভজনানন্দের প্রেমহিল্লোলে সকলকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। কি যেন এক সুখ স্বপ্ন কাটিয়া গেল। ২৮।২৯শে অত্রত্য নিত্যানন্দ প্রদায়িনী সভার ১ম বার্ষিকোৎসব সম্পন্ন করিয়া পরিব্রাজক মহোদয় সম্মিলিত ভক্ত মণ্ডলী সহ, ভবানীপুর [illegible] ধর্ম্ম সভার উৎসব সম্পাদন জন্য গমন করিয়াছেন। রামপুরহাট সুনীতিসভার ভূত পূর্ব্ব উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িরায় মহাশয় এতৎ সভাদ্বয়ে ধর্ম্মার্থ-পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

শ্রীপাঁচকড়ী সরকার।

ভবানী পুর (বীরভূম)

৬। গত ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ উৎসব আরম্ভ হইয়া ৩ রা আষাঢ়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। উৎসবারম্ভের প্রথম দিন প্রাতে বেলা ৮ টার সময় সাধুহৃদয় শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়কে, মহাধুম ধামে সংকীর্ত্তন সহ অভ্যর্থনা, গ্রাম প্রদক্ষিণ, ও সন্ধ্যার পর রাত্রি ৯ টা পর্যান্ত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ২য় দিন মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সরল ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা; পরে হরিনাম সংকীর্ত্তন; ও অপরাহ্ন ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত কুমার পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক পঞ্চোপাসনা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। তাঁহার এই হৃদয় গ্রাহিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আপামর উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ সকলেই যার পর নাই আহ্লাদ সাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন। যাঁহারা পঞ্চোপাসনা সম্বন্ধে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকেন ও গোলযোগে পড়েন, এবং অর্দ্ধেক আস্তিকত্ব ও অর্দ্ধেক নাস্তিকত্ব প্রকাশ করিয়া সংশয়-দোলায় আরূঢ় হন, তাঁহাদেরও সেই দিনাবধি মানসিক দুরভিসন্ধি দূরীভূত ও কুভাব সকল সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। ৩য় দিন ৺ হরিনাম সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী সংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল। ৪র্থ দিন প্রাতে ৭টা হইতে বেলা ২॥টা পর্য্যন্ত খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কৃষ্ণ লীলাভিনয় ও পরে সন্ধ্যার পর রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মহাত্মা পরিব্রাজক কর্ত্তৃক "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" ব্যাখ্যাত হয়।

৫ম দিন—অপরাহ্ন ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত "পরিব্রাজক মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা" এবং তদন্তর্গত নিগূঢ় বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল।

৬ষ্ঠ দিন—অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ৺ হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

উৎসবের এই কয়েক দিন গ্রাম খানি অতি বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল। গ্রাম প্রবেশের সকল দ্বারই আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি ও পতাকা দ্বারা শোভিত করা হয় এবং গ্রাম্য রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী দুই ধারেই প্রতি গৃহস্থ সাধ্যমত আম্রশাখাদি পূর্ণ কলস দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিল।

৭। কুণ্ডলা—পরিব্রাজক ভবানীপুর হইতে চক্রেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ মহাদেব দর্শন করিয়া আসিয়া কয়েক দিন কুণ্ডলায় অবস্থিতি করেন। তথায় দুই দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও কয়েক দিন জিজ্ঞাসু গণের নানা প্রকার সংশয় নিরসন করেন।

৮। রামপুরহাট—কুণ্ডলা হইতে পরিব্রাজক এক-দিনের জন্য রামপুরহাট আসেন ও "বেদ ও বেদ্য" বিষয়িণী একটি বক্তৃতা করেন। তৎপর দিন, অনবরত ৬ মাস কাল ক্রমাগত পরিভ্রমণ ও পরিশ্রম করিয়া কুমার পরিব্রাজক মহাশয় কাশী ধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

শ্রী অক্ষয় কুমার সিংহ।

লাহোরের যে সকল দয়ানন্দী ব্রাহ্ম, হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিবার জন্য, যজুর্ব্বেদ উপলক্ষে, অশ্লীল জুগুপ্সিত প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছিলেন; বিচারে তাঁহাদিগের অর্থদণ্ড হইয়াছে—৫১ টাকা হইতে ২৯০ টাকা পর্য্যন্ত—যথাপরাধ। পাদরী সাহেবদিগের উপরও এনজির খাটিবে ত ? আমাদের এ অঞ্চলের অনেক পাদরী, হিন্দু ধর্ম্মে আঘাত করিবার জন্য, এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

বেদ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ আষাঢ় মাসের আয়।

মুষ্টিভিক্ষা।

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩নং মদনবড়ালের কলিকাতা	৮৶০
" রামকৃষ্ণ দত্ত করিমগঞ্জ শ্রীহট্ট	২৶০
" শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ	৩।০
" রাজেন্দ্র মোহন গোস্বামী মনুরমুখ শ্রীহট্ট	২৲
৺ কাশীধামের বৈশাখ মাহার মুষ্টি ভিক্ষার মূল্য	১৯৶০

শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এরিকাটী ফরিদপুর	২॥/০
" রামসুন্দর রায় ইটগুাকুঠি ভেদিয়া	৩৲
" বেনীমাধব নিয়োগী বাড়ালা মুর্শিদাবাদ	১০৲
"গঙ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধানুকাপালঙ্গ ফরিদপুর	৩৶০
" শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী ভালাইপুর নদিয়া	১০৲
" সুরেশচন্দ্র রায় গলুটীয়া বীরভূম	৫৲
" নবীনচন্দ্র শর্ম্মা আসমা ময়মনসিংহ	২৲
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরীশাল	২০৲
" মধুসূদন দাস কলিতাপাড়া গোয়ালপাড়া	৫৸০
" মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ভবানীপুর বীরভূম	৫৲
" দোলগোবিন্দ রায় দরমখাল চাবাগান কাছাড়	৩৲
" যতীন্দ্র মোহন সিংহ বাউমখালী ফরিদপুর	১॥৶০
" অনাদি চন্দ্র মজুমদার গোয়ালপাড়া	১৶১৫
" আশুতোষ চক্রবর্ত্তী আখিরা রামপুরহাট	৩৲
" হরিদাস মুখোপাধ্যায় সাহেবগঞ্জ	৯৲১৫
" আশুতোষ লাহিড়ি রঙ্গপুর	৮।০
"যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহাজাদপুর পাবনা	॥৶০
" কাশীনাথ সাহা পাবনা	॥৶০
" রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শিলচর	৭॥০
" কৈলাশচন্দ্র রায় বিদঘর ত্রিপুরা	২৲
" হরিশচন্দ্র বিশ্বাশ কুচবিহার	২০।/০
" নিশিনাথ শর্ম্মা মোক্তার দীনহাটা	৩৲
" বক্সী রামদাস গোলা হাজারিবাগ	৫॥০
" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজপুর হালীসহর	১৲
" হরচন্দ্র বিশ্বাশ কানাইঘাট শ্রীহট্ট	৩৲
" ভুবন মোহন সেন আমিন পুর ঢাকা	৩৶০
" নবীনচন্দ্র দে উকীল হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট	৭৲
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট	৬/০
" উমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কোলা ঢাকা	৪৲
" বিপিন বিহারী রায় গয়া	৶০
" হরিপ্রসন্ন রায় মূলঘর খুলনা	৩৲
" প্রমথ নাথ দাস মিত্র দোগেছে বর্দ্ধমান	৩৲
" হারাধন সরকার ভেরিয়াডেঙ্গি পূর্ণিয়া	১॥৶০
" প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পালরা ময়মনসিংহ	২৸/০
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী গোয়ালপাড়া	১০৲

এক কালীন দান প্রাপ্তি।

শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্ত	শিলচর	৫৲
" জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	যশহর	১৲
" কেদারনাথ রায় হরি সভা-ফুলবাড়ি-দিনাজপুর		১০৲
"আর্য্য ধর্ম্ম সভা	রঙ্গপুর	২৫৲
" জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কুণ্ডলা	বীরভূম	১৬৲
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের মাতা	ঐ	২৲
" তারিণী প্রসাদ রায়	ঐ	১৲
" দ্বারকানাথ	ঐ	১৲
" কালীদাস হাজরা দক্ষিণপাড়া	বালী	৩৲
" রমনীকান্ত লাহিড়ি খাজুরী	বোয়ালী	৫৲
" জনৈক দাতা মাং শ্রীনাথ বসু	কাশীধাম	১৲
" শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল	কানপুর	১৲
" দেবীপদ রায়	ঐ	১৫৲
" বিশ্বেশ্বর পালীত ডাক্তার	কুচবিহার	৫৲
" হৃদয় নাথ ভাদুড়ি	ঐ	২৶০
" নন্দকুমার বসু	এ	১৲
" জানকীনাথ মজুমদার	ঐ	১৲
" ভবানীচন্দ্র চৌধুরী	ঐ	১৲
" প্রসন্ন চন্দ্র লাহিড়ি	ঐ	৶০
" রসিকচন্দ্র ঘোষ	ঐ	।০
" হরগোবিন্দ ঘোষ	ঐ	।৶০
" দ্বারকানাথ সিংহ	ঐ	৶০
" নবীনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	হালীসহর	/০
" সত্য প্রসন্ন রায়	রামপুরহাট	১৲
" হরচন্দ্র নিয়োগি সম্পাদক হরিসভা	সিরাজগঞ্জ-পাবনা	১০৲

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

লেখাধ্যক্ষ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৩শ ভাগ
৫ম সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮১২
ভাদ্র—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাণির্গ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্ণীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।
বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্ বেদনেত্বগ্রজন্মনঃ॥

সমান বর্ণে যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে বর কন্যার হস্ত গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যার বিবাহ হইলে ক্ষত্রিয়া শর ও বৈশ্যা প্রতোদ গ্রহণ করিবে।

পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥

পিতার অভাবে পিতামহ, পিতামহের অভাবে ভ্রাতা, ভ্রাতার অভাবে সমান বংশজ পুরুষ, তাঁহার অভাবে মাতা ইহারা পরম্পর কন্যাদানের অধিকারী।

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।
গম্যং ত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরং॥

কন্যার বিবাহ না দিলে তাহার প্রত্যেক ঋতুতে ভ্রূণহত্যারে পাপ ভাগী হইতে হয়। সম্প্রদান-কর্ত্তার অভাব হইলে কন্যা স্বেচ্ছাভিমত বরকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে।

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চোরদণ্ডভাগ্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বং শ্রেয়াংশ্চেৎ বর আব্রজেৎ॥

একবারই কন্যার বাগ্দান হইয়া থাকে। বাগ্প্রদত্ত কন্যাকে যে হরণ করে, তাহাকে চোরের মত দণ্ড দিবে। কিন্তু যদি সদ্গুণ-শালী ভাল বর পাওয়া যায়, তাহা হইলে কন্যা অন্যের প্রতি বাগ্দত্ত হইলেও তাহাকে না দিয়া সেই গুণশালী বরকেই সম্প্রদান করিবে।

অনাখ্যায় দদদ্দোষং দণ্ড্য উত্তমসাহসং।
অদুষ্টাস্ত্ত্যজন্ দণ্ড্যো দূষয়ংস্তু মৃষা শতম্॥

পাত্রীর দোষ অপ্রকাশিত রাখিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে সম্প্রদান করে, সেই কপটী অতিসাহসী দণ্ডনীয়। যে ব্যক্তি পাত্রীর উপর মিথ্যা দোষ আরোপিত করিয়া তাহাকে বিবাহ না করে, সে ব্যক্তিও দণ্ডনীয়।

অক্ষতাচ ক্ষতাচৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ॥

কন্যা ক্ষতযোনিই হউক আর অক্ষতযোনিই হউক, পুনর্ব্বার বিবাহিত হইলে তাঁহাকে "পুনর্ভূ" বলা যায়। যে কামিনী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পতি পরিত্যাগ করিয়া পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে, তাহাকে "স্বৈরিণী" [ব্যভিচারিণী] বলা যায়।

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীং।
পরিভূতা মধঃ শয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীং॥

ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে অধিকার চ্যুত করিয়া মলিন

বস্ত্র পরিধান করাইবে। প্রাণ-ধারণোপযোগী অন্ন মাত্র তাহাকে ভোজন করিতে দিবে। পালঙ্ক শয়নের পরি-বর্ত্তে তাহার ভূমিশয্যার ব্যবস্থা করিবে।

ক্রমশঃ।

কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম।

(কাশীস্থ প্রধান ২ পণ্ডিত গণের সম্মতি ক্রমে লিখিত)

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম দ্বিজাতির পক্ষে আর্য্যশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শূদ্রের পক্ষে কেবল মাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমই বিহিত। সত্যাদি যুগে চারিটি আশ্রমই প্রচলিত ছিল। কলিযুগে তাহা নাই। কলিযুগে আছে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস। এখন কথা উঠিয়াছে, কলিযুগে এই সন্ন্যাসাশ্রম বৈধ কি অবৈধ, শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয়। বিদ্বৎ-সমাজে এই বিষয় লইয়া একটা আন্দোলন উঠিয়াছে, বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া অদ্য একটু বিস্তৃত রূপে আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

আদিত্য পুরাণে একটি বচন আছে—

" দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।

ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ ॥

"কলিকালে দেবর কর্ত্তৃক ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্রোৎ-পাদন, বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ, যজ্ঞে গোবধ এবং কমণ্ডলু ধারণ বা সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ।"

এই বচনানুসারে কেহ ২ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কলিযুগে সন্ন্যাস-গ্রহণ নিষিদ্ধ। এক মাত্র গার্হস্থ্য-ধর্ম্মই কলিযুগে দ্বিজাতির পক্ষে বিহিত। আবার কেহ বলিতেছেন, কলিযুগে ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসে অধিকার আছে, কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নাই। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহারা শাস্ত্রীয় বচনও প্রমাণ দিয়া থাকেন। অন্য পক্ষ বলিতে-ছেন, যদিও কোন ২ বচন দ্বারা অবগত হওয়া যায়, যে দ্বিজাতি মাত্রেরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে কিন্তু কলিযুগে শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য না থাকায় ব্রাহ্মণের পক্ষেই কেবল সন্ন্যাসাশ্রম প্রতিপন্ন হইতেছে এই রূপ নানা মুনির নানা মত—নানাবিধ বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। যে রীতি অবলম্বন করিলে শাস্ত্রের সরল সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায়, আমরা সেই রীতি অবলম্বন করিয়া বিষয়টি মন্থন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব, কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্র নিষিদ্ধ কিনা, তৎপরে বুঝিব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজাতি মাত্রই সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী কিনা, তৎপরে বুঝিব, কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অস্তিত্ব আছে কি না। ক্রমে২ এই কয়েকটি বিষয়ের মীমাংসা হইলেই বৃথা বিতণ্ডা মিটিয়া যাইবে।

প্রথমে দেখা যাউক্, কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কি না। আদিত্যপুরাণের বচনের শেষ অংশে আছে " কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ " কলিযুগে দণ্ড কমণ্ডলু আদি ধারণ নিষেধ। কেবল এই টুকুর সাহায্যে প্রতি-পক্ষ প্রতিপন্ন করিতেছেন, যে কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, আদিত্য পুরাণ কেবল দণ্ডকমণ্ডলু ধারণেরই নিষেধ করিয়াছেন, কৈ " সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে না" এমন কথা ত স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ আর সন্ন্যাস-গ্রহণ কিছু এক জিনিষ নহে, যে দণ্ডকমণ্ডলু-ধারণের নিষেধ করিলে সন্ন্যাস-গ্রহণেরও নিষেধ হইবে। দণ্ডী, কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস আদি সন্ন্যাসাশ্রমেরই অন্তর্গত। অধিকারী ভেদে সন্ন্যাসীরই পূর্ব্বোক্ত রূপ ভেদ হইয়াছে। দণ্ডীকেও সন্ন্যাসী বলা যায়, কুটীচককেও সন্ন্যাসী বলা যায়, হংসকেও সন্ন্যাসী বলা যায় ও পরমহংসকেও সন্ন্যাসী বলা যায়। সুতরাং সন্ন্যাসী একটি সর্ব্ব সাধারণ নাম। আর দণ্ডী আদি তাহার বিশেষ বিভাগ। আদিত্যপুরাণ কলিযুগে সন্ন্যাসা-শ্রমের এই দণ্ডিরূপ একটি বিশেষ বিভাগের নিষেধ করিয়াছেন, সাধারণ সন্ন্যাসাশ্রমের নিষেধ করেন নাই। ব্যাপ্য ধর্ম্মের নিষেধ করা হইলে ব্যাপক ধর্ম্মের নিষেধ করা হয় না। কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ

করিয়া হংস হইতে পারে, পরমহংস হইতে পারে, কুটীচক, বহূদকাদি হইতে পারে, কিন্তু দণ্ডী হইতে পারে না, ইহাই আদিত্যপুরাণের অভিপ্রায়। আর ত কোন স্পষ্টতঃ সন্ন্যাসাশ্রমের নিষেধক বচন পাওয়া যায় না!

অথবা প্রতিপক্ষের কথাই ধরা যাউক। "কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ" এই বচন দ্বারা কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইতেছে, প্রতিপক্ষের এই রূপ অভিমত অর্থই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি হইতেছে না। আমরা বলিতেছি, "কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ" ইহা সামান্য বচন, ইহার বাধক বিশেষ বচন আছে। মণ্ডন বার্ত্তিক গ্রন্থের নিবন্ধকার মহাত্মা আনন্দ জ্ঞানাচার্য্য ষষ্ঠাধ্যায়ে সেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

যাবদ্বর্ণবিভাগোঽস্তি যাবদ্ বেদঃ প্রবর্ত্ততে।
যাবচ্চ জাহ্নবী গঙ্গা তাবৎ সন্ন্যাস ইষ্যতে ॥

"যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ণবিভাগ, ও চতুর্ব্বেদ সমাজে বিদ্যমান থাকিবে, যাবৎ কাল পর্য্যন্ত গঙ্গার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত সন্ন্যাসাশ্রম প্রচলিত রহিবে।"

কলির এখন মোটে প্রারম্ভ, এখনও বর্ণ বিভাগ ও বৈদিক রীতির সর্ব্বথা বিলোপ হয় নাই। গঙ্গার মাহাত্ম্য এখনও বিনষ্ট হয় নাই, সুতরাং এখন সন্ন্যাসাশ্রম প্রচলিত হইতে বাধা কি? "কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ" এই বচনদ্বারা সামান্যতঃ কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু "যাবদ্ বর্ণ বিভাগোঽস্তি" এই বচন তাহা হইতে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, যে যতক্ষণ না ঘোর কলি উপস্থিত হয়, ততক্ষণ কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম প্রচলিত থাকিবে। শাস্ত্রে যে সমস্ত সামান্য বিধি থাকে, বিশেষ বিধির সহিত মিলাইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়। যেমন, একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বেদে আছে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" "প্রাণি হিংসা করিবে না।" আবার সেই বেদই বলিতেছেন "অগ্নিষ্টোমীয়ং পশুমালভেত" অগ্নিষ্টোম যজ্ঞার্থ পশুহিংসা করিবে। "প্রাণিহিংসা করিবে না" ইহা সামান্য বিধি। আর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞার্থ পশুহিংসা করিবে, ইহা বিশেষ বিধি। এই বিশেষ বিধির সহিত মিলাইয়া সামান্যবিধির এই রূপ অর্থ করিতে হয়, যে "যজ্ঞাদি ব্যতিরিক্ত অন্য স্থলে প্রাণিহিংসা করিবে না।" সেই রূপ "কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ" ইহা সামান্য বিধি, "যাবদ্বর্ণ বিভাগোঽস্তি" ইহা বিশেষ বিধি। বিশেষ বিধির সহিত মিলাইয়া সামান্য বিধির এই রূপ ব্যাখ্যা হইবে যে, যতক্ষণ না বর্ণ বিভাগাদির উচ্ছেদ হইতেছে, ততক্ষণ সন্ন্যাসাশ্রম কলিযুগে প্রচলিত থাকিবে। তার পর আর নহে। বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য-বিধির এই রূপ অর্থ-সঙ্কোচ শাস্ত্রীয় বিচার প্রণালীতে অবলম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বথা কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা।

কলিযুগে সর্ব্বথা সন্ন্যাসাশ্রম যদি নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এযুগে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রচলন করিয়া গেলেন কেন? তিনি স্বয়ংই বা বিখ্যাত-নামা শ্রীমৎ গোবিন্দ পাদ স্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কিরূপে? অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ও সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীধর স্বামী, শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদিই বা সন্ন্যাসী হইলেন কিরূপে? কাশীস্থ সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামী, প্রভৃতির সন্ন্যাস গ্রহণ কি অশাস্ত্রীয়? ইঁহারা অবশ্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই। যিনি "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ" তিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতেননা, আর তুমি আমি ঠিক বুঝি, ইহা বড়ই দুঃসাহসের কথা।

কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্রনিষিদ্ধ হওয়া ত দূরের কথা, বরং কলিযুগের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

"গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে।"

৮ম উল্লাস, ৮ম শ্লোক।

" কলিযুগে কেবল মাত্র দুইটি আশ্রম, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস। অন্য আশ্রম নাই," সুতরাং এমন স্পষ্ট প্রমাণের পর কলিযুগে " সন্ন্যাস নাই " একথা কোন্ সাহসে বলিতে পারা যায়।

কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। এখন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজাতির সন্ন্যাসে অধিকার আছে কিনা ইহাই বিচার্য্য বিষয়। যাঁহারা দ্বিজাতির সন্ন্যাসে অধিকার স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মত এইরূপ। তাঁহারা বলেন, যে "ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। এবিষয়ে তাঁহারা প্রমাণও দিয়া থাকেন।

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ।

মনুঃ

চত্বারো ব্রাহ্মণস্যোক্তা আশ্রমাঃ শ্রুতি চোদিতাঃ।
ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ঃ প্রোক্তা দ্বাবেকো বৈশ্য শূদ্রয়োঃ।

যোগি যাজ্ঞল্ক্যঃ।

এই সমস্ত বচন দ্বারা ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসাশ্রম প্রতিপাদিত হইতেছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা এ বিষয়ে এই রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন প্রমাণ দেন।

" মুখজানাময়ং ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণো র্লিঙ্গধারণম্।
বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মো বিধীয়তে।

মুখজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই দণ্ডকমণ্ডলু আদি লিঙ্গ ধারণ রূপ ধর্ম্ম বিহিত, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে উক্ত ধর্ম্ম বিহিত নয়।" সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। যাঁহারা এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা শাস্ত্রের একদেশ-দর্শী। যাঁহারা শাস্ত্রান্তরের সহিত একবাক্যতা করিয়া সমাধান করেন, তাঁহারাই বিচক্ষণ। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দিতে হইলে অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত বচন মিলাইয়া দেখিতে হয়। তাহা হইলেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়। আমরা সেই সিদ্ধান্তের পথে যাইতেছি।

প্রথমতঃ মনু ও যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের যে দুইটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ এই শব্দটি থাকায়, কেবল মাত্র ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার, অন্যের নাই, এই রূপ ইতরব্যাবৃত্তি কেমন করিয়া বুঝাইল। মনুবচনে " ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্গৃহাৎ " এই রূপ আছে, "ব্রাহ্মণ এব প্রব্রজেৎ গৃহাৎ " এমন কোন ইতরব্যাবৃত্তিসূচক কথা নাই, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বচনেও তাহাই। সুতরাং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্যাবৃত্তি হইতেছে কেমন করিয়া?

ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসে যেমন অধিকার, ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও সেই রূপ অধিকার আছে। ইহাই বুঝাইবার জন্য মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সন্ন্যাস-প্রকরণে " দ্বিজ " শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং রাগদ্বেষৌ প্রহায়চ।
ভয়ং হৃত্বাচ ভূতানামমৃতী ভবতি " দ্বিজঃ "।

দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজাতি * রাগদ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক

* মনু বলিয়াছেন (নবমোঽধ্যায়ঃ)

" ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥ ৪॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। এতন্মধ্যে প্রথম বর্ণত্রয় দ্বিজাতি।

সবর্ণা ও অনন্তর বর্ণা কন্যার সহিত বিবাহ বিধি থাকা প্রযুক্ত " সজাতিজ " ও " অনন্তরজ " এই দুই প্রকার নাম দ্বিজ সন্তানের উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

" সর্ব্ব বর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এবতে॥ ৫॥
স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬॥

চতুর্ব্বর্ণের সবর্ণা ও অক্ষতযোনী কন্যার সহিত যথা শাস্ত্র বিবাহে যে পুত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাঁহারা পিতৃ বর্ণ ধর্ম্মাদির অধিকারী হইয়া থাকেন, আর অনুলোম বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাকে, ক্ষত্রিয়

ইন্দ্রিয় সমূহ নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণিগণের পক্ষে অভয়ের কারণ হইয়া “ অমৃতী ” হইবে। অর্থাৎ অমৃত ধামের দ্বার স্বরূপ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

যদি বল, এখানে দ্বিজ-শব্দে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়াছে, সমস্ত “ দ্বিজাতিকে ” নহে, এই রূপ সংশয় নিবারণার্থ আরও স্পষ্ট বচন প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। পরাশর মাধব গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্ন্যাস প্রকরণে এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—

ঋণত্রয়মপাকৃত্য নির্মমোনিরহঙ্কৃতিঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥

“ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা বৈশ্য দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ পরিশোধ করিয়া অহঙ্কার ও মমতা বিবর্জ্জিত হইয়া প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে। ”

এ বচনে স্পষ্টতঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদের পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। এমন স্পষ্ট প্রমাণের পর, ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নাই, এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

আশঙ্কা হইতে পারে যে পূর্ব্বোক্ত বচনের সহিত এই সমস্ত বচনের যে বিরোধ হইল, তাহার কি ? “ মুখজানাময়ং ধর্ম্মঃ ” এবচনে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইল, আর “ ঋণত্রয় মপাকৃত্য ” এবচনে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের স্পষ্টতঃ সন্ন্যাস বিধান করা হইল এ বিরোধ পরিহারের উপায় কি ? ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে বিরোধ নাই। “ মুখজানাময়ং ধর্ম্মঃ ” এবচনে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দণ্ডধারণাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হয় নাই, আর “ ঋণত্রয় মপাকৃত্য ” এ বচনে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে, দণ্ডধারণাদি ত বিহিত হয় নাই। সুতরাং বিরোধ কোথায় ? দণ্ডকমণ্ডলু-ধারণ আর সন্ন্যাস যে এক জিনিস নহে, তাহা “ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ ” এই বচনে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দণ্ডাদি-ধারণে অধিকার না থাক্ সন্ন্যাসে অধিকার আছে। পরাশরমাধবগ্রন্থ সন্ন্যাসাশ্রম-প্রকরণে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যথা—

“ অপরে পুনঃ, সন্ন্যাসং ত্রৈবর্ণিকাধিকারমিচ্ছন্তি অধীতবেদস্য দ্বিজাতিমাত্রস্য সমুচ্চয় বিকল্পাভ্যামাশ্রম চতুষ্টয়স্য বহু স্মৃতিষু বিধানাৎ। অতএব যাজ্ঞবল্কোন সন্ন্যাস-প্রকরণে দ্বিজশব্দঃ প্রযুক্তঃ, ” “ যানি পূর্ব্বো-দাহৃত বচনানি, তানি ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োঃ দণ্ড ধারণ নিষেধ পরাণি। তথাচ মুখজানামিতি বচনমুদাহৃতম্। ”

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ভগবান্ ভূতভাবনও বলিয়াছেন—

ভৈক্ষুকেপ্যাশ্রমে দেবি! বেদোক্তং দণ্ডধারণং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব যতস্তং শ্রৌতসংস্কৃতিঃ॥

৮ম উল্লাস, ১০ শ্লোক।

“ হে দেবি! যদ্যপি কলিযুগে ভিক্ষুক আশ্রম [সন্ন্যাস] থাকিবে বটে, কিন্তু এ আশ্রমে বেদোক্ত দণ্ডধারণাদি নিষিদ্ধ। ”

অতএব যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক না কেন, কলিযুগে দণ্ডধারণাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু

যদি বৈশ্যাকে ও বৈশ্য যদি শূদ্রাকে বিবাহ করেন, তবে তাঁহাদের পুত্র মাতার হীন জাতীয়ত্ব জন্য পিতৃবর্ণ হইতে হীন ও পিতার উচ্চজাতিত্ব জন্য মাতৃবর্ণ হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণ ধর্ম্মের অধিকারী হইবেন।

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বোপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪১॥

বিহিত বিবাহ ক্রমে সজাতিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য বৈশ্যাতে যে ত্রিবিধ পুত্র উৎপন্ন হয়, আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াতে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যাতে, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাতে যে ত্রিবিধ পুত্র উৎপন্ন হয়, এই ছয় প্রকার সন্তান দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ উপনয়ন, বেদাধ্যয়নাদি ধর্ম্ম কর্ম্মের অধিকারী।

শাস্ত্রোক্ত বিবাহ ক্রমে ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে বৈশ্য, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে মাহিষ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ছয়প্রকার সন্তান দ্বিজ ধর্ম্মী।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে সাধারণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের নিষেধ কেহই করেন নাই।

এখন আর একটি কথা উত্থিত হইতেছে এই যে, যদিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাসে অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের ত শাস্ত্রানুসারে অস্তিত্ব নাই। সুতরাং যাঁহারা আপনাকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য মনে করিয়া শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসাধিকারের দাবি দাওয়া করিতে যান, তাঁহাদের প্রার্থনা ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছেনা। "কলাবাদ্যন্তয়োঃ স্থিতিঃ" কলিযুগে কেবল আদি ও অন্ত বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বর্ণেরই অস্তিত্ব। এই বচন দ্বারা কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অস্তিত্ব অপ্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব কলিযুগে না থাকায় তাহাদের সন্ন্যাসাশ্রমও একরূপ নিষিদ্ধ হইতেছে। যাঁহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাসাশ্রমের নিতান্ত বিরোধী, তাঁহাদের ইহাই শেষ যুক্তি। শাস্ত্রীয় নিকষে এই কথাটি এখন আমরা কষিয়া দেখিতে চাই।

কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, এই যে একটা কথা উঠিয়াছে, ইহার কোন মূল নাই। এই বাক্যটির সমর্থনার্থ—"যে কলাবাদ্যন্তয়োঃ স্থিতিঃ" এই বচনটি প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে ইহারও কোন মূল নাই। ইহা কোন ঋষির বচন নহে। ইহা মনঃ-কল্পিত কিম্বদন্তী-মাত্র। চতুর্ব্বেদ, উপবেদ, অষ্টাদশপুরাণ এ সমস্তের কোথাও উক্ত বচনের মূল পাওয়া যায় না। যেমন একটা কিম্বদন্তী আছে, কলিযুগে পাঁচহাজার বর্ষ পর্য্যন্ত গঙ্গা বিদ্যমান থাকিবেন, [তদর্দ্ধং জাহ্নবী তোয়ং, তদর্দ্ধং গ্রামদেবতাঃ] এ কিম্বদন্তীর যেমন প্রামাণিকতা নাই, সেই রূপ উক্তবচনটিরও প্রামাণিকতা নাই।

প্রতিপক্ষ মৎস্যপুরাণ হইতে একটি বচন উঠাইতে পারেন—

নাধীয়স্তে তদাগ্নয়ঃ ন যজন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
উৎসীদন্তি তদাচৈব বৈশ্যৈঃ সার্দ্ধন্তু ক্ষত্রিয়াঃ।

"তদা অর্থাৎ কলিযুগে দ্বিজাতিরা অগ্ন্যাধান হইতে বিরত হইবেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গণ উৎসন্ন হইবে"।

এই বচন পড়িয়া অনেকের মনে হইতে পারে, যে মৎস্যপুরাণ যখন বলিতেছেন, কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্য উৎসন্ন হইবে, তখন কলিযুগে যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই ইহাই ঠিক। কিন্তু এ রকম মনে হওয়া নিতান্তই ভ্রমের কার্য্য। মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন যে কলিযুগে ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধানাদি অনুষ্ঠান বর্জ্জিত হইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও উৎসন্ন হইবে, অর্থাৎ আচার-ভ্রষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণও যেমন কলিযুগে অগ্ন্যাধানাদি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, সেইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কলিযুগে ধর্ম্মাচার-বহির্ভূত হইবে; ইহাই মৎস্যপুরাণের অভিপ্রায়। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কলিযুগে বংশ থাকিবেনা, এমন কথা ত ঘুণাক্ষরেও মৎস্যপুরাণ বলেন নাই। শাস্ত্রে এমন অনেক বচন আছে, যাহা দ্বারা কলিযুগে ব্রাহ্মণের অস্তিত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে। [বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত বচন উদ্ধৃত হইল না] সে সমস্ত বচনের প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম" কলিযুগে হীনদশা প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ গণ স্ব বর্ণোচিত আচার-ভ্রষ্ট হইয়া "কলির ব্রাহ্মণ" এই হীন আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। এই রূপ তাদৃশ বচনের অভিপ্রায় প্রতিপক্ষও স্বীকার করিতে বাধ্য, কেননা ব্রাহ্মণের কলিযুগে অভাব তিনিও স্বীকার করেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পক্ষে তাঁহাকে যে পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেও সে পন্থা খাটিবেনা কেন? কলিযুগে অনুষ্ঠান-বিহীন হওয়ায় ব্রাহ্মণের যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোপ পাইবে, এই রূপ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যের বৈশ্যত্ব লোপ পাইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের বংশ যেমন কলিযুগে উচ্ছিন্ন হইবেনা, সেই রূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও বংশ বিলুপ্ত হইবেনা, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য না থাকিলে পারাশরী স্মৃতি কলিধর্ম্মনিরূপণা-

বসরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন কেন ? পরাশর সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

"অতঃ পরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতং।
সংপ্রবক্ষ্যামহং ভূয়ঃ পারাশর্য্যপ্রচোদিতঃ।

"অতঃ পর কলিযুগে গৃহস্থের চতুবর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিব" পরাশরের এই প্রতিজ্ঞা বচন দ্বারা কলিযুগে যে চতুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই বিদ্যমান আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। নতুবা চতুর্ব্বর্ণ-ধর্ম্ম-নিরূপণ-প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়া পড়ে। এই রূপ প্রতিজ্ঞানন্তর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এই রূপ প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ করা হইয়াছে—

অমেধ্যরতো গোমাংসং চাণ্ডালান্নমথাপিবা।
যদি ভুক্তস্তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং চরেৎ।
তথৈব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্তদর্দ্ধন্তু সমাচরেৎ॥

এই রূপ কলি-ধর্ম্ম নিরূপণাবসরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই থাকিবে, তবে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ ঋষির এ প্রয়াস কেন ? কলি ধর্ম্ম নিরূপণের জন্যই পরাশর-স্মৃতি বিখ্যাত। সেই পরাশর যখন কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেছেন,তখন "কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই" এ কথা নিতান্তই অপ্রামাণিক।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও স্পষ্টাক্ষরে কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—

* * * কলিকালেতু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
৮ম উল্লাস, ৫ শ্লোক।

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বংশ বিদ্যমান আছে। সুতরাং কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য না থাকায় তাহাদের সন্ন্যাসই হইতে পারে না, একথা নিতান্তই ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।"

উপসংহারে ইহাই প্রতিপন্ন হইল, যে কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি আছে, কলিযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্ব্বর্ণেরই অস্তিত্ব আছে এবং কলিযুগে দ্বিজাতি মাত্রেরই সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার আছে। এতদ্ভিন্ন শ্রুতি অদিও বলিয়াছেন যে, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ যে দিনই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইহাতে তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, বয়স, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ আদির বিচার করেন নাই।

একটি প্রতিবাদ।

বাঁকীপুরের প্রধান উকীল বাবু গুরুপ্রসাদ সেন কিছু দিন হইল "কলিকাতা রিভিউতে" হিন্দুসমাজ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। তত্রাচ যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহারই সমালোচনা করা আবশ্যক, কারণ ইহার মধ্যে তিনি অনেক নূতন কথা প্রকাশিত করিয়াছেন; এবং যে টুকু মুদ্রিত হইয়াছে তাহা এক প্রকার সম্পূর্ণ। সমাজের গঠন-প্রণালী ও প্রকৃতির বিষয়ই তাঁহার আলোচ্য।

গুরুপ্রসাদ বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোন ধর্ম্মবিশেষ ভারতবর্ষের জাতি সকলকে শাসন করে নাই এবং করিতেছেও না। একটা বিরাট সামাজিক-প্রথা এই পঞ্চবিংশতি কোটী অধিবাসীগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নানাবিধ ধর্ম্ম সকল এই সর্ব্বগ্রাসী প্রথায় সংলিপ্ত হইয়া—তদাকারাকারিত হইয়া, ভিন্ন ২ রুচির লোক সকলের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতেছে। হঠাৎ ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে এই প্রকার বোধ হয় বটে; কিন্তু একটু অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝিয়া দেখিলে পরে এ ভ্রম ঘুচিয়া যায়।

ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। পরন্তু চিরকাল হইতেই যে এই ভাবে ভারতসমাজ পরিচালিত হইয়া আসিতেছে এমন উদ্ভট কথা আমরা মানিতে পারিব না। ভারতবর্ষের যেমন অবস্থা, সমগ্র ইউরোপেরও বর্ত্তমান এই অবস্থা। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় না যে এক খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মই উহার ভিন্ন ২ প্রদেশ সমূহকে শাসিত করিতেছে। ইংলণ্ডের খৃষ্টিয়ানী যাহা, ইতালীর ঠিক তাহার বিপরীত। একটু পুরাতন হইলে, একটু বিস্তারিত হইয়া পড়িলেই সকল ধর্ম্মই এইরূপ নানারঙ্গে রঞ্জিত হইয়া থাকে। দেশকাল পাত্রানুযায়ী ধর্ম্মও বিভিন্ন আকারের হইয়া পড়ে। যীশু যে ক্ষমা-ধর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন, যে ত্যাগ-শীলতা দেখাইয়াছিলেন, পাতি পাতি করিয়া সমস্ত ইউরোপ খুঁজিয়া আবার তেমন একটি শান্ত ও ক্ষমাবান্ খৃষ্টিয়ান দিতে পার কি? পূর্ব্বে হিন্দুগণও এক ধর্ম্মের দ্বারায় পরিচালিত হইতেন, সমাজিক প্রথাও সেই ধর্ম্মানুকূল ছিল। পরে যেমন ২ তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দেশ বিদেশে দিগ্বিজয় করিয়া তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য যেমন ২ বিস্তৃত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মমতও নানা দেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। নানা-প্রকারের, বিবিধ চরিত্রের মনুষ্য সকল সেই সনাতন ধর্ম্মের চরণচুম্বন করিতে লাগিল। সুতরাং অধিকারী অনুযায়ী, লোকের প্রবৃত্তি অনুযায়ী ধর্ম্মমতও একটু পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে সময়ের গুণে হিন্দুধর্ম্মে এত পরিবর্ত্তন অনুপ্রবিষ্ট হইল যে এখন কত সহস্র বৎসর পরে গুরুপ্রসাদ বাবুর মত মেধাবী ব্যক্তিও ভিতরের কথা বুঝিতে পারিলেন না। পঞ্জাবী হিন্দু যাহা, কোমল বাঙ্গালার হিন্দু তাহা নহে। আবার ভারতীয় খৃষ্টিয়ান যেমন, ফরাসীস খৃষ্টিয়ান তেমন নহে। লোকের প্রকৃতি অনুসারে কালে ধর্ম্মও তেমনি গঠিত হইবে। রামমোহন রায় এ কথা বুঝিতে পারেন নাই, তাই সেই বীরযোগ্য, তেজস্বি-সেব্য নীরস উপনিষদ্-ব্যাখ্যাত গভীর ধর্ম্মকথা, মধুমাখা—কোমলতা-পূর্ণ ভীরু বাঙ্গালী সমাজে প্রচারিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু অখণ্ড্য স্বভাবের নিয়ম তাঁহার সে চেষ্টাকে পরাভূত করিল। কেশবচন্দ্র ইহা অনেকটা বুঝিয়াছিলেন, তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অসম্পূর্ণ শুষ্কদেহে প্রেমের লহর কাটিয়া দিবার জন্য পরিশেষে বৃথা আয়াস করিলেন। আমাদের ভারতবর্ষ একটি মহা-প্রদেশ—নানা জাতি, নানা প্রকার জলবায়ু ইহার অঙ্গে খেলা করিতেছে। সুতরাং সনাতন ধর্ম্মও সর্ব্ব-দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া নানা আকার ধারণ করিয়াছে। মহারাষ্ট্রী, বাঙ্গালী পঞ্জাবী, মাদ্রাজী, রাজপুত, বেহারী, উড়িয়া সকলেই হিন্দু, সকলেই এক ধর্ম্মকে মানিয়া থাকে—কিন্তু তাহারা নিজেদের ভাবে—নিজেদের মতন হিন্দু। অতএব আমরা যে ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নানা প্রকার বৈষম্য দেখিতে পাই তাহা কেবল এই কারণের জন্য। বাঙ্গালার জলবায়ু এবং রাজপুতানার জলবায়ুতে অনেক পার্থক্য আছে, কাযেই বাঙ্গালী এবং রাজপুতকে এক হিন্দুর সন্তান বলিয়া বোধ হয় না। এবং এই প্রকৃতি গত পার্থক্য থাকাতে আচার ব্যবহারেরও অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর হিন্দুর অনেক শাস্ত্রীয় ব্যবহার-পদ্ধতি যেমন রাজপুত মানিয়া চলেন, বাঙ্গালীও তেমনি শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এই সকলকে সামাজিক প্রথা বলিয়া ঠেলিয়া রাখিলেত চলিবে না। বরং বলিতে হইবে যে উহারা সনাতনধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বজনীন নিয়ম সকল। গুরু প্রসাদ বাবু এই খানেই গোল বাধাইয়া-ছেন। তিনি পরিবর্ত্তনের এবং সংস্কারের কথা তুলিয়া-ছেন, এবং দুই একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া এই কথা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরিবর্ত্তন ত সকল দেশেই, সকল কালেই হইয়া থাকে, ইহার

প্রতিরোধে কেহই দাঁড়াইতে পারিবে না, তবে ইহার একটা মাত্রা আছে, পুরাতন সমাজে নূতন প্রথা চালাইতে হইলে সে এক অপূর্ব্ব কৌশলে প্রচলিত করিতে হয়। আমাদের দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং উত্তর পশ্চিমের বল্লভ কুল ও শ্রীসম্প্রদায়ের মত পুরাতন বৌদ্ধ মতের উপাদানে নির্ম্মিত। অনেক শিক্ষিত গণের এবং গুরুপ্রসাদ বাবুর এই বিশ্বাস। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে কি সুন্দর উপায়ে কেমন হিন্দুয়ানী মাখাইয়া দেশের ধাতু রাখিয়া এই উপধর্ম্ম সকল বিরাট হিন্দু সমাজে সংপ্রবিষ্ট করা হইয়াছে।

যখন কোন বিরোধী প্রবল শক্তি আসিয়া সমাজশরীরকে আঘাত করে, তখন সমাজরক্ষা করিবার উদ্দেশে সমাজকে একটু স্থিতিশীল করিতে হয়। সভ্য হউক, অসভ্য হউক, যেমন কোন আচার ব্যবহার সমাজে প্রচলিত থাকুক না, সকল গুলিকে আঁটিয়া বাঁধিয়া স্থির করিয়া রাখিতে হয়। পাছে পরকীয় ভাব আসিয়া সমাজে স্থান পায়, পাছে বৈদেশিক ব্যবহার দেশের লোক গ্রহণ করে এই ভয়ে সমাজকে একটু সঙ্কীর্ণ, একটু অনুদার, একটু অন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। নহিলে পরিবর্ত্তনের বিরাট ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া সমাজের ধাতু, সমাজের প্রকৃতি,সমাজের প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না—নিজের নিজস্ব ঘুচিয়া যায়। হিন্দু ইংরাজ সাজিয়া উন্নত হইলে তাহাতে আর হিন্দুর উন্নতি হইল না পরন্তু ইংরাজের ভাল অংশটুকু, মুসলমানের সদ্ব্যবহার টুকু হিন্দুয়ানী পূর্ণ করিয়া, হিন্দুভাব মাখাইয়া যদি হিন্দু সমাজে প্রবর্ত্তিত করা যায় তাহা হইলে তাহাতে হিন্দু সমাজের পুষ্টি হইবে। বৌদ্ধ আচার ব্যবহার যাহা কিছু হিন্দু সমাজে চলিত আছে, তাহা সকলই হিন্দু ভাব-যুক্ত হইয়া প্রচলিত। গুরু প্রসাদ বাবু এই তত্ত্ব টুকুর বিষয় বিশেষ চিন্তা না করিয়া বোধ হয় তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে পাঠাইয়া ছিলেন, নচেৎ এ ভুল তাঁহার দ্বারা হইবার কথা নহে। তিনি কি জানেন না যে হিন্দুর হিন্দুত্ব টুকু ফল্গুনদীর ন্যায় অলক্ষ্যে, অতি স্থির ভাবে ভারতবর্ষীয় গণের মেদ মজ্জার ভিতর দিয়া ঝির ২ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। গুরুপ্রসাদ বাবু ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, রাজপুত ও বাঙ্গালীর সহিত যে প্রকৃতি গত বিশেষ বৈষম্য আছে তাহা তিনি বেশ জানেন; তত্রাচ হিন্দুর জন্য হিন্দুর কেমন যে প্রাণের টান আছে তাহা ত সকল অবস্থায় সকল ভাবেই বুঝা যায়। তিনিও ত এ কথা বুঝিয়াছেন।

তবে একটা বৃথা ফাঁকা কথা লইয়া এত আলোচনা কেন? তিনি খুব শিক্ষিত, পাশ্চাত্য বিদ্যাদ্যুতিতে তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হিন্দু হৃদয় সমালোকিত হইয়াছে; বোধ হয় তিনি বিলাতী অনেক বিলাসের কথা—মজার কথা—আহার ব্যবহারের কথা শুনিয়া, এবং সে সকলের আস্বাদন পাইয়া দরিদ্র হিন্দু সমাজে একটা বিলাসের তরঙ্গ তুলিতে চাহেন; খাওয়া-দাওয়া চাল চলনের একটু স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছুক।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" যে দেশের যে আচার তাহাই গ্রাহ্য। যদি পঞ্জাবে অথবা কঙ্কন প্রদেশে দুই একটা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রচলিত থাকে তাহা হইলেই কি সেই গুলিই কেবল বাছিয়া আনিয়া বাঙ্গালায় প্রচলিত করিতে হইবে? হিন্দু দিগের মধ্যে "কনর্ভাট" (convert) করিবার প্রথা প্রচলিত নাই; কিন্তু আদিম অসভ্য জাতিগণ হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিলে তাহাদিগের জলগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ইতর শূদ্র জাতিগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রকারে স্থানে স্থানে শাস্ত্র বিরুদ্ধ দুই একটা ব্যবহার শূদ্র জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত দেখিতেপাওয়া যায়। তবে ইহা আমরা বেশ জানি যে কোন দেশেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত নাই। কর্ণাট ত্রৈলঙ্গ বাঙ্গালা এবং উত্তর পশ্চিমের

স্থানের স্থানের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণগণই মাংসাশী,নহিলে ব্রাহ্মণ মাত্রেই নিরামিষ-ভোজী সদাচার যুক্ত। হিন্দু সমাজের সংস্কার করিতে হইলে ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কার আবশ্যক; এবং হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহারের আলোচনা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ-গণের ব্যবহার লইয়া বিচার করিলেই ভাল হয়। কোথায় মান্দ্রাজের কোন্ কোণে নেয়ারদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য মতানুকূল একটা প্রথা প্রচলিত আছে, অথবা পাঞ্জাবের জাঠদিগের মধ্যে কি এক অবৈধ ব্যবহার আছে বলিয়া যে গুরুপ্রসাদ বাবু বাঙ্গালী সমাজকে গালি দিতে বসিবেন; ইহাই কি সঙ্গত না বুদ্ধিমানের কর্ম্ম? ইংরাজের আইন—আদালতের জোরে তিনি সমাজের মাথায় পদাঘাত করিয়া অভক্ষ্যভোজী হইতে পারেন, পুত্রাদির অশাস্ত্রীয় এবং অবৈধ মতে বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া নিরীহ হিন্দু দিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া লোকসমাজে হিন্দু নামের প্রসার বজায় রাখিতে পারেন; ওকালতীর জোরে, অর্থের সাহায্যে কোনও কোনও তরলমস্তিষ্ক, অপরিণামদর্শী, লোভী ও প্রবাসী হিন্দুসন্তানকে নিজ স্বেচ্ছাচারের পৃষ্ঠ-পোষক খাড়া করিতে পারেন, কিন্তু ইহাও স্থান বিশেষে—দূর দেশে কর্ম্মস্থানে। তাঁহার বাহাদুরী আছে বটে,তবে সে বাহাদুরী মণ্ডলী-বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেই ভাল হয়, সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের উপর দশ কথা বলিলে কোন ফল দর্শিবে না। দুই দশ দিন আন্দোলন হইয়া প্রবন্ধের শক্তি প্রবন্ধ মধ্যেই পর্য্যবসিত হইবে।

যদি খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম বলিয়া কোন জীবন্ত ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মনামেরও জীবন্ত ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। স্থান-বিশেষে, কালের গুণে সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গে নানা উপধর্ম্ম উঠিতে পারে, কিন্তু হিন্দুর হিন্দুত্ব টুকু ঠিক আছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় খৃষ্টানীমত প্রচারিত হইবার পরেও কত উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, কত নূতন মত প্রকাশিত হইয়াছে, কত প্রকার সামাজিক প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তাই বলিয়াই কি বলিতে হইবে যে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম নহে—কেবল সামাজিক বাঁধুনি মাত্র। পার যদি, ইংরাজী শিক্ষার গুণে বাঙ্গালা দেশে বিলাতীমতের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ কর, দেশান্তরের হিন্দু তাহাতে কিছু বলিবে না; বলিবার আবশ্যকও দেখিবে না, কারণ হিন্দু বুঝে যে স্থানীয় হিন্দু সমাজ উহার যথাযোগ্য উপায় গ্রহণ করিবে। বোধ হয় গুরুপ্রসাদ বাবু মনে করেন যে যখন কর্ম্মস্থানে বসিয়া হাড়ীডোমের হাথের ভাত খাইয়া নিস্তার পাইতেছি—কেহ একটি কথাও বলিতেছে না, তখন এই যে হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামী শুনিতে পাওয়া যায় ইহা বুঝি সবই অলীক। বুঝিবা হিন্দুধর্ম্ম মৃত-অসার, অপদার্থ ধর্ম্ম। তিনি তখন হয়তো বিস্মৃত হয়েন যে পদ্মার কোলের একটি ক্ষুদ্রগ্রামের ক্ষুদ্রসমাজের তর্জ্জনীতাড়নে তিনিও ভীত, কম্পিত এবং বিব্রত হইয়া পড়েন। বিরাট ধর্ম্মের আশ্রিত কোটী ২ লোককে সুশাসনে রাখিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ২ পঞ্চায়তে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে যে গ্রামের অধিবাসী, সে তথাকার সমাজের অনুজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য করিবে, ক্ষুদ্র ২ বিষয়ের জন্য তাহাকে আর বিশাল সমাজের দিকে তাকাইতে হইবে না। গুরুপ্রসাদ বাবুর মতন অনেকগুলি শিক্ষিত উপার্জ্জনশীল বাবুর গুণে বাঙ্গালীর অনেক স্থানের সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—স্বেচ্ছাচারের প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে। তাই অনেকেরই ধারণা হইয়াছে-যে বস্তুতঃ কোন এক সনাতন ধর্ম্ম সমগ্র ভারত খণ্ডকে শাসন করিতেছে না। একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, একটু বুদ্ধি-মানের মত স্থির হইয়া ভারতের নানাস্থানের গ্রাম, নগর পরিদর্শন করিয়া আইস, তত্তৎস্থানের সমাজ শৃঙ্খলা বুঝিয়া আইস, সামাজিক মাণ্ডলিক দিগের সহিত আলাপ করিয়া দেখ—দেখিবে বুঝিবে যে এখনও তেমনি তেজের সহিত তেমনি দর্পের উপর সনাতন ধর্ম্ম

কোটী ২ নরনারীকে নিজ শীতল পদচ্ছায়ায় অনুগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজী শিখিয়াছ, হ্যাট কোট পরিয়া বেড়াইবে, হোটেলে গিয়া থাকিবে, লোক জনের সহিত ইংরাজীতে কথা কহিবে, সহরের যেদিকে হিন্দুর পল্লী, সে দিক্ মাড়াইবে না—আর দেশে ফিরিয়া আসিয়া, উচ্চস্বরে বলিবে যে হিন্দুধর্ম্ম মৃত—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম কোন দিকেই হিন্দুয়ানী চলিত নাই। আমরা গুরুপ্রসাদ বাবুর দুই একটা কথা লইয়াই একটু আলোচনা করিলাম, বাকী যে সব কথা তিনি লিখিয়াছেন অথবা লিখিবেন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা সকলই পুরাতন কথা—ব্রাহ্মদিগের উন্নতির ধুয়া মাত্র। অনেকবার সে সকল কথার প্রতিবাদ হইয়াছে।

জ্ঞানদেব চরিত।

দত্তাত্রেয় প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া জ্ঞানদেব মনের আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। গয়া দর্শন করিয়া কাশীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তথা হইতে অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন ও দ্বারকা দর্শন করিয়া জুনাগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে নরসী মেহতানামে এক জন বিখ্যাত সাধু বাস করিতেন। ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞানদেব পরম আনন্দ লাভ করিলেন। জুনাগড়ের প্রাকৃতিক শোভাও তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিল। জুনাগড় ত্যাগ করিয়া জ্ঞানদেব নানাস্থানে ভ্রমণ করত কর্ণাটক প্রদেশের অন্তর্গত একটী স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই সময়ে এখানে একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এই স্থান নিবাসী তামান্নাচার্য্যের পুত্র শায়নাচার্য্যকে কোন ব্যক্তি হত্যা করিয়াছিল। হত্যা করিবার কারণ এই যে, তামান্নাচার্য্যের ভ্রাতৃ জায়া লক্ষ্মী-বাইয়ের প্রতি এই ব্যক্তির আসক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মী-বাই সাধ্বী। সে এই দুর্বৃত্তের মন্দ অভিপ্রায় পূর্ণ করে নাই বলিয়া এই নরাধম তরবারি দ্বারা শায়নাচার্য্যকে হত্যা করত অস্ত্র খানি লক্ষ্মী-বাইয়ের ঘরে রাখিয়া দিল এবং চারিদিকে প্রকাশ করিতে লাগিল যে লক্ষ্মী-বাই এই কার্য্য করিয়াছে। রাজদরবারে এই ঘটনাটীর বিচার হইল। কয়েক জন মন্দ লোকের সাক্ষ্যের দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে লক্ষ্মী বাইয়ের দ্বারাই এ কার্য্য সমাধা হইয়াছে। অবলার হইয়া দু কথা বলে এমন কেহই ছিল না। সুতরাং রাজ আজ্ঞা প্রচার হইল যে লক্ষ্মীবাইকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। নগরের এক প্রান্তে একটী শ্মশান ভূমি আছে। ঘাতকগণ লক্ষ্মী বাইকে সেই স্থানে লইয়া গেল। তথায় বহু লোকের সমাগম হইল। এই সময়ে লক্ষ্মী বাইকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে তাঁহার যদি কিছু বলিবার থাকে তিনি তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন। লক্ষ্মী বাই দেখিতে পাইলেন, অদূরে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর এক জন মহাপুরুষ আগমন করিতেছেন। লক্ষ্মী বাই বলিলেন যে তাঁহার প্রার্থনা এই যে, যে সাধু পুরুষটি আগমন করিতেছেন, দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করেন। রাজা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লক্ষ্মী বাইয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে এই আগন্তুক লক্ষ্মীবাইয়ের উপপতি হইবে, নতুবা চরম কালে তাহাকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুলা হইবে কেন? হয়ত ইহারই প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। রাজার সন্তোষ উৎপাদন জন্য তোষামোদ-প্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহার কথা অনুমোদন করিল। রাজা সেই আগন্তুককেও তোপে উড়াইয়া দিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাজ আজ্ঞা প্রচার হইবা মাত্র এই রূপ দৈববাণী হইল, যে, এই সাধু পুরুষের মৃত্যু হইবে না কিন্তু রাজা স্ববংশে ধ্বংশ হইবেন। এই দৈববাণী শ্রবন করিয়া রাজা জ্ঞানদেবের শরণাপন্ন হইলেন। জ্ঞানদেব রাজার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তদনন্তর রাজা, জ্ঞানদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বালকটীকে কে হত্যা

করিয়াছে। ইহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া, জ্ঞানদেব বালকের মৃত দেহকে তাঁহার কাছে আনিতে বলিলেন। যাই নিকটে আনীত হইল; জ্ঞানদেব সেই মৃত শরীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বালক! তোমাকে কে বধ করিয়াছে? অমনি সেই মৃতদেহ বলিয়া উঠিল. আমাকে রামাগড় বধ করিয়াছে: এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল। তাহারা জ্ঞানদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্থির করিল। রাজা অপ্রতিভ হইলেন। পরে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দিয়া তিনি লক্ষ্মী বাইকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিলেন এবং জ্ঞানদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জ্ঞানদেব তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন, এবং সেই নগরে সাত দিন অবস্থিতি করত নানা প্রকার সদুপদেশ দ্বারা আপামর সাধারণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ইহার পর, জ্ঞানদেব ত্রৈলঙ্গ-দেশে যাত্রা করিলেন। জ্ঞানদেব যে প্রদেশে অধিক দিবস থাকেন, সে প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করেন, এবং সেই ভাষায় অভঙ্গ রচনা করেন। এই অভঙ্গ গান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। ত্রৈলঙ্গ প্রদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া জ্ঞানদেব পাণ্ডারপুর যাত্রা করিলেন। এখানে ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া পরম আনন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু কাল গত হইল। তাঁহার ভক্তি-ভাব অনেকের মনে ধর্ম্ম-ভাব উদ্দীপন করিতে সক্ষম হইল, পাণ্ডারপুর ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানদেব নিবৃত্তি প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আলন্দিতে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মোৎসব।

১। ২৯এ ও ৩০ এ আষাঢ় দুই দিন ধুবড়ী সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার ৩য় বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত শশি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা ব্যাখ্যা ও সুনীতি-পূর্ণ বক্তৃতা ও শ্রীমান্ সতীশ চন্দ্র মিত্র ও শ্রীমান্ ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর লিখিত প্রবন্ধ-পাঠ হইয়াছিল। এতদ্‌ভিন্ন বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী-পাঠ ও নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। এ উৎসবে ধুবড়ী বাসী-বর্গের ধর্ম্মোৎসাহ ও সৎকার্য্যে সহানুভূতি বাড়িয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন বিদ্যালঙ্কার আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠেশ্বর দাস গুপ্ত মহাশয় সভাপতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীরাজীব লোচন সেন গুপ্ত।

২। পাবনা দাপুনিয়া হরি-ভক্তি-সঞ্চারিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, শ্রীখণ্ড-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ ঠাকুর মহাশয় তথায় গিয়া হরিভক্তি বিষয়িণী একটি মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমরা সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম যে শ্রীযুক্ত গতিনাথ রায় মহাশয়ের, উদ্যোগ ও যত্নে রঙ্গপুর জেলায় কালীগঞ্জ, খোলাহাটী, ভাজনডাঙ্গা, ববনপুর ও তুলসী-ঘাটে, ময়মনসিংহ জেলার নারায়ণ ডহরে এবং পাবনা জেলার গাড়াদহে হরিসভা স্থাপিত হইতেছে। সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারের ক্ষেত্র দিন২ যতই বিস্তৃত হয়, ততই মঙ্গল।

গদাই পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাশী-বেদ-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মুষ্টিভিক্ষা-সংগ্রহের এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ। তাঁহার কার্য্যে তথাকার অনেক লোক বাধা দেয় শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। আশা করি, স্থানীয় ভদ্রলোক মাত্রেই হিন্দু সাধারণের সম্পত্তি, হিন্দু সমাজের ও সনাতন ধর্ম্মের পরমোপকারী এই বেদ-বিদ্যালয়ের উপকারার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যথাবিধ আনুকূল্য করিবেন। বেদ-বিদ্যার জন্য মুষ্টিভিক্ষাতেও কি বাধা দিতে আছে!

কামরূপ কামাখ্যা।

ওঁ শ্রীভগবত্যৈ নমঃ।

ত্রিজগজ্জননী দাক্ষায়ণীর সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধপীঠ ও কলিযুগে অতীব জাগ্রৎস্থান ৺ কামাখ্যা ধাম দর্শনে হিন্দুর যে চিত্তশুদ্ধি ও মহাসিদ্ধি সাধিত হয়, তাহা পুরাণ তন্ত্রাদিতে বিশেষ বিবৃত আছে। পূর্ব্বে এই স্থান যেমন দুর্গম ছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই। গোয়ালন্দ হইতে ডিব্রুগড়াভিমুখে প্রত্যহ একখানি করিয়া ষ্টীমার ছাড়ে, সেই ষ্টীমারে চড়িয়া গৌহাটীতে আসিয়া নামিতে হয় অথবা রঙ্গপুর, কাউনিয়া হইয়া ধুবড়ী আসিলে তথা হইতে ষ্টীমারে গৌহাটী আসিতে পারা যায়। সেই খানেই শৈল-শিখরোপরে যোনিমুদ্রা-স্বরূপিণী মা কামাখ্যা দেবী বিরাজ করিতেছেন। সাধু হৃদয় হিন্দুগণ! একবার মায়ের ছেলে মায়ের কাছে আসুন, জীবন পবিত্র করুন। আপনাদের বাসস্থান ও নির্ব্বিঘ্নে পূজা-পাঠাদির সমস্ত সদ্ব্যবস্থা আমরা করিয়া দিব।

সুবিখ্যাত বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় যখন ৺ কামাখ্যা দর্শনে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি আমাদিগকে যে প্রশংসা-পত্র দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সজ্জন গণের পাঠার্থ নিম্নে প্রকটিত করিলাম। ইতি

কামাখ্যা-শৈল শিখর
গৌহাটী ডাকঘর } শুভার্থী।

শ্রীকালী কান্ত পাণ্ডা।
শ্রীকৈলাশ চন্দ্র পাণ্ডা।
শ্রীলক্ষ্মীপতি পাণ্ডা।
শ্রীযোগেশ্বর পাণ্ডা।
শ্রীনন্দীশ্বর পাণ্ডা।

"আমি কামরূপ কামাখ্যা তীর্থে আসিয়া শ্রীলক্ষ্মীকান্ত, শ্রীযোগেশ্বর, শ্রীনন্দীশ্বর শ্রীকালীকান্ত ও শ্রীকৈলাশ চন্দ্র এই ৫ টি ব্রাহ্মণকে পাণ্ডা পদে বরণ করিলাম। ইঁহাদের শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহারে আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। যে সকল হিন্দু সজ্জন নির্ব্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে তীর্থকার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইঁহাদিগকে পাণ্ডা নিযুক্ত করিলে সুখী হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন।

বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধে ঢাকার সারস্বত পত্র লিখিয়াছেন—

কাশীর বেদ-বিদ্যালয়।—আজি কালি হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু আচার ও রীতিনীতি লইয়া সমগ্র হিন্দুস্থান ভরিয়া আন্দোলন চলিয়াছে। ইহা বস্তুত হিন্দু জাতি ও হিন্দুস্থানের পক্ষে, বড়ই একটা আশাজনক শুভ ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন আন্দোলনে, কোনও চর্চ্চাতেই আমরা সেই পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করি না, সেই পরিমাণ আশায় উৎফুল্ল হইতে পারিনা, হিন্দুত্বের মূলভিত্তি স্বরূপ বেদ-সম্বন্ধে আলোচনা হইতে দেখিলে যে পরিমাণ হই। সমস্ত ভারতবর্ষেই এক্ষণে বেদের চর্চ্চা বড় কম। বঙ্গ-দেশের ত কথাই নাই, বাঙ্গালায় বেদ একপ্রকার বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু বড়ই সুখের কথা ও আনন্দের বিষয় যে, বারাণসীর ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার যত্নে কাশীতে যে একটি বেদ-শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই বেদ-বিদ্যালয়টি আজ নিরাপদে পূর্ণ একবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইল। এবং ইহা এই এক বৎসরেই কিয়ৎপরিমাণ কৃতিত্বেরও পরিচয় দিতে পারিয়াছে। বিশেষ আহ্লাদের কথা এই যে, এই বিদ্যালয়ে অনেক বাঙ্গালী ছাত্র বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা বাঙ্গালীর মুখে বেদ-গান শুনিতে পাইব, বাঙ্গালীর ঘরে আবার বেদ-ধ্বনি হইবে, বাঙ্গলায় লুপ্তবেদের পুনরুদ্ধার ঘটিবে, বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেরই যে ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই বিদ্যালয়ের জন্মোৎসব সম্বন্ধে আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে যে সংবাদ দিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।—

"বিগত শুক্লা ত্রয়োদশীতে কাশী বেদ-বিদ্যালয়ের একবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই জন্মোৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়ে ভগবতীর যথাবিহিত পূজা দক্ষিণাদি সহ বেদাচার্য্যদিগের সংকার ও বিদ্যার্থিগণ কর্তৃক যজু ও সামবেদ সস্বর পঠিত হইল। বাঙ্গালি বিদ্যার্থিগণ যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরে সামগান করিতে লাগিলেন, তখন সমাগত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলী বলিলেন যে, আজ কাশীতে এই নূতন দৃশ্য দেখিলাম, বাঙ্গালীর মুখে বেদ-গান!! বিদ্যালয়ের বার্ষিকী পরীক্ষা আরম্ভ হইল। মা অন্নপূর্ণার কৃপায় বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের বিশেষ উন্নতি হইবে।"

আমরাও বলি, মা অন্নপূর্ণা সংবাদ-দাতার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ও এই আশা চরিতার্থ করুন।

বেদ বিদ্যালয়ের শ্রাবণ মাসে আয়।

মুষ্টি ভিক্ষা।

শ্রীরমণী মোহন মল্লীক	মেহেরপুর নদিয়া	১৬৸৴০
" কৃষ্ণরঞ্জন সরকার	মহম্মদবাজার বীরভূম	৪৪৲
" কালীব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়	গদাইপুর মুর্শিদাবাদ	১৸৶০
" রমণী মোহন বসু	দিনাজপুর	১২৸৴০
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	বিলমাড়িয়া কুঠি	২০৲
" কাশী ধামের আষাঢ় মাহার মুষ্টি ভিক্ষা		১১৯৶৴১০
শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ	ধারজামতৈল পাবনা	২৫৲
" রজনীকান্ত গুপ্ত,	পিরোজপুর বরীশাল	৪।০
" মধুসূদন দাস	গোয়ালপাড়া	৭৲
" হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	কোলা ঢাকা	৬৲
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়	ধানকুড়া ঢাকা	৸৵০
" রাজ চন্দ্র সিংহ	ছান্তা ত্রিপুরা	২৶০
" প্রতাপ চন্দ্র সেন	ফতেপুর ডুমকা	২৸১০
" কৃষ্ণচরণ ধর	ছাতক শ্রীহট্ট	২৲
" শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য	হিন্দুসভা ময়মনসিংহ	৪৸০
" প্রসন্ন কুমার বর্ম্মন্ মোক্তার	হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট	৩৲
" বিপিন বিহারী শর্ম্মা	গয়া	৶০
" ঈশ্বর চন্দ্র শর্ম্মা	ঘোগা ময়মনসিংহ	২৲
" বনমালী মুখোপাধ্যায়	জঙ্গীপুর	২৲
" সম্পাদক ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা	শ্রীহট্ট	৪৲
" কৈলাশ চন্দ্র ওঝা	পাটদহ ২৪ পং	১৲
" হরিবোল দাস গুপ্ত	বীরভূম	৫৸০
" কালীদাস চক্রবর্ত্তী	আমাদপুর বর্দ্ধমান	৪৲
" গোবিন্দ চন্দ্র সুর	সামপুর বরীশাল	৮৲
" মনোহর রায়	বক্সর	২৲
" দেবেন্দ্র নাথ ওহদাদার	এলাহাবাদ	২।৶০
" রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শিলচর	৪৶০
" সরদা প্রসাদ ঘোষ	ইল্ছোবা মোগুলাই	১৲
" চন্দ্র কুমার দেবশর্ম্মা	ডুমকা	১৸৴০
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বরীশাল	২০৲
" গঙ্গাদিনাথ মুখোপাধ্যায়	বাঁকীপুর	৩৲
" শ্রীনাথ সরকার	দীনহাটা কুচবিহার	৫৲
" দীননাথ পাত্র	রামপুরহাট	৬৸৶০
" রতিকান্ত গুহ	কাউখালি বরিশাল	৩৲
" নবীনচন্দ্র দেব	কাজির বাজার শ্রীহট্ট	১৶০
" কালী কুমার ভট্টাচার্য্য	সাহানগর মুর্শিদাবাদ	৯৶৴১
" কালীপদ পান শুকর্ফলা	রামপুরহাট	।৶০
" বিহঙ্গ নাথ দাস	গয়া	১০৲

এক কালীন দান প্রাপ্তি।

শ্রীবলরাম সাহা	চেতাঙ্গী	৸০
" বিশ্বেশ্বর সেন	পুরাণ লাইন শ্রীহট্ট	২৲
" দীননাথ দাস	ঐ	১৸০
" হৃদয় নাথ ভাদুড়ি	কুচবিহার	১৲
" নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়	গদাইপুর	৶
" রামচন্দ্র ব্রহ্মচারি	ঐ	৴
" যোগেন্দ্রলাল গোস্বামী	ঐ	৴
" হরেন্দ্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৴

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥"

১৩শ ভাগ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"

শকাব্দা ১৮১২ | আশ্বিন—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সোমঃ শৌচং দদাবাসাং গন্ধর্ব্বশ্চ শুভাং গিরং।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতঃ স্মৃতাঃ ॥

সোম দেবতা স্ত্রীজাতিকে শৌচ, গন্ধর্ব দেবতা শুভ বাণী, অগ্নিদেব সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীজাতি পরম পবিত্র।

ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধি গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভ ভর্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে ॥

ঋতুকাল প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী জাতি ব্যভিচার-জনিত দোষ হইতে শুদ্ধি লাভ করেন। পর পুরুষ কর্তৃক গর্ভ উৎপাদিত হইলে ভ্রূণহত্যা পতিহত্যা ও মহাপাতক-গ্রস্ত হইলে স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে।

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্না প্রিয়ংবদা।
স্ত্রী প্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা ॥

যে স্ত্রী মদ্যপায়িনী, সর্ব্বদা পীড়িতা, ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, বৃথা ধনক্ষয়কারিণী ও অপ্রিয় বাদিনী, এবং যে স্ত্রী কেবল কন্যাই প্রসব করে, তাদৃশী স্ত্রী সত্ত্বে দারান্তর পরিগ্রহ করিবে।

অধিবিন্নাতু ভর্ত্তব্যা মহদেনোন্যথা ভবেৎ।
যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গ স্তত্র বর্দ্ধতে ॥

কিন্তু প্রথম পরিণীতা স্ত্রীর ভরণ পোষণ করিবে। নহিলে মহাপাপ-গ্রস্ত হইবে। যে গৃহে স্বামী ও পত্নীর আন্তরিক প্রণয়-বন্ধন হয়, তথায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ বৃদ্ধি লাভ করে।

মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যানান্যমুপগচ্ছতি।
সেহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ ॥

স্বামী জীবিত থাকিতে বা পরলোক-গামী হইলে যে পত্নী পুরুষান্তরে উপগত না হন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি লাভ করেন, পরলোকে উমা ভগবতীর সহিত সানন্দে বিরাজ করেন।

আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষ বীরসূং প্রিয়বাদিনীম্।
ত্যজন্ দাপ্যস্তৃতীয়াংশমদ্রব্যো ভরণং স্ত্রিয়াঃ ॥

আজ্ঞানুবর্ত্তিনী বীরপ্রসবিত্রী প্রিয়বাদিনী পত্নীকে যিনি পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে নিজ সম্পত্তির তৃতীয়াংশ স্ত্রীকে দিতে হইবে। যিনি ধনসম্পত্তি-বিহীন, তাঁহাকে পরিত্যক্ত তাদৃশ স্ত্রীর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

স্ত্রীভি ভর্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতক-দূষিতঃ ॥

পতির আজ্ঞা বাক্য প্রতিপালন করা স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম। পতি যদি মহাপাতক-দূষিত হন, তাহা হইলে তাঁহার শুদ্ধি পর্য্যন্ত পত্নী অপেক্ষা করিবেন।

লোকানন্ত্যং দিব্য প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যাঃ কর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ।

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রাদি দ্বারা অনন্ত লোক ও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। স্ত্রীই তাহার কারণ। সুতরাং স্ত্রী-জাতির যথাবিধি সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।

ক্রমশঃ।

আগমনী।

শুনিতে হাসিও পায়, লজ্জাও হয়, ব্রহ্মময়ীর আগমনী! ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিনী সর্ব্বভূত-ব্যাপিনীর আগমনী! দেশে কালে যাঁহার পরিচ্ছেদ নাই, স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এমন স্থান জগতে নাই, যাহাতে তিনি নাই, অথবা এমন বস্তু জগতে নাই কিম্বা জগৎ বলিয়া এমন কোন বস্তু নাই যাহাতে তিনি নাই, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রতি অনু পরমানুতে যিনি, তাঁহার আবার আগমনী, এ কথা বিশ্বাস করিব কোন্ প্রাণে? কোথায় তিনি নাই যে তথায় তিনি আসিবেন? তাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তাঁহার আগমনী রহস্য কি? বুঝিব কি উপায়ে? বুঝাইয়া দিবেন কে? এ বিষম রহস্য বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া অন্তরের স্তরে স্তরে যে যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, তাহা বুঝিয়া সেই দুঃখের দুঃখী হইয়া এ তত্ত্ব আমায় বুঝাইয়া দিবেন কে? অন্তরের দুঃখ দেখিতে-জানিতে অন্তর্যামিনী বই ত আর কেহ নাই। কিন্তু আমার দেখিবার জানিবার পূর্ব্বে যিনি দেখিয়াছেন জানিয়াছেন, তাঁহাকে দেখাইতে জানাইতে যাওয়া অপেক্ষা মুর্খতাও ত আর নাই। তাই এ তত্ত্ব বুঝিবার কথা দূরে থাক্ এ দুঃখের কথা আমার জানাই-বারও স্থান নাই। আবার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, যিনি আমাতে আছেন বলিয়া অথবা যাঁহাতে আমি আছি বলিয়া আমার আমিত্ব রহিয়াছে, তিনি দুঃখ টুকু অনুভব করাইতে পারেন, কিন্তু দুঃখের কারণতত্ত্ব টুকু বুঝাইয়া দিতে পারেন না। আবার তাহাও ভাবি যে, যিনি এত বুঝাইতে পারেন, তিনি ঐ টুকুই বুঝাইতে পারেন না কেন? তাই, বোধ হয় যেন, তিনি বুঝাইতে পারেন না ইহা স্থির নহে আমি বুঝিতে পারি না ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। বুঝিব কিসে? জ্ঞান আছে বলিয়া? জ্ঞান-শাস্ত্র বেদ ত বলিতেছেন "তাঁহাকে জানিয়াছি বলিয়া যে অভিমান করে, তাহার পক্ষে তিনি অজ্ঞাত, এবং তাঁহাকে জানি না বলিয়া যে দুঃখিত হয় তাঁহার পক্ষে তিনি বিজ্ঞাত"। তবেই "কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলং" কাণ চক্ষু থাকিয়া আর ত কোন লাভ নাই, কেবল লাভের মধ্যে চক্ষুঃপীড়া, তদ্রূপ আমার জ্ঞান থাকিয়াও আর ত কোন ফল নাই, কেবল ফলের মধ্যে ঘোর অজ্ঞান, তথাপি আমি চক্ষু-ষ্মান্ এবং জ্ঞানী! দেখিতেত পাই না, তবে চক্ষুষ্মান্ বলিয়া অভিমান করি কেন? ঐ টুকুই ত সর্ব্বনাশের মূল। ঐখানেই ত স্থূলে ভুল, আমি মূর্খ, যাহাকে চক্ষু বলিয়া বুঝি, সেই রক্ত মাংসময় ভৌতিক অবয়ব অংশটি আমার আছে, সেই অক্ষিদ্বার, সেই পক্ষ্মপুট, সেই কণীনিকা সবই রহিয়াছে, আবার অধিকন্তু অশ্রান্ত জল নির্গম অশ্রান্ত বেদনারও উন্নতি হইয়াছে। সমস্তই রহিয়াছে কিন্তু হারাইয়াছি সেই বস্তুটি, যাহার দ্বারা দর্শন করিব। নাই আমার সেই শক্তিটি, যাহার বলে বস্তুতত্ত্ব অবগত হইব। তদ্রূপ যাহাকে লোকে জ্ঞান বলে, জ্ঞানের সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়ব বিচার বিতর্ক সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সবই আমার রহিয়াছে, অধিকন্তু জ্ঞানী বলিয়া অভিমানও জন্মিয়াছে, যাহার জ্বালায় দণ্ডে দশ বার ফাটিয়া পড়ি। কিন্তু হারাইয়াছি সেই শক্তি—সেই ভক্তি যাহার দ্বারা মহাশক্তির আগমনীতত্ত্ব বুঝিব। আমি ত কোন্ কীটানুকীট, জ্ঞানতত্ত্বে মহা মহারথীগণও আগমনীতত্ত্বে চির-অন্ধ। ব্রহ্মময়ীর আগমন, বিশ্বব্যাপিনীর আগমন এ সকল ত কেবল আমারই অহঙ্কারের আড়ম্বর। আমি ত কেবল শোনা

কথাই চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি। যিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, যাঁহার গৃহে তাঁহার নিত্যনব আগমনের বার্ত্তা প্রচার, সেই ভক্ত সাধককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি "ব্রহ্মময়ীরও" বলিবেন না, "বিশ্বব্যাপিনীরও" বলিবেন না, বলিবেন "মায়ের" আগমনী। কেন? মা যে ব্রহ্মময়ী বিশ্বময়ী তাহা কি তিনি জানেন না? জানেন, জানিলেও তাহা কাহাকেও জানাইতে চাহেন না ইহা তাঁহার অনুগ্রহ। জানিয়াই তোমার আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সেই সর্ব্বনাশ হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি তাহা অযোগ্য পাত্রে বিন্যস্ত করিতে চাহেন না। কখনও যাহা অনুভব করি নাই তাহাকেই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে তুমি আমি বিলক্ষণ বাক্‌পটু। ব্রহ্মও দেখি নাই তাঁহার আগমন অসম্ভব, ইহাও প্রতিপন্ন করিবার সাধ্য নাই, তথাপি ব্রহ্মময়ীর আগমন শুনিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি। ভক্ত কিন্তু জানিয়াও তাহা অনুভব করিতে চাহেন না, অনুভব হইলেও তাহা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। পিপাসার্ত্ত পথিক জলের জন্য গঙ্গাতীরে ধাবিত হয়েন। গঙ্গা যে পতিতোদ্ধারিণী ত্রৈলোক্যতারিণী শঙ্করশিরশ্চারিণী, ইহা তিনি জানেন, কিন্তু জানিলেও সে সময়ে তাহা তাঁহার স্মরণ হয় না, কেননা ও সকল বিশেষণের অনুধ্যান তাঁহার পক্ষে তখন নিষ্প্রয়োজন। পিপাসায় তাঁহার প্রাণ যায়, তিনি তখন উর্দ্ধ সংখ্যা চিন্তা করিবেন, গঙ্গা ভূতলবাহিনী সলিলরূপিণী তৃষ্ণাহারিণী জীবজীবন-বিধায়িনী, এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াই তিনি কৃতার্থ; আর বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তদ্রূপ তিনি ব্রহ্মময়ী হউন বিশ্বময়ী হউন চৈতন্য স্বরূপিণী তুরীয়া অনির্ব্বচনীয়া হউন, যাহা ইচ্ছা তাহা হউন, ভবভয়ভীত অনাথ কাতর ভক্ত সে সকল কথা শুনিয়াও শুনিতে চাহেন না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না, তিনি মা হারা সন্তান, মা পাইয়াই কৃতার্থ। সে মাও মুখের মা নহেন, কথার মা নহেন, দুঃখে গলিবার, কোলে করিবার, কোলে করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবার মা, "আমার" বলিয়া "ভয় নাই" বলিয়া, "এই আমি আসিয়াছি, বাছা! আয় আয়" বলিয়া দশ হস্ত বাড়াইয়া কোলে উঠাইয়া লইবার মা, সন্তানের যন্ত্রণা দেখিয়া নিজে কাঁদিয়া জগৎকে কাঁদাইবার মা, জগতের মা হইয়াও কেবল আমারই একার মা হইবার মা। এমন মাকে মা পাইয়া, মায়ের এত গুণ জানিয়া, দয়াময়ীর এই দয়া লাভ করিয়া কোন্ প্রাণে আমি তাঁহাকে নির্দ্দয়া নির্গুণা বলিয়া বুঝিব, যদি তাহা বুঝিলেই জ্ঞানী হওয়া যায়, তবে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি এ জ্ঞানের মস্তকে অচিরাৎ বজ্রাঘাত হউক।

যিনি আমার অমঙ্গলে সর্ব্বমঙ্গলা, বিপদে অভয়া, সম্পদে বিজয়া, পাপে পতিতোদ্ধারিণী, তাপে ত্রিতাপ-হারিণী, দুঃখে দুর্গতিহারিণী, তৃষ্ণায় ত্রিপথগামিনী, ক্ষুধায় অন্নদা, জীবনে বরদা, মরণে মোক্ষদা, সংসারে মা তাঁহাকে পাইয়া আর আমার জানিবার শুনিবার বুঝিবার ভজিবার কি আছে? রাখিয়া দাও তোমার শত শত তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মানন্দ, চির অজ্ঞান অন্ধকারে অন্ধ হইয়াও আমি যখন প্রাণের কবাট খুলিয়া বাহু তুলিয়া জয় জয় মা! তারা! বলিয়া তার স্বরে ডাকিতে থাকি, সেই স্বরের সঙ্গে সঙ্গে মহেশ্বরীর মা ভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি যখন দিগ্ দিগন্তে ছুটিতে থাকে, জ্যোতির্ম্ময়ীর সেই শত সহস্র শরদিন্দু বিনিন্দিত কৈবল্য কান্তিচ্ছটায় এ হৃদয়কন্দর-গত অন্ধকার যখন পলকে পালায়, তখন সে পুলক এ ভূলোকে দূরে থাক্ ত্রিলোকেও ত পর্য্যাপ্ত হয় না। আনন্দময়ী মায়ের আগমনে মায়ে পোয়ে সম্বন্ধ তখন যে আনন্দ বর্ষণ করে, ব্রহ্মজ্ঞানী দূরে থাকুন ব্রহ্মা পর্য্যন্ত তখন তাহার উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া যান। অন্যে পরে কা কথা? তাই বলিতেছিলাম, ভক্ত তাঁহার এই মাতৃতত্ত্বের অগাধ গম্ভীর অনন্ত শান্তি সাগরে ডুবিয়া

আর কোন তত্ত্বের দিকে দৃক্‌পাতও করিতে চাহেন না, এই ভক্তি রত্ন হারাইয়াই তুমি আমি রাজ রাজেশ্বরীর সন্তান হইয়াও কপাল দোষে পথের ভিখারী সাজিয়াছি, ত্রিনয়নার পুত্র হইয়াও অন্ধের দৃষ্টি উপার্জন করিয়াছি। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন, যে তাঁহাকে জানিয়াছি" বলিয়া বুঝিয়াছে সেই তাঁহাকে হারাইয়াছে।

এখন এ পর্য্যন্ত স্থির হইল যে আগমন "মায়ের"। ইহার পর বুঝিতে হইবে মায়ের আগমন সম্ভব কি অসম্ভব। একতঃ মায়া যাঁহার অঘটন ঘটন পটীয়সী, তাঁহাতে কিছু সম্ভব কি অসম্ভব এই প্রশ্নই আদৌ অসম্ভব। তাই ভক্ত মেনকার প্রবোধচ্ছলে জয়ার মুখে বলিয়াছেন "অসম্ভব সব তাঁহাতে সম্ভব, বিধি বিষ্ণু ভব মায়াতে উদ্ভব, শক্তি রূপে আদ্যাশক্তি মেয়ে তব, জগৎ প্রসব কারিণী, সর্ব্বত্রই মা আছেন তবে আর আসিবেন কোথায়? এই প্রশ্নটি কিন্তু তোমার আমার মুখে শোভা পায় না, কারণ মা যাহার সর্ব্বত্র, তাহার এ সংসারে একত্র বই সর্ব্বত্রই সম্ভবে না। আবার যাহার সর্ব্বত্র বলিয়া সকলের সমষ্টিগত সকলত্ব রূপভেদবুদ্ধি রহিয়াছে তাহার মা কখনও সর্ব্বত্র থাকিতে পারেন না। সর্ব্বত্র মা আছেন ইহা সত্য হইলেও আমার প্রত্যক্ষ অনুভবের বহির্ভূত। সর্ব্বত্র যাহার মা আছেন, তাহার এ সংসারে পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক আপন পর শত্রু মিত্র এ ভেদ জ্ঞান থাকে না, মা কখনও একবার শত্রু একবার মিত্র হইতে পারেন না। তাই সর্ব্বত্র মা আছেন ইহা কেবল পরকে বুঝাইবার কথা, নিজে বুঝিবার এখনও অনেক বিলম্ব। আর এক কথা, মা সর্ব্বত্র আছেন ইহা শাস্ত্র যুক্তি প্রমাণ সকলেই বলিয়া দেয় এবং সকলেই বিশ্বাস করে, যদি সত্য সত্যই সর্ব্বত্র আছেন তবে সত্য সত্যই সর্ব্বত্র দেখি না কেন? শাস্ত্র বলিবেন মায়া পটে তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়াছে তাই তাঁহাকে দেখিতে পাও না। স্বীকার করিলাম আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তিনি সেই মায়ার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তবে যাঁহার অন্তর্দ্ধান আছে, তাঁহার আবির্ভাব নাই ইহাই বা বিশ্বাস করি কিরূপে? বলিতে পারি এ অন্তর্ভাব তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত স্বাভাবিক, সেই ইচ্ছাকে সেই স্বভাবকে ব্যাহত করিয়া আমি তাঁহার তিরোভাব হইতে আবির্ভাব করাই কিরূপে? এই স্থানে প্রাণের কথাটি খুলিয়া বলিতে গেলেই আমার একটি প্রগাঢ় নাস্তিকতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অন্তর্ভাব তাঁহার যেমন স্বভাবিক এবং স্বেচ্ছাকৃত, তদ্রূপ আবির্ভাবও যে তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বাভাবিক নহে ইহাই বা কে বলিল? বরং সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বহ্নি যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত, সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপিণীর প্রকাশই প্রকৃতি, তিরোধানই বিকৃতি। যে শাস্ত্রে তিনি বলিয়াছেন "মম্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তি ভববর্ত্মসু"। আমার মায়ায় মোহিত হইয়াই জীব সকল সংসারপথে ভ্রমণ করে, সেই শাস্ত্রেই তিনি বলিয়াছেন "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" যাহারা কেবল আমাতেই প্রপন্ন হয়, তাহারা এই দুস্তর মায়া সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যায়"। তবে মায়ার আবরণে তাঁহার তিরোধান যেমন বিশ্বাস করি, আবার সে আবরণের উন্মোচনে তেমনই আবির্ভাবটি বিশ্বাস করি না কেন? করি না যে কেন, সেই কথাটি খুলিয়া বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, আমার যাহা কিছু বিশ্বাস অবিশ্বাস তাহা কেবল নিজের সুবিধা বুঝিয়া। আমি তাঁহার যেরূপ নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক পুত্র, তাহাতে তিনি যতক্ষণ তিরোহিত থাকেন, ততক্ষণই আমার কল্যাণ। নতুবা যে রণরঙ্গিনীর রণোন্মাদে দুরন্ত মহিষাসুর নিস্তার পান নাই তাঁহার সম্মুখে আমি কোন তৃণাগ্রের পরমানু? অন্যথা যে দুর্গোৎসাবের নাম শুনিলে যোগীর যোগাসন টলিয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া মাতৃজ্ঞানে মজিয়া তখন ভক্তিরসে ডুবিয়া যান আর আমি

ঘোর অভক্ত ঘোর অজ্ঞানী, আমার কি না দুর্গোৎসব দূরে থাক্, আগমনীর নাম শুনিলেই ব্রহ্মজ্ঞান উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ইহার অর্থ কি? তাই ভক্ত! বুঝিয়া লও আমি তত্ত্বজ্ঞানীও নহি, ব্রহ্মজ্ঞানীও নহি, ঘোর পাষণ্ড মহাচণ্ডাল, তাই চণ্ডিকার উৎসবে চিরবঞ্চিত। চির মধুর স্বভাবশীতল জলও অগ্নিযোগে উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু সেই অগ্নিতে ঐ উষ্ণ জল ঢালিয়া দিলে সে যেমন অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া নিজে শীতল হইয়া যায়; তদ্রূপ জীবের ত্রিতাপতপ্ত জীবনের অন্তর্যামিনীকে অন্তর্হিত বোধ হইলেও তাঁহার সেই সংসার-তাপতপ্ত ভক্তি-জল যদি ঐ অগ্নিমণ্ডপে—হৃদয় কুণ্ডে ঢালিয়া দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ত্রিতাপ নির্ব্বাপিত করিয়া, সে উষ্ণ ভক্তিও হিমশীতল শান্ত মধুর মূর্ত্তি অবলম্বন করে। ভক্তের সেই অগাধ প্রেম মন্দাকিনীর জলে স্নান করিবার জন্য জগদম্বা তখন তাঁহার হৃদয়-তীরে আপনি আসিয়া দাঁড়ান। চন্দ্রশেখরের স্বহস্ত-রঞ্জিত চরণাম্বুজের অলক্ত কুঙ্কুমদাম ভক্তের সেই ভক্তি-জলে বিধৌত হইয়া যখন অন্তঃকরণ আরক্ত করিয়া দেয়, আর ভক্ত যখন অনুরাগের রাগে আবার সেই চরণ রঞ্জিত করেন, তখন ভক্তকে প্রকারান্তরে মৃত্যুঞ্জয়-জয়ী বলিলেও ত অত্যুক্তি হয় না। ভক্তের এই প্রবল শক্তি আছে বলিয়াই ত ভক্তরাজ গিরিরাজ যোগীন্দ্রের কৈলাস মন্দির অন্ধকার করিয়া নন্দিনীকে নিজ নিকে-তনে আনিতে পারেন। ভক্তির এই অমোঘ আকর্ষণ আছে বলিয়াই ত অচলরাজনন্দিনী চঞ্চল চরণে মেনকার অঞ্চল ধরিয়া মা বলিয়া মায়ের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যান। ভক্তহৃদি-সর্ব্বস্ব-নিধি মা গো! তোমার ভক্তির এ অনন্ত মহিমা কাহার সাধ্য বুঝিয়া উঠিবে? দয়াময়ি! দয়া করিয়া তুমি যাহার হৃদয়ে তোমার অভাব অনুভব করাইয়া দাও, তাহারই হৃদয়ে তোমার প্রভাব জাগিয়া উঠে। সংসারে থাকিয়া এই প্রবৃত্তি মার্গ দক্ষিণায়নে—ঘোর অকালে যিনি তোমায় জাগাইতে পারেন, মা! তোমার দুর্গোৎসবের অকাল বোধনে তিনিই সিদ্ধ সাধক। তাই বলি "তুমি ব্রহ্মময়ী বিশ্বময়ী" এ বুদ্ধি দূর করিয়া আমার মা-ময়ী বুদ্ধি আনিয়া দাও! আমি এক বৎসর পর্য্যন্ত মায়ের অভাব অনুভব করিয়া তিন দিনের জন্য প্রাণ ভরিয়া মাকে দেখিয়া লই। প্রতি নিমেষে তোমায় বিশ্বময়ী বলিয়া মনে করি, তোমার অভাব কোথাও আছে, ইহা স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না, কিন্তু কৈ মা! তবু ত এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নেও দর্শন দিলে না। রক্ষা কর মা! আমি আর তোমার বিশ্ব-ব্যাপিত্ব অনুভব করিতে চাই না। এক বার ঐ গিরি-রাজ মেনকার হৃদয়ের মত এ হৃদয়ে তোমার বিশ্বব্যাপী অভাব আনিয়া দাও। যাহার বলে আমি বৎসরান্তে তোমার কৈলাসের মণি-মন্দির হইতে দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে আনিয়া বিশ্বজননীকে আমার জননী বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারি। দুঃখের কথা বলিব কি মা! তোমার কৃপার ত্রুটি নাই, আমাদেরই অদৃষ্ট মন্দ। সম্বৎসরের আশা ভরসা অন্তরে পোষণ করিয়া যাহার অধিবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণ তোমার দর্শনের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকে, সেই ভারতের শীর্ষক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্ত আমাদের জন্মস্থান বলিতে বুক্ ফাটিয়া যায় মা!

"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ।"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের কথা দূরে থাক্, চণ্ডাল ম্লেচ্ছ দস্যুগণ পর্য্যন্ত যেখানে তোমার উৎসবানন্দে অধীর উন্মত্ত, সেই স্থানে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও মা! আমরা আজ্ কর্ম্মচণ্ডাল সাজিয়াছি! তোমার পূজার অবসর পাইলেই অনার্য্যদেশে যাত্রা করি। অসুর কুল-উদ্ধারিণি! ত্রৈলোক্য-নিস্তারিণি! মহিষ-মর্দ্দিনি! মাগো! অসুর কুল উদ্ধার জন্যই ত তোমার এ মূর্ত্তি পরিগ্রহ। তাই জিজ্ঞাসা করি এ অসুর কুল উদ্ধারের কি উপায় করিয়াছ মা! বলিয়া দাও মহিষাসুরের মত কোন্ গুরুতর অপরাধ করিলে তুমি

তাহার স্কন্ধে ঐ ত্রৈলোক্য দুর্লভ শিবসম্পদ্ পদাম্বুজ বিন্যাস করিয়া দণ্ড বিধান কর। মহিষাসুর! তুমি অসুরকুলে জন্মিয়াছিলে, আর আমরা ব্রাহ্মণবংশাবতংস, মায়ের কৃপা চাই না, ভক্তরাজ! তুমি একবার কৃপা করিয়া পদাঘাতে এ অহঙ্কার ধ্বংশ করিয়া দাও। আমরা দেবদলের জয়গান না করিয়া মুক্তকণ্ঠে দৈত্যকুলের বিজয় গাথা গান করি। আর চিরভক্ত বঙ্গনল নারীগণ! তোমাদিগকেও বলি! জগদম্বার আগমনী এ দুর্গোৎসব তোমাদেরই পৈতৃক সম্পত্তি, এধনে তোমরাই ধনী। এ ধনের জন্য ত্রিজগৎ তোমাদের দ্বারে নিত্য ভিক্ষুক! তোমরা যদি এ সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইয়া পথের ভিখারী সাজ, তবে দোষ দিবে কাহার? বঙ্গের দুর্গোৎসব জগতের আদর্শ উৎসব, বঙ্গের আরাধ্যা জয়-দুর্গা ত্রিজগতের জননী, তথাপি এমন আদরের এমন সোহাগের পুত্র কন্যা তাঁহার আর কোথায় আছে, যাহাদিগকে দর্শন দিবার জন্য—উদ্ধার করিবার জন্য সদানন্দের সদানন্দ ধাম নিরানন্দ করিয়া আনন্দময়ী ধরাধামে অবতীর্ণা। এ অভিমান ভক্ত-হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন, কাতর হৃদয়ের সঞ্জীবন, মুমুক্ষু হৃদয়ের নির্ব্বাণনিমন্ত্রণ। মায়ের আগমন অবিশ্বাস করিও না, ঐ বিশ্বাস আছে বলিয়াই আজও আর্য্যাবর্ত্ত নাম রহিয়াছে। মায়ের আগমন আছে বলিয়াই প্রবাসী সন্তানের গৃহে আগমন, শ্বশুরকুল হইতে কুল কুমারীর পিতৃ গৃহে আগমন, পিতৃ-গৃহ হইতে কুল-বধূর পতিকুলে আগমন, সখার গৃহে সখার আগমন, সখীর গৃহে সখীর আগমন, মায়ের নিকটে পুত্রের আগমন, পুত্রের নিকটে মায়ের আগমন আর বঙ্গকুল-কুমার কুমারীগণ! তোমার গৃহে জগদম্বার আগমন। যে আগমনীর মধ্যে এত আগমন, তাহাকে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা মহাপাতক আর কি আছে? পতিতোদ্ধারিণি মা! পূজা করিবার অধিকার নাই, দয়া করিয়া দর্শন দাও। অশ্রুজলের অঞ্জলি দিয়া অপরাধ-ভঞ্জন করি। দাঁড়াও দাঁড়াও সম্মুখে দাঁড়াও! একবার ঐ ভয়ভঞ্জিনী রণরঙ্গিণীরূপে দর্শন দাও। মুহূর্ত্তের জন্য মা বলিয়া কাঁদিয়া সম্মুখে দাঁড়াই। দশভুজ প্রসারণ করিয়া অভয় কোলে উঠাইয়া লও, কোলে উঠাইয়া মা বলাইয়া স্তন্য দিয়া ধন্য কর। আমি তোমার আগমনী ভুলিয়া আমার আগমনী দেখিয়া লই।

ভ্রম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যেখানে দৃষ্টি যায় না, শত চেষ্টা করিলেও যে বিষয় বুঝিতে পারা কঠিন, বিচার বুদ্ধি যে দেশে গিয়া এলাইয়া পড়ে, কল্পনা সেই স্থানেই শতমুখী হইয়া প্রসারিত হয়। কিন্তু আমরা কোন কথা বুঝি, কোনটা বা বুঝিতে পারি না, কোন সামগ্রীটি দেখিতে পাই, কোনটি বা দেখিতে পাই না! যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি এবং যাহা অনুভব করিতেছি তাহাত সব শিখান কথা। কৈশোর হইতে পাখী পড়ান মত পিতা, মাতা, শিক্ষাদাতা পড়াইয়াছেন, শিখাইয়াছেন; যাহা পীত, হরিত, কপিশ বলিতে বলিয়াছেন, যাহা সিংহ ব্যাঘ্র, পক্ষী বলিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; কটু, কষায়, মধুর বলিতে আদেশ করিয়াছেন তাহাই বলিতেছি, তাহাই বুঝিতেছি। নিজে স্বাধীন ভাবে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, বিচার করিতে পারি না। অধীত পুস্তকাদি হইতে বহুপণ্ডিতের তিল তিল করিয়া বুদ্ধি লইয়া আমার মস্তকে সমষ্টিবদ্ধ হইয়া এক অপূর্ব্ব সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। আমি যাহা লিখিতেছি, বুঝিতেছি, বুঝাইতেছি তাহাতে পাড়ার পাঠশালার রাম মহাশয়ের একটু অংশ আছে, শিবু পণ্ডিতের একটু অংশ আছে, প্রফেসরের একটু অংশ আছে, মিল, স্পেনসারও অনেকটা দাবী দাওয়া করেন। সুতরাং আমার নিজের দেখা অথবা বুঝা হয় না। যদি বলা যায় যে এক অবস্থায়, এক সময়ে, এক স্থানে এক রকমের দশজনে একটা সামগ্রী দেখিয়া যাহা এক

বাক্যে স্থির করিয়া বলিবেন তাহাই সত্য এবং গ্রাহ্য। তাহা হইলে একটু বিশেষ গোল বাধে। প্রথমত পর-বুদ্ধির উপর, ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে; তাহার পর এক অবস্থা, এক সময়, এক স্থান এবং এক সামগ্রীর সংযোগ করিতে হইবে। তাহা অসম্ভব। অবস্থার নিত্য বিদ্যমানতা নাই। পারমাণব জগতে পলে ২ এক একটা বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রত্যেক বস্তুরই নিমিষে ২ নূতন ভাব, নূতন গুণ নূতন গঠন এবং নূতন অবস্থার প্রাপ্তি হইতেছে। এই যাহা আছে তাহা নাই। সতত গতিশীল জগতে স্থির হইবার বিষয় অসম্ভব। অতএব সময়ও স্থির নহে। দর্শন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যদি বলি যে অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল; তাহা হইলেও একটু দোষ হয়। একতঃ পরের কথার উপর নির্ভর করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এটা প্রকাণ্ড কথা, অলৌকিক কথা। মোটা চক্ষে, মোটা বুদ্ধিতে যাহার নিত্য নূতন সাজ দেখিতেছি, যাহার গতি অনুভব করিতেছি তাহাকে দণ্ডায়মান বলি কেমন করিয়া। যদি বুঝাও যে গতিবিধির বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলে সময়ের সময়ত্ব থাকে না; কিন্তু তথায় আমার এ আমিত্বও থাকে না। নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ স্থির হইয়া নয়ন মেলিয়া দেখিলে ত আমার সহিত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকে না, আমি এখন যাহা, তখন ত তাহা থাকিব না। অতএব বুঝা গেল যে তোমার কথামত দেখা, শুনা, বুঝা এবং সত্য পদার্থ নিরূপণ করা অসম্ভব। শুনিয়াছি সত্য পদার্থ এক ভিন্ন, দুই নহে, অনন্তকাল হইতে যাহা সত্য, তাহা সত্যই আছে, মিথ্যা হইতে জানে না। ফলে যে স্থির হইয়া দেখিতে জানে না যে পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তপথ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া সকল কথার আলোচনা করিতে পারে না তাহার দেখিয়া, শুনিয়া আবশ্যক কি? সে অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিকে কোরকেই দলিত করুক না, নিমীলিত নেত্রে ভ্রমের সাগরে ভাসিয়া যাউক না, রূপের বিদ্যুৎছটায় ডুবিয়া থাকুক না?

অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে রূপ মিথ্যা, পদার্থ সত্য। আমি ভ্রমের পক্ষপাতী, আমি বলি রূপ সত্য এবং নিত্যবিদ্যমান, জগৎ রূপময়। যাহাই অনুভূতিগম্য তাহাই রূপ। অথবা অনুভূতির অন্য নাম রূপ। যাহা দেখি, তাহা চাক্ষুষী অনুভূতিগত রূপ, যাহা শুনি, তাহা শ্রবণের অনুভূতি গত রূপ ইত্যাদি। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ রূপগ্রাহী। সুতরাং আমার আমিত্ব যতদিন হইতে, রূপও ততদিন হইতে; দেহী দেহগত যত দিন থাকিবে, রূপের অস্তিত্বও তত দিন থাকিবে। অতীন্দ্রিয় কিছু আছে কি না জানি না। কেননা দেহের অনুভূতি নিচয় ভাসিত না হইলে রূপের গোচর হয় না, নিজের নিজত্ব বোধ হয় না। কাজেই ইন্দ্রিয়াতীতের আলোচনা ঠিক যেন "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা"। এই যে প্রকৃতি সতী অনন্ত মাধুরী অঙ্গে জড়াইয়া, কল্পনার প্রভা বদনে মাখিয়া, ভ্রমের মদিরা নয়নে ঢালিয়া তোমার চক্ষের উপর নাচিতেছেন, বল দেখি অনন্ত রূপের ছটা ব্যতীত ইহাতে অন্য কিছু আছে কি না? আমার আমিত্ব যাউক, পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ ক্রিয়া বাদ দেও, তখন আর জগৎ নাই, সৃষ্টি নাই। যদি কিছু থাকে ত ইহা ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত ব্যাপার; তোমার আমার ন্যায় হীন অধিকারীর আলোচ্য নহে।

অনেক নীতিবিদ্ বলিয়া থাকেন যে পতঙ্গ রূপের মোহে আগুনে পুড়িয়া মরে, হরিণী সঙ্গীতের আকর্ষণে জালে আবদ্ধ হয়, অতএব মনুষ্য সর্ব্বথা ইহা পরিত্যাগ করিবে। পরন্তু অণু হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত, মহান্ হইতে মহত্তর পদার্থ অবধি সকলি রূপময়, শোভাময়। অসীম আকাশ দেখিয়া তুমি অনন্তের কথা মনে কর, বিশাল সমুদ্র দেখিয়া অপার ভাবনায় ডুবিয়া যাও, নীল গগণের চুক্‌চুকে তারামালা দেখিয়া রূপ সাগরে সন্তরণ দিতে থাক, জলনিধির অগণ্য ঊর্ম্মি পরম্পরা দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া যাও, জ্যোতিষ যখন তাহাদের ব্যাপকতার এবং

অসংখ্যত্বের গুপ্ত সমাচার তোমার কানে কানে বলিয়া দেয় তখন বিরাট রূপে মিশিয়া যাও। অথচ কণ্টকীর ক্ষুদ্র কণ্টকের তীক্ষ্ণতার বিচার তোমার দ্বারা হয় না। তীব্র হইতে অতিতীব্র অনুবীক্ষণ সহযোগে তাহা নিরীক্ষণ কর, দেখিবে তাহার তীক্ষ্ণ মুখের সীমা নাই, ক্ষুদ্রের মধ্যে মহত্ব মাখান আছে, সামান্যের ভিতর বিশালত্ব ওত প্রোত ভাবে মিশ্রিত আছে। বিরাট বিশাল পর্ব্বত, আকাশ যেমন অনন্ত পথে ধাবমান, "অণোরনীয়ান্" কণা তেমনি অসীমত্বে ডুবিতেছে। রূপের প্রভা, জ্যোতির প্রকাশ বড় অধিক, উহা তোমার আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি টপ্‌কাইয়া কোথায় গিয়া ছড়াইয়া পড়ে। সামান্য রূপের কণা দেখিয়া, শোভা-পুষ্পের রেণু আঘ্রাণ করিয়া আমরা অভিভূত, মুগ্ধ, ভ্রান্ত এবং চমৎকৃত হইয়াছি। পরন্তু পতঙ্গ এবং হরিণী ধন্য, কারণ তাহারা রূপমুগ্ধ, রূপের মন্দিরে আত্ম-বলি দিয়াছে। তুমি, আমি ও রূপের জন্য পাগল হইয়া বেড়াইতেছি, রূপের বহ্নি-শিখার চতুস্পার্শ্বে ঘুরিয়া ২ উড়িতেছি। তবে প্রভেদ এই পতঙ্গ অন্ধকার ঠেলিয়া আসিয়া রূপের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়া পড়িতেছে, কাহা-কেও জিজ্ঞাসা করে না, কেহই শিখায় না। আর অহম্মুখ মনুষ্য রূপের অপ্রতিহত আকর্ষণে উন্মত্ত হইয়া দৌড়িতেছে, কিন্তু নিজে গিয়া স্বতএব আত্ম-উৎসর্গ করিতে পারিতেছে না; তাই বুঝি শক্তির ঘোর ঘূর্ণী-মণ্ডল দ্বারা বিতাড়িত হইয়া রূপের অগ্নি-জিহ্বায় পতিত হইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। সম্রাটের কর নতশিরে বিনীত ভাবে দিলে যত সুখ, যত সুবিধা; তত কি কেশাকর্ষিত বিদ্রোহীর ন্যায় চরণচুম্বন করিয়া ঘাটি স্বীকার করিলে সুখ, না আনন্দ হয়।

রূপময় জগতের সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া মনে হয় যে কোন তীব্র তেজোময়ী জ্যোতিঃ-কেন্দ্র হইতে করলেখা সকল প্রস্ফুরিত হইয়া ত্রিলোক সমুদ্ভাসিত করিতেছে; মনে হয় বুঝি কোথাও প্রভাময়ী প্রতিমা দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাঁহার সোনার অঙ্গ হইতে তড়িৎছটা বিসর্পিত হইয়া লোকালোক সমুজ্জীবিত করিতেছে। কল্পনার ঘোরে ভ্রমের নেশায় আরও দেখিতে পাই যেন সেই মধ্যাস্থিতা অরূপিণীর * প্রত্যেক ফুৎকারে ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইতেছে, আবার সংহার ক্রিয়ার দ্বারা শোভার প্রভা সম্পুটিত হইতেছে। যদি তোমার বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়াতীত কোন পদার্থ থাকা সম্ভব বোধ হয়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় পরি-দৃশ্যমান রূপময় জগতে রূপের সনাতনত্ব কেননা সত্য সিদ্ধান্ত হইবে। সে দেশে আমরা কেহই যাই নাই, নিজ২ বুদ্ধির দূরবীণ লাগাইয়া এক একটা নূতন কথার অবতারণা করিতেছি মাত্র। সংসারের বিধিবদ্ধ কার্য্য-কলাপের জন্য দশজনের বুদ্ধি ও বহুদর্শনের প্রয়োজন হইবে; তোমার দর্শন, রসায়ন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্রাদি সবই বাহিরের গোটাকতক নিয়মের বিচার করিয়া থাকে, ক্রিয়ার সংযোগ বিয়োগের বিশেষ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু যাহা সংবদ্ধ, প্রাকৃতিক লীলায় দূরস্থিত, সংযোগ ভোগ-বিয়োগ ক্রিয়া হইতে যাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাহার অন্বেষণ করিতে হইলে বাঁধা বাঁধি সাজসজ্জা ত্যাগ করিতে হইবে। তখন গর্ব্বিত সহজ জ্ঞান লজ্জায় অধোবদন হইবে, বিজ্ঞ পরিণাম দৃষ্টি অবসন্ন হইয়া পড়িবে, অধীত শাস্ত্র-তত্ব দূরে পলাইবে, জ্ঞান বিজ্ঞানের পেটিকা বুদ্ধি রজ্জু দ্বারা নামাইয়া দিলেও সে অগাধ সাগরের তল পাইবে না। সুতরাং সে দেশে আর "ভোটের" দর-কার হয় না। পূর্ব্বেকার ভ্রমের অন্ধতামস তখন অমল, ধবল কৌমুদী ছটায় পরিণত হয়। তখন বোধ হয় ভ্রম সুখ, ভ্রম মনোহর, ভ্রম শোভা। তুমি যদি ভ্রান্ত হও,

* অরূপিণী অর্থে "রূপ নাই যাঁহার" বলিলে চলিবে না। "যাঁহা হইতে আর রূপ নাই, যিনি না থাকিলে রূপ থাকিবে না" এই অর্থ আরোপ করিলে "ভ্রান্তি" লেখক সুখী হইবেন।

তুমি যদি শিক্ষা, দীক্ষার রঙ্গিল চসমা ত্যাগ করিয়া সাদা চক্ষে দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে সেই গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে নিত্য রাধাকৃষ্ণের লীলা হইতেছে। দেখিতে পাইবে শ্যামের অঙ্গে চিন্ময়ী বিদ্যুচ্ছটায় বিজড়িত হইয়া রহিয়াছেন; আর সেই চৈতন্য-তনুভায় ত্রিভুবন প্রকাশিত করিতেছে! তাঁহার অঙ্গের এক কণা তেজ লইয়া সূর্য্য সবিতা দেবতা হইয়াছেন, তাঁহার নয়নের একটু আবেশ মদিরা ভিক্ষা করিয়া চন্দ্রমা প্রেমিকের অবলম্বন হইয়াছেন, সেই চিন্ময়দেশে কিশোর কিশোরীর যুগল রূপ দেখিয়া অষ্টসখী মহারাসের আবির্ভাব করিয়াছেন; কল্পনার—ভ্রমের—আবেশের বীচিমালা কুলকুল ধ্বনিতে সহস্রারবিন্দের পত্রে২ গিয়া আঘাত করিতেছে, নিষ্কলঙ্ক পুর্ণেন্দু অমল ধবল জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিতেছেন, আর বঙ্কিম বর্হচূড়া শ্রীমতীর দোদুল্যমান বেনী গুচ্ছ লইয়া লুকাচুরি খেলিতেছে। তাই বলিতেছি যে—

"দিল দরিয়ার পারে, রত্ন বেদীর উপরে, সে যে বল্‌তে নারি, বুঝ্‌বি সে কি দেখিলে পরে; পরিব্রাজক বলে দেখবি যদি ধুয়ে নে মনের মলা।"

কামরূপ কামাখ্যা যাত্রা।

সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধপীঠ যোনি-মুদ্রাস্বরূপিণী মা কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার পিপাসা আমার অনেক দিন ছিল। ধর্ম্মসভা সমূহের ধর্ম্মার্থি সেবা করিতে ২ মায়ের নিকট যাইব, এই সাধ অনেক দিন হইতে আমি মনে ২ পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। মা সে সাধ মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ছেলের ক্ষুধা তৃষ্ণা মা যেমন বুঝেন, এমন আর কেহই বুঝে না। আমি নিতান্ত অকিঞ্চন, ও অনাথ হইলেও জগজ্জননার চারু চরণচ্ছায়া ভিন্ন অন্য কোথাও বিশ্রাম করিবার আর স্থান আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তাই মনে ২ ভাবিতাম একবার মার কাছে যাইব।

গত বারে প্রচার যাত্রা কালে আমি যখন কুচবিহার হইতে ধুবড়ী গমন করিলাম, সেই সময় মার কাছে যাইবার ইচ্ছা দিন ২ অধিক বলবতী হইতে লাগিল। ধুবড়ী হইতে বাষ্পীয় জলযানে মায়ের নিকট যাইতে ২৪ঘণ্টা লাগে। গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে চড়িলে অথবা রঙ্গপুর, কাউনিয়া, যাত্রাপুর ধুবড়ী হইয়া ডিব্রুগড়া-ভিমুখী ষ্টীমারে আরোহণ করিলে পরম সুখে গৌহাটী (Gauhati) পুরে পৌছান যায়।

• ধুবড়ী পূর্ব্বে সবডিবিজন ছিল, এক্ষণে জেলা হইয়াছে। অনেক গুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক সেখানে চাকরি, ওকালতি আদি উপলক্ষে বাস করেন। সেখানে হরিসভা, ও সুনীতি সঞ্চারিণী সভা আছে। শাস্ত্র মধ্যেও এ স্থানটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষীন্দ্র সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে বেহুলা ভেলায় করিয়া জলপথে এই দিকে লইয়া আসেন। ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে "নেতাধোবানী" কাপড় কাচিতেছিল, সেই মন্ত্র-বিদ্যা-নিপুণা বৃদ্ধা বেহুলার দুরবস্থায় কাতর হইয়া মন্ত্র শক্তি প্রভাবে লক্ষীন্দ্রের সর্পদষ্ট মূর্চ্ছিত দেহে পুনঃপ্রাণ সঞ্চার করিয়া দেয়। নেতাধোবানীর বিশাল প্রস্তর স্তর গঠিত ঘাটের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এই পবিত্র ঘাটে অনেকে স্নান করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ "ধনী বুড়ী" এই শব্দ হইতে "ধুবড়ী" এই বর্ত্তমান নাম হইয়াছে। ধুবড়ীতে কয়েক দিন হরি সভার সেবা করিতে ২ জবরিকম্প সাময়িক পীড়া "ইনফ্লুএনজা" আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিল, ৭।৮ দিন বিলম্ব করিলাম, তথাচ কাশী ছাড়িল না। সুতরাং ধুবড়ীতে থাকিতে আর ভাল লাগিল না, কামরূপ যাইবার ব্যাকুলতা বাড়িল। একজন ভদ্রলোক বলিলেন, পীড়া আরোগ্য হইলে পর গেলেইতো ভাল হয়, তাহাতে আমি বলিলাম,—পীড়িত বলিয়াই আর বিদেশে থাকিব না, এক্ষণে মার কাছে যাই, ভাল হইলে তবে অনাত্র যাইব। তিনি কি মনে করিলেন, তাতো জানিনা, কিন্তু আমার হৃদয় মার জন্য বড় কাঁদিয়া উঠিল। ধুবড়ী পরিত্যাগ করিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম, অনেক ধর্ম্মশীল মহাত্মা সঙ্গে ২ ষ্টীমার ঘাট পর্য্যন্ত আমাকে অগ্রসর করিয়া দিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ষ্টীমার ছাড়িল, কিয়দ্দূর গিয়া নোঙ্গর করিয়া থাকিল, রাত্রি থাকিতে আবার যাত্রা করিল, প্রত্যূষে গোয়াল পাড়ায় ষ্টীমার পৌছিল। "টোকরেশ্বরী" দর্শনের জন্য আমি গোয়াল পাড়ায় নামিলাম। আমার যাইবার কথা পূর্ব্বেই তথায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, তাই আমি নামিবা মাত্র, তথাকার কতগুলি ধর্ম্মোৎসাহী মহাত্মা আসিয়া ঘাট হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে লইয়া গেলেন।

টোকরেশ্বরী।

ধুবড়ী যখন সবডিবিজন ছিল, তখন গোয়ালপাড়া জেলা, এক্ষণে ধুবড়ী জেলা হওয়ায় গোয়ালপাড়া সবডিবিজন হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রতটে নাত্যচ্চ নীচায়ত শৈলোপরে ডিপুটী কমিশনরের সুমার্জ্জিত সৌধ, পর্ব্বতনিম্নে রাজকীয় কার্য্যালয় গুলি সংস্থিত। গোয়ালপাড়ায় সাধারণতঃ আসামী দিগের বাস, কিন্তু সরকারী চাকরি বা ব্যবসায়াদি উপলক্ষে অনেক গুলি শিক্ষিত ও ভদ্র বাঙ্গালীও তথায় নিবাস করেন। গোয়ালপাড়া নিবাসীগণ প্রায়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত ও ভক্তিমান্। সেখানে হরি-সংকীর্ত্তন সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। আমি তথাকার বাবু অনাদিচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে থাকিলাম।

"টোকরেশ্বরী" দেবীর স্থান গোয়ালপাড়া হইতে রাজপথ দিয়া গেলে ৮।৯ ক্রোশ, কিন্তু বন পর্ব্বতাকীর্ণ দুর্গম পথ দিয়া গমন করিলে

৭।০ ক্রোশ মাত্র। অনাদি বাবু নিজ গজ বাহনে আমাকে দেবী দর্শনে পাঠাইয়া দিলেন। ।৫ জন লোক সঙ্গে আমি বনাকীর্ণ পথ ধরিয়াই গমন করিলাম। পথিমধ্যে সাঁওনা ২ গ্রামও দৃষ্ট হইল। রাত্রি ৪টার সময় বাহির হইয়া বেলা প্রায় ১০টার পর আমরা "টোকরেশ্বরী" পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলাম। পীঠমালার মধ্যে ইহাঁর নাম নাই, কিন্তু তথাকার লোকে বলে, মা দাক্ষায়নীর উরুদেশ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। যাহা হউক স্থানটি বড় নির্জ্জন, মনোহর ও প্রকৃতিক সৌন্দর্য্যমালা মাণ্ডত। অতি নিকটে লোকালয় নাই, অল্পদূরে যাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য। পর্ব্বতের উপরে বৃহদ্ বৃহদ্ বৃক্ষ আছে, নিম্ন স্থানটি বিল্ব আম্র আদি বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আচ্ছাদিত। পর্ব্বততটে মায়ের চরণ পাদুকার ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির, সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত নাট্যশালা এবং পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। পর্ব্বতের পাদদেশে নির্ঝরিণীর নির্ম্মল ও অতিশীতল জল পূর্ণ আর একটি জলাশয় আছে, নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা এই খান কার জল লইয়া গিয়া পান করে। প্রতি শনি ও মঙ্গল বারে নাট্যশালার পার্শ্বেই শিবা বলি-ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

আতপতাপে আমার শরীর অতিশয় সন্তপ্ত ও গজারোহণে শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, তাই বৃক্ষের ছায়ায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। ইনফ্লুয়েন্‌জার তাড়নায় কয়েক দিন স্নান করি নাই, কাশীরও অতিশয় প্রাদুর্ভাব, তথাচ মাকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে হইবে বলিয়া সে দিন স্নান করিলাম। পূজারি মহাশয় আসিলেন, সঙ্গে দুগ্ধ, জল, নৈবেদ্য পুষ্পাদি লইয়া দুইজন ভারবাহক,—তাঁহারাই আমার মায়ের পূজোপচার গুলি লইল। পূজারিটি অতি ভদ্র ও বিনম্র; অতি শিষ্টাচার সহ আমাকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতটি অতি দুরারোহ—উঠিবার সুগম পথ নাই। ধীরে ২ সাবধানে উঠিতে হয়। চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে পীড়িত ও ক্লান্ত শরীরে পর্ব্বতে উঠিতে বড় ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু দেবীপীঠ দর্শনের উৎসাহ আবার শতগুণ হৃদয়ের বল বিধান করিয়া দিল। শিলাখণ্ড, বৃক্ষমূল আদি ধরিয়া উঠিতে বসিতে ক্রমে চলিলাম। পর্ব্বতের কিঞ্চিদূন অর্দ্ধপথে উঠিয়া বাম পার্শ্বে লাঙ্গিতে হয়। সেই খানে ভৈরব-মহাদেবের স্থান। ধীরে ধীরে পার্ব্বতীনাথের সমীপে উপস্থিত হইলাম। একটি প্রকাণ্ড ছায়া বৃক্ষ গুহা মধ্যে ভৈরবের অবস্থিতি। তাঁহার আশ্রয়ে বসিয়া ও পূজা করিয়া প্রাণ শীতল হইল। পূজার ঘণ্টা ধ্বনি হইলেই শিবের এক পার্শ দিয়া একটি কাঠ বিড়ালী ও অপর পার্শ্ব দিয়া একটি মূষিক আসিয়া উৎসর্গীকৃত তণ্ডুল, রম্ভা, সন্দেশ আদি খাইয়া গেল। পূজারিজী বলিলেন, উহারা প্রত্যহই এই রূপ করিয়া থাকে। তথাকার কার্য্য শেষ করিয়া আবার শিখরাভিমুখে আরোহণ করিতে লাগিলাম। দশ বারো বার বিশ্রামের পর পর্ব্বতের উনশীর্ষ ভাগে উঠিলাম। সেই স্থান হইতে ভগবতীর মন্দিরে উঠিবার পথটি অতি সংকীর্ণ। একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, কি জানি কত দিন নিজ বক্ষ দ্বিধা বিদীর্ণ করিয়া মায়ের কাছে যাইবার জন্য—দর্শনার্থীদিগের অশেষ ক্লেশ নিবারণের জন্য—পথ করিয়া রাখিয়াছে। সেই শিলাখণ্ডটি দ্বিধা বিভক্ত না থাকিলে মার মন্দিরে কেহই সহজে যাইতে পারিত না। সেই পথ দিয়া কায় ক্লেশে একটি মাত্র মানুষ যাইতে পারে; স্থূল শরীর হইলে কিছু কশাকশি হয়। মায়ের আশ্রয়ে অনেক মর্কট বানরও বাস করে। তাহারা সেই পথে আসিয়া বড় উৎপাত করিয়া থাকে। এই জন্য অনেক যাত্রীই ভীত হয়। মায়ের কৃপায় আমরা উপরে উঠিলাম। মায়ের দর্শন ও যথাবিধি উপচার সহ পূজা করায় হৃদয়ে আনন্দ প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পীড়াক্রান্ত কাতর ও ক্লান্ত শরীরে আমি এমন আনন্দ আর কখন ভোগ করিয়াছি কিনা, তাহা স্মরণ হয় না। মাতৃপীঠ স্পর্শ মাত্র শরীর রোমাঞ্চ হইল, পাপ নয়নে অশ্রুধারা বহিল, সেই সময়ে একবার "মা" বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিলাম, চির-সন্তপ্ত প্রাণ সুশীতল হইল।

মায়ের মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র, একজন বা অতিকষ্টে দুইজন বসিতে পারে মাত্র। মন্দিরটি একে শৈলাগ্র-কোণে সংস্থিত, তাহাতে মর্কটমণ্ডলীর বিকৃত বদনের ব্যঙ্গ বিকাশময়ী বিকট বিভীষিকা, সহজেই দর্শনার্থীগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে ভয় পায়। পদস্খলিত হইলে একেবারে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে পতিত—অধঃ পতিত ও চূর্ণিত চূর্ণায়মান হইয়া বর্ত্তমান কলেবরটি পরিত্যাগ করিতে হয়।

আসাম অঞ্চলে এই মর্কট মণ্ডলীর একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যথা—বানর দলে একজন রাজা, একজন মন্ত্রী ও পাত্র মিত্রাদি অনেক আছে। বিজনীর রাজ পরিবারের সহিত ইহাদের নাকি কি সমস্ত্র সম্বন্ধ চির দিন চলিয়া আসিতেছে। বিজনীর রাজা বা মন্ত্রী মরিলে এখানকার বানরের রাজা বা মন্ত্রী মরিবে, বিজনীর নূতন রাজা হইলে এখানেও বানরের নূতন দলপতি হইবে। যাত্রী গণ এই বানর দিগের জন্য রম্ভাদি লইয়া যান, আমরাও লইয়া গিয়াছিলাম। শুনিলাম প্রথমে রাজা ভোজন না করিলে অন্য কোন বানর ভোজন করেনা, দাতা ভক্তি ভাবে সরল অন্তঃকরণে না দিলে বানর-রাজ তাহা গ্রহণ বা ভোজন করেন না। গোয়াল পাড়ার অনেক গবর্ণমেণ্টের শিক্ষিত কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম-যে তাঁহারা একবার ডেপুটী কমিশনরের সহিত মফস্বলে গিয়াছিলেন, টোকরেশ্বরীর নিকট পৌঁছিলে, তাঁহারা দেবী দর্শনার্থ সাহেবের নিকট অবকাশ চাহিলেন। সাহেব বড় ভদ্র ও ভৃত্য-বৎসল ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অবকাশ দিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে শৈল শিখরে দেবীর স্থান নিজে দেখিতেও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সকলেই তথায় উঠিলেন। হিন্দুগণ নগ্নপদে ও কৃতস্নান হইয়া পবিত্র ভাবে উঠিয়াছিলেন; পূজান্তে তাঁহারা বানর পতিকে রম্ভাদি দিলেন, মর্কটাধীশ ধীর ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিল। সাহেবেরও বানরকে খাওয়াইতে ইচ্ছা হইল। কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, যে ইহারা দেবাংশী বানর, শুদ্ধ মনে ভক্তি ভাবে না দিলে ইহারা গ্রহণ করেনা, আবার গ্রহণ না

করিলে দাতার অমঙ্গল হয়। চর্ম্মপাদুকা ধারী সাহেব রম্ভা দিতে গেলেন, বানর রাজ অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, রম্ভা গ্রহণ করিল না, সাহেবের মনে খটকা লাগিয়া গেল, বুঝি অকল্যাণের ভয় হইল। তখন কর্ম্মচারীগণের পরামর্শে পাদুকা মোচন পূর্ব্বক হস্ত পদাদি ধুইয়া শ্রদ্ধা সহ দান করিলেন, বানরপতি তাহা সোৎসুক ভাবে গ্রহণ ও ভোজন করিল।

আমরা কিন্তু এভাব দেখিতে পাইলাম না। একজন রাজোপাধি-ধারী বানর তথায় আছে, বটে, পূজারি প্রত্যহ তাহাকে নৈবেদ্যের অগ্রভাগ দান করেন, কিন্তু দেখিলাম অন্যান্য বানর বর্গ রাজ-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া পরস্পর কাড়াকাড়ী করিয়া খায়। এই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সকলেই বলিলেন যে আজকাল বিজনী রাজ্যেও এই রূপ বিশৃঙ্খলা। তথাকার দুই রাণীতে বড় মোকদ্দমা চলিতেছে, প্রজাগণ যথারীতি কর প্রদান করেনা—রাজমর্য্যাদা রাখে না। বানরের এই গুহ্য রহস্য বুঝিতে পারিলাম না। সে অঞ্চলের লোক কিন্তু প্রোক্ত প্রবাদটিকে বড় বিশ্বাস করে। এই বানর গুলিকে ছাগরক্ত পান করিতে ও পাঁটার মুড়ী চিবাইয়া খাইতে দেখা যায়। এরূপ আমিষ ভোজী বানর কোথাও দেখা যায় না।

মাকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতা হৃদয়ে পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলাম। মায়ের নাট্য শালার শীতল ছায়ায় বসিয়া কিঞ্চিৎ মায়ের প্রসাদ ভোজন, ঝরণার শীতল জল পান, ও অনেক ক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তদনন্তর তথা হইতে ক্রোশৈক দূরবর্ত্তী বামনপাড়ায় গিয়া আহারাদি করিলাম। সেদিন তথাকার ভদ্রগণ আসিয়া আমার মুখে সৎপ্রসঙ্গালাপ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় ২।৩ ঘণ্টা ধর্ম্মার্থ বার্ত্তার আলাপ করিলাম। তৎপর দিন প্রাতে আবার গোয়ালপাড়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

ক্রমশঃ।

মহাহিন্দু-সমিতি।

বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভা হইতে প্রকাশিত "মহা হিন্দু সমিতি" স্থাপনের প্রস্তাব-পুস্তক আমরা পাইয়াছি। হিন্দু সমাজ অনেক সময়ে নিরাশ্রয়ের ন্যায় অনেক অযথা অত্যাচার সহ্য করে, কখন ২ অহিন্দু বর্গের বীভৎসতাড়নায় ভীত হইয়া চমকিত ও সঙ্কুচিত হয়। বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের মর্ম্মানভিজ্ঞ বিদেশীয় শাসন কর্ত্তৃ গণ উন্মার্গগামী অহিন্দু হিন্দু সন্তান গণের পুষ্টিপোষক হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সমাজের প্রাণে আঘাত করিতেও সময়ে২ উদ্যত হয়েন। সুতরাং শাস্ত্রানুমোদিত আত্মস্বত্ব সমর্থনার্থ হিন্দু দিগের এক্ষণে বদ্ধপরিকর হওয়া কতক পরিমাণে অবশ্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য "মহা হিন্দু সমিতির" সংগঠন ও অভ্যুদয় আমাদের প্রার্থনীয়। কিন্তু পুস্তকের পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে।

* * * "এমত স্থলে হিন্দু-সম্মিলনে বা মহাহিন্দু-সমিতি স্থাপনে কংগ্রেস ক্ষেত্রে অনৈক্য-বীজবপনের সম্ভাবনা দেখি না; বরঞ্চ এখন যে সকল হিন্দু কংগ্রেসকে ধর্ম্মবিরোধী ভাবেন, মহাহিন্দু-সমিতি স্থাপনের পর তাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিয়া কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন।"

এই টুকু পাঠে আমরা একটু আশঙ্কিত হইলাম। কংগ্রেস যে নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তাহা উচ্ছৃঙ্খলতাভিমুখিনী, এই জন্য হিন্দু সমাজের উহাতে ভালরূপ সহানুভূতি নাই; আর কংগ্রেস এই সুরে চলিলে হিন্দু সমাজ কোন কালেই উহার সহযোগিতা করিতে পারিবেন না। তবে কেমন করিয়া "তাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিয়া কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন?" মহাহিন্দু সমিতি কি কংগ্রেসের প্রতিচ্ছায়া? ভগবান্ তাহা না করুন। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে সংগঠিত ও শাস্ত্রানুকূল ব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়া চাই। ইহার সহিত কংগ্রেস আদির কোন সংস্রব থাকিলে হিন্দু সমাজের কল্যাণের আশা নাই। যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্র মানিয়া চলেন, তাঁহারাই ইহার সেবক ও অভিভাবক হইলে আমরা সুখী হইব।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ স্থানীয় ধর্ম্মসভা, সুনীতি-সভা, বাল্যাশ্রম আদি স্বধর্ম্ম সংরক্ষণী সভা সমূহের বিদিতার্থ নিম্নে একখানি পত্র প্রকাশ করিলাম। আশা করি সভাসমূহ নিজ ২ মন্তব্য শিমলা শৈলে লিখিয়া পাঠাইবেন।

সিমলা শৈল
সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা
ভাদ্র ১২৯৭ সাল।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

মহাশয়!

সিমলা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিকা সভায় সভ্য সম্প্রদায়ের আন্তরিক ইচ্ছা

যে বঙ্গদেশের সকল হিন্দু ধর্ম্ম সভার ঘনিষ্ঠতা ও একতা হয়, কারণ একতা বিহনে দেশের ধর্ম্মের বড়ই দুরবস্থা হইয়াছে। আজ কাল যে প্রকার ধর্ম্মের অনুকূল স্রোত বহিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে যদ্যপি সকল ধর্ম্ম সভা গুলি একত্র হইয়া কোন কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপায় বঙ্গদেশে এখন অনেক গুলি ধর্ম্মসভা বিদ্যমান। কিন্তু দেখিতে গেলে সকল সভাই এক প্রকার নির্জ্জীব,; কারণ কোনটীর দ্বারা বিশেষ কোন কর্ম্ম হইতেছে না। অনুমান হয় সকল সভা গুলি একত্র না হইলে, অর্থাৎ সকলেই সমাজের ও ধর্ম্মের উন্নতির জন্য একমত হইয়া কি করিলে সম্যক্ উপকার দর্শিতে পারে ইত্যাদি উপায় অবলম্বন না করিলে হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি অসম্ভব। সুতরাং সকল সভারই একমত অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করা প্রার্থনীয়, ও তাহা হইলে যে কথঞ্চিৎ উপকার হইবার সম্ভাবনা তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। অধুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে এক ধর্ম্মসভায় পঠিত বা কথিত বক্তৃতা সেই সভা ব্যতীত আর কোন সভার জানিবার সম্ভাবনা নাই। যদ্যপি ঐ ধর্ম্ম-বক্তৃতা গুলি সাধ্যমত সকল ধর্ম্ম সভাতেই প্রেরিত হয় তাহা হইলে ইহার দ্বারা সকলেরই উপকার হইতে পারে। যদি কোন ধর্ম্ম-সভা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ২।১ জন শিক্ষিত আচার্য্য সকল স্থানে প্রেরণ করিতে বা সভার কার্য্যের জন্য রখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অর্থাভাবে বা নানা কারণ বশতঃ উক্ত ইচ্ছা কার্য্যে পারিণত করিতে পারেন না। কিন্তু যদ্যপি সকল গুলিতেই ঐক্য স্থাপিত হয় ও পরস্পরের সহানুভূতি থাকে এবং সকলেরই ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা থাকে তাহা হইলে উক্তরূপ সামান্য বিষয় অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। উক্ত কারণ বশতঃ এই সভার একান্ত ইচ্ছা যে উপরোক্ত প্রস্তাব সকল সভার সভ্যগণ দ্বারা বিশেষ রূপে সমালোচিত হইয়া নিজ ২ মতামতের সহিত অবস্থ সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিকা সভায় প্রেরিত হইলে সভা বিশেষ রূপে অনুগৃহীত হইবে।

শ্রী আদিত্য প্রকাশ শর্ম্মা
সম্পাদক।

ধর্ম্মোৎসব।

বিগত ২২এ হইতে ২৬এ শ্রাবণ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ৫ দিন ধুবড়ী হিন্দু ধর্ম্ম সভার ৩য় বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যদেবেশ্বর তর্করত্ন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা 'বেদ অভ্রান্ত," "সংস্কৃত শাস্ত্র." "উপাস্য ও উপাসক," "আর্য্য ব্রহ্মজ্ঞান" এবং "ভক্তি" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃগণ অতিশয় পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইয়াছেন। শ্রীমান্ সতীশ চন্দ্র মিত্র ও ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন নগর সংকীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন আদি আরও অন্যান্য পবিত্র অনুষ্ঠানে উৎসব অতিশয় সুখাবহ হইয়াছিল।

অনুগত
শ্রী হরলাল দাস গুপ্ত
শ্রী রাজীব লোচন সেন গুপ্ত।

নিমন্ত্রণ।

ধর্ম্ম প্রচারকের অনুগ্রাহক গ্রাহক ও পাঠক
মহোদয় গণ সমীপেষু।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

শ্রীমাত্রেন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ।

কাশী যোগাশ্রম।

(হাউজ কটরা, তাং ১০ই আশ্বিন, শঃ ১৮১২।)

সচ্চিদানন্দ নিকেতনেষু।

আগামী ৫ই কার্ত্তিক, মহাষ্টমী তিথিতে অত্র কাশীধামে নব নির্ম্মিত যোগাশ্রমে "দুগ্ধান্নপূর্ণা বর কাঞ্চন দর্ব্বীহস্তা" মাতা অন্নপূর্ণার পাষাণ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই শুভ দিনে শুভ কার্য্যোপলক্ষে শ্রীমন্মহাশয় গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুভাগমন করিয়া মা অন্নপূর্ণার পূর্ণাবির্ভাব দর্শন ও আমার তৃষিত চিত্তের তৃপ্তি সাধন করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

দীনাতিদীন
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৩শ ভাগ ৭ম সংখ্যা	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	শকাব্দা ১৮১২ কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষোড়শর্ত্তুর্নিশাঃ স্ত্রীণাং তস্মিন্ যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বণ্যাদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

ষোড়শরাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির ঋতুকাল বলিয়া উক্ত হয়। এই ঋতুকালে প্রতি যুগ্ম রাত্রিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ রাত্রি, অষ্টম রাত্রি দশম রাত্রি আদিতে স্ত্রীগমন করিবে। পর্ব্বকাল অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, সংক্রান্তি অমাবাস্যা পূর্ণিমা এবং ঋতুর প্রথম চারিদিন স্ত্রীগমন করিবে না। যিনি এই নিয়ম প্রতিপালন করেন তিনি ব্রহ্মচারী।

এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্ষামাং মঘাং মূলাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
সুস্থ ইন্দৌ সকৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ সুতম্॥

মঘা এবং মূলা নক্ষত্র বর্জ্জন করিয়া শুভ চন্দ্র বিচার পূর্ব্বক যিনি ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীতে একবার উপগত হন, তাঁহার শুভ লক্ষণ বিশিষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যথাকামং বিশেদ্বাপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্।
স্বদারনিরতশ্চৈব স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা যতঃ স্মৃতাঃ॥

অথবা স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষার্থ যখনই স্ত্রীর ইচ্ছা হইবে, তখনই স্বদারনিরত ব্যক্তি স্ত্রীতে উপগত হইবে। যে হেতু স্ত্রীর পবিত্রতা সর্ব্বথা রক্ষণীয়।

ভর্ত্তৃ ভ্রাতৃ পিতৃ জ্ঞাতি শ্বশ্রূশ্বশুর দেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥

ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি কুটুম্ব, শ্বশুর শাশুড়ি এবং দেবর ইহাঁরা ভূষণ, আচ্ছাদন এবং ভোজন দ্বারা স্ত্রীর সর্ব্বথা পরিচর্য্যা করিবেন।

সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাৎ শ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা॥

গৃহের জিনিস পত্র যথাস্থানে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা, কার্য্যে নিপুণতা মিতব্যয়িতা, সর্ব্বদা হর্ষোৎফুল্লভাব ধারণ, শ্বশুর শাশুড়ীর পাদবন্দন এবং স্বামিসেবা এই গুলি স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম।

ক্রীড়াং শরীর সংস্কারং সমাজোৎসব দর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥

যাঁহার স্বামী বিদেশে বাস করিতেছেন, সেই স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর সংস্কার, সামাজিক উৎসব দর্শন, সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস এবং পরগৃহে গমন এই সমস্ত ত্যাগ করিবেন।

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং ন স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ॥

কন্যাবস্থায় স্ত্রীকে পিতা রক্ষা করিবেন। বিবাহিতা-

বস্থায় স্বামী রক্ষা করিবেন। বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করিবেন। এ সমস্তের অভাব হইলে জ্ঞাতিগণ স্ত্রীকে রক্ষা করিবেন। স্ত্রীজাতিকে কখনও স্বাধীনতা দিবেনা।

ক্রমশঃ।

ব্যাকরণের দার্শনিক তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শব্দব্রহ্ম ও সৃষ্টিতত্ত্ব]

সারা দিন সাংসারিক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট হানি মূলক প্রয়োজন সাধন জন্য, অবিশ্রাম নানাবিধ চেষ্টা করিয়া জীবজগৎ যখন প্রাকৃতিক নিয়মে, নিতান্ত ক্লান্ত ও হীনবল হইয়া পড়ে, যখন দেহ ইহার অবসন্ন, ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরুৎসাহ, প্রাণ ক্ষীণ এবং অন্তঃকরণ শ্রমবিমুখ হইয়া উঠে, তখনই ইহা সর্ব্বসন্তাপনাশিনী পরম স্নেহময়ী, নিদ্রা দেবীর সুকোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া, শ্রান্তিদূর ও বিশ্রাম সুখ অনুভব করিবার জন্য ধাবমান হয়। অনন্যাশ্রয় বিপন্নের এক মাত্র আশ্রয়, কাতর প্রাণের এক মাত্র বন্ধু, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের স্নেহময়ী জননী, যাতনায় অস্থির পীড়িতের স্থৈর্য্যবিধাত্রী ভাগবতী শক্তি, শান্তিময়ী নিদ্রা দেবীও অমনি, সায়ং কালে খেলা ধুলা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর তনয়কে জননী যেমন তাহার ধুলামাখা মলিন গাত্র ধুইয়া মুছিয়া, খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া কোলে করিয়া লন, সেই রূপ শরণাগত ক্লান্ত জীবগণের সকল দুঃখ বিস্মৃতির গভীর গর্ভে বিলীন করিয়া, সকল শ্রম অপনোদন করিয়া সর্ব্ব সন্তাপ, কমনীয় মোহন করে সংবৃত করিয়া নিজের সুকুমার অঙ্কে আশ্রয় দেন, নিজের শান্তিনিকেতনে শোয়াইয়া রাখেন। নিদ্রা দেবীর নিরুপদ্রব শান্তি নিকেতনে শরণাগত ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। ইন্দ্রিয় সকলের দুর্নিবার বেগ, অন্তঃকরণের অনিরুদ্ধ ক্ষিপ্রগতি, স্মৃতির তুষাগ্নি, জীবের অনাদি কালের নিত্য সহচর জীবের জীবত্বপঞ্জর, আমিত্ব ভাবের সম্মোহন বাণ এ স্থানে কেহই প্রবেশ করিতে পারেন না, কাহারই শক্তি এ খানে দন্তস্ফুট করিতে সমর্থ নয়। রজনী প্রভাত হইলে যাহার প্রাণ দণ্ড হইবে, তারানাথের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে যাহার প্রিয়তম জীবন তারা এজীবনের মত মুদিত হইবে, সূর্য্যদেবের পূর্ব্ব দিকে প্রকাশের সহিত যে হতভাগ্যকে পরম ভক্তিভাজন, ইহ সংসারের মূর্ত্তিমতী ঈশ্বর ঈশ্বরী পিতা মাতার অচ্ছেদ্য স্নেহপাশ ছেদন করিয়া, সন্তপ্তপ্রাণ-স্নিগ্ধকর কমনীয় ক্রোড় ত্যাগ করিয়া কোথায় কোন্ অনিশ্চিত অপরিচিত প্রদেশে গমন করিতে হইবে,আহা! নিশানাথের বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যাহাকে, প্রাণ প্রিয়তম পুত্র কন্যার দুর্ভেদ্য মমত্বাবরণ ভেদ করিয়া আত্মীয় বন্ধুর ভালবাসার দৃঢ় বন্ধন কাটিয়া এ জগৎ হইতে এ জীবনের মত বিদায় লইতে হইবে, মৃত্যুর হৃদয়প্রকম্পক ভীষণ মূর্ত্তি অনুক্ষণ যাহাকে হতচেতন করিতেছিল, শোকের মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ শর যাহার ভগ্ন হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল, শত্রুগণের ঘৃণার হাঁসি যাহার হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিতেছিল, আমার অভাবে আমার প্রাণপুত্তলি শিশুরা উদরান্নের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইবে, আমার জনক জননী শোকের তীব্র যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া হয়ত প্রাণ ত্যাগ করিবেন এইরূপ এবং অন্য নানাবিধ দুর্বির্ষহ দুশ্চিন্তানল, যাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল, সর্ব্বসন্তাপ নাশিনীর কোলে শুইয়া এমন লোকও নিজের এ শোচনীয় অবস্থা ভুলিয়া গিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। ইহার প্রভাবে অমিতবল বিক্রমশালী বুভুক্ষু মৃগেন্দ্রের কাছ হইতেও জীব জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ ইহাঁর শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিতে পারিলে জীবের সকল দুঃখের শান্তি হয়। তাই সকলেই দিবারাত্রির মধ্যে একবার ইহাঁর কোলে আশ্রয় লইবেই লইবে। নিদ্রাদেবীর কেবল যে এই দুঃখ নিবারণ গুণই এক

মাত্র প্রশংসনীয় গুণ, কেবল এই গুণের জন্যই যে ইনি, সকলের আদরের সামগ্রী তাহা নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে যাঁহাদের নিদ্রা নাই, নিদ্রাদেবীর শরণ লওয়ার আবশ্যকতা যাঁহাদের হয় না, যাঁহারা নিজের শান্তিময় নিকেতনে সদা বাস করেন, শান্তিই যাঁহাদের আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই সদা শান্ত, নিয়ত জাগ্রত ভগবৎ প্রেমানন্দে বিভোর সুখস্বরূপ মহর্ষিরা কেন ইহাঁকে একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ বলিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটি প্রধান সাধন বলিয়া আদর করিবেন? ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন পরম দয়ালু মহর্ষিরা জীবের দুঃখ কিসে নিবারণ হইবে, কি করিলে কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীব কৃতকৃত্য হইবে, অপার অনন্ত বিমল ব্রহ্মানন্দে জীব ডুবিয়া থাকিবে তাহাই চিন্তা করিতে বসিয়া সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া যখন সমাধিস্থ হইতেন, সকল চিন্তার স্রোত যখন এককেন্দ্র হইয়া সেই দিকে ধাবিত হইত, তখনই সেই নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির সেই প্রশান্ত পবিত্র হৃদয়দর্পণে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ শ্রুতি রূপ ধারণ করিয়া উদিত হইতেন। চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি অমনি পশ্যন্ত্যাদি রূপে প্রকাশিত হইতেন। মহর্ষিরাও বুঝিতেন যে পথ অবলম্বন করিয়া, যাঁহার আশ্রয় লইয়া আমরা অবলীলাক্রমে, অবিদ্যার দুরতিক্রমণীয় আক্রমণকে তুচ্ছ করিয়া এই শান্তিনিকেতনে আসিয়াছি, * সে পথ অবলম্বন করা ভিন্ন, সেই স্নেহময়ী ভগবতী শ্রুতি দেবীর পদাশ্রয় করা ব্যতিরেকে ত্রিতাপতপ্ত জীবকে, এ নিত্য সুখে সুখী করিবার কৈবল্য সাগরে জীবকে নিমগ্ন করিবার অন্য উপায় নাই। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিয়া, সমাধি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া শ্রুতিবাণী গাহিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেন,

"আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ অবিদ্যার দুরতিক্রমণীয় রাজ্য অতিক্রমণ করিয়া, শাশ্বতী শান্তি সরোবরে মগ্ন হইতে হইলে, আত্মাকে দেখিতে হইবে, সচ্চিদানন্দের দর্শন লাভ করিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না, অমৃত পান না করিলে অমর হওয়া যাইবে না। আত্ম-দর্শন লাভ করিতে না পারিলে জীবের দুঃখ দূর হইবে না, সত্য, কিন্তু অবিদ্যার দুর্ভেদ্য লৌহ-কারাগারে বদ্ধ জীব, যাঁহাকে কখন দেখার কথা দূরে থাকুক যিনি আছেন তাহা জানে কি না সন্দেহ, তাঁহাকে দেখিতে হইবে, এ দুঃখসঙ্কুল সংসার পথ অবরোধ করিতে হইলে তাঁহার দর্শন লাভ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এ কথা হয়ত যাঁহাদের মনেও কখন উদয় হয় নাই তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবে কি রূপে? যে, আত্মার স্বরূপ, কি তটস্থ, কোন লক্ষণই অবগত নহে সে তাঁহাকে চিনিবে কি রূপে? কোন অজ্ঞাত পদার্থকে জানিতে হইলে কোন অপরিচিত পদার্থের পরিচয় লইতে হইলে লোকে অগ্রে, যিনি সে পদার্থের তত্ত্ব অবগত আছেন, চিনিবার লক্ষণাদি যিনি বলিয়া দিতে পারেন তাঁহার নিকট হইতে, অজ্ঞাত দ্রষ্টব্য পদার্থের লক্ষণাদি জানিয়া লয়। অপরিচিত পদার্থের পরিচয় লওয়ার জন্য এই উপায়ই সরল উপায়। এই উপায়ই সকলে অবলম্বন করিয়া থাকে। তাই তাঁহারা, আত্মাকে দেখিতে হইবে তদ্ভিন্ন এ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই এই টুকু বলিয়াই নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিতে পারেন নাই। নিখিল জ্ঞান কল্প তরু শ্রুতিতে আত্মদর্শন লাভের যে সকল উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, আত্মাকে চিনিবার যে সকল লক্ষণাদি নির্ব্বাচিত হইয়াছে, আত্মহারা বিপন্ন জীবকে, কারুণিক মহর্ষিরা তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন আমি আত্মার যে সকল লক্ষণ বলিয়া দিতেছি, সেই সকল লক্ষণ

* "সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" মুণ্ডকোপনিষৎ।

মিলাইয়া যাঁহাকে দেখিবে মদুক্ত লক্ষণ যুক্ত, আমি তাঁহার যে সকল লক্ষণ বলিয়া দিতেছি যাঁহাতে দেখিবে তাহার পূর্ণ বিকাশ, দেশ কালাদি দ্বারাও মৎকথিত লক্ষণ যাঁহাতে বিলুপ্ত হয় না অনুভব করিবে, তাঁহারই চরণ তলে লুটাইয়া পড়িও তাঁহারই কাছে আপনাকে বিসর্জ্জন দিও, তবেই শাশ্বত শান্তিতে তবেই নিত্য সুখে অবস্থান করিতে পারিবে। এ দুষ্পার দুঃখ পারাবার পার করিবার তিনিই এক মাত্র কর্ণধার। শ্রুতি আত্মার লক্ষণ [স্বরূপ লক্ষণ] বলিয়া দিলেন —

" সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দম্ ব্রহ্ম "

যিনি সত্য, যিনি জ্ঞান, যিনি অনন্ত এবং যিনি অপরিমিত আনন্দসমুদ্র তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই তোমার দ্রষ্টব্য তিনিই তোমার ত্রাণকর্ত্তা আত্মা। এই লক্ষণ চতুষ্টয় যাঁহাতে লক্ষিত হইবে, বিশেষ বিচার করিয়া অনেক চিন্তা করিয়া যে বস্তুতে এই সকল লক্ষণের পূর্ণ এই সকল লক্ষণের অব্যভিচারী ভাব দৃষ্ট হইবে তিনিই।

করুণানিধি শ্রুতিমুখে নিজের লক্ষণ, তাঁহাকে চিনিবার চিহ্ন মাত্র বলিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। ভূগোল তত্ত্ব গ্রন্থ হাতে দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সুকুমারমতি স্বল্পবুদ্ধি বালক যাহাতে অজ্ঞাত, অপরিচিত, মহাদেশ, দেশ, পর্ব্বত, নগর, দ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ, নদনদী সাগর উপসাগর ও মহাসাগরাদির স্বরূপ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, ইহাদের সংস্থান ও আকৃতি অল্প আয়াসে হৃদয়ে যাহাতে ধারণ করিতে সক্ষম হয় তাহারও অতিসুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বালকের হাতে, তিনি ভূগোলের মান চিত্র পরিস্ফুট রূপে আঁকিয়া সমর্পণ করিয়াছেন। বালক ভূগোল পড়িবে আর মানচিত্রের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিবে, বালকের ভূগোলতত্ত্ব চিত্তে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়া যাইবে। বালক ভারতবর্ষের একটি নগন্য দেশান্তর্বর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামস্থিত, একখানি কুটীরের চার হাত পরিমিত স্থানে উপবেশন করিয়া সসাগরা পৃথিবীর স্বরূপ দর্শন করিবে আর আনন্দে পুলকিত হইবে, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইবে। স্বল্পবিষয়মতি তাঁহার অজ্ঞান সন্তানেরা যাহাতে শ্রুতিকথিত আত্মলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, অন্ধ সন্তানেরা যাহাতে তাঁহাকে ধরিতে পারে, তাই স্বহস্তে নিজের প্রতিকৃতি আঁকিয়া, আত্মছবি প্রতিফলিত করিয়া, পুত্রবৎসল, পরম পিতা পরম গুরু বিশ্বপতি, আমাদের সম্মুখে এই বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। এ বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহারই প্রতিকৃতি, ইহা সেই সচ্চিদানন্দেরই মানচিত্র। আর পরমারাধ্যা ভগবতী শ্রুতিদেবী, তাঁহার মুখবিনিঃসৃত অমল অভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যা। অবোধ আমরা শ্রুতি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিশ্বপতির স্বরূপ জানিব, আর সম্মুখ প্রসারিত তাঁহার মানচিত্রের সহিত তাঁহার রূপ মিলাইব। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষকে—এই বহু লোকের আবাস ভূমি পুণ্যভূমি ভারতকে চিত্রকার প্রাদেশ পরিমিত স্থানের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া, বালকের মনে যেমন এ বিশ্বাস হয় না যে ভারতবর্ষ এই প্রাদেশ প্রমাণ, সেইরূপ বিশ্বনাথের সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দময় পরমাত্মার, এই মানচিত্র দেখিয়া তাঁহাকে ঠিক এই রূপ মনে করা, তাঁহাকে এই প্রতিকৃতির মানে পরিমিত করা সর্ব্বথা অসঙ্গত। ভূগোল বিদ্যা পরিচয়ের উপকারক হইবে এই নিমিত্তই মান চিত্র চিত্রিত হইয়া থাকে, দেশ পর্ব্বতাদির ইয়ত্তা বা সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য নহে। মানচিত্রে অঙ্কিত ইংলণ্ড দেখিয়া যিনি ইংলণ্ড দেশের ইয়ত্তা নির্দ্ধারণ করিতে বা তদ্দেশীয় লোক সকলের আকৃতি, প্রকৃতি, আচার ব্যবহার জানিতে চান, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। আমরা এক্ষণে শ্রুতিকথিত আত্মলক্ষণ সকল, আত্মপ্রতিকৃতি এই বিশ্বপটে কতদূর দেখিতে পাই তাহার চেষ্টা করিব। শ্রুতি

বলিয়া দিয়াছেন যাহা সত্য অর্থাৎ অবিনাশী, দেশ কালাদি বিনষ্ট হইলেও যাহা অবিনষ্ট থাকিবেন, যে তত্ত্ব স্থির থাকিবেন যাঁহার কখন অভাব হইবে না, তিনিই দ্রষ্টব্য, এমনি লক্ষণ যুক্ত পুরুষকে অন্বেষণ কর। জীবশ্রেষ্ঠ মানব, শ্রুতির উপদেশানুসারে সম্মুখ-প্রসারিত আত্মমানচিত্রে প্রত্যুক্ত লক্ষণাক্রান্ত বস্তু অন্বেষণ করিতে গিয়া, প্রথমে, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, নিদ্রা ইত্যাদিতে আত্ম-পরিচায়ক লক্ষণ চতুষ্টয়ের কোন কোন লক্ষণের কিছু কিছু বিকাশ দেখিয়া ঐ সূর্য্যাদিকেই আত্মা বলিয়া স্থির করিল। যাহা সত্য, অবিনাশী, তিনি আত্মা। শৈশব-কাল হইতে মানব দেখিয়া আসিতেছে, প্রতিদিন অবাধে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশ প্রকাশিত করিয়া জগৎকে গভীর ধ্বান্তপাশ হইতে মুক্ত করিয়া, জগৎকে প্রাণন-শক্তিতে শক্তিমান্ করিয়া, পদ্মিনীর ম্লান মুখ হাঁসাইয়া, পীড়িতের ব্যথিত হৃদয় শান্ত করিয়া উদয় হইয়া থাকেন। সুকুমার শিশু নিজে যাঁহাকে প্রতিদিন দেখিতেছে, বৃদ্ধ পিতা মাতা, অতিবৃদ্ধ পিতামহ পিতামহীর মুখেও তাঁহারই কথা শুনিতেছে, দিবাকর তাঁহাদেরও শৈশবা-বস্থার হৃদয়কে এই রূপে প্রীত—এই রূপে বিমোহিত করিয়াছিলেন জানিতেছে। আবার পুস্তক পড়িয়া,দেখে তিনি আরও প্রাচীন কাল হইতে এই রূপে প্রত্যহ উদয় হইয়া জগৎকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ সূর্য্যদেব যে কত দিনের, তাহার কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া, জলাশয় ভূমিতে, ভূমি নদীরূপে, নদী পর্ব্ব-তাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সূর্য্য যেমন তেমনই রহিয়াছেন, ইহাঁর কোন রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে না অনুভব করিয়া বালকহৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিল, ইনিই সত্য ইনিই অবিনাশী। সুতরাং ইনিই আমাদের আত্মা। ইহাঁকে ধরিলেই, ইহাঁর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেই আমাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, আমরা কৃত-কৃত্য হইব, এ জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার কারাগার হইতে বিমুক্ত হইতে পারিব, আমরা আমাদের প্রকৃত "আমিকে" দেখিয়া ধন্য হইব। অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, প্রাপ্তব্যকে পাইয়াছি, আধি ব্যাধিময় ভবসাগর পার হইবার তরণি মিলিয়াছে। সুতরাং বালকের আহ্লাদের আর সীমা নাই, বালক আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রুতি দেবীর চরণে নিপতিত হইয়া গদ্‌গদস্বরে বলিল, মা! তাঁহাকে দেখিয়াছি, তুমি যে লক্ষণ বলিয়া দিয়াছিলে, ঠিক সেই লক্ষণাক্রান্ত বস্তু মা! দেখিতে পাইয়াছি। স্নেহময়ী জননী হাঁসিতে২ অল্পমতি তনয়কে কোলে করিয়া বলিলেন, বৎস যাঁহাকে দেখিয়াছ, যাঁহাকে দেখিয়া তুমি তোমার হৃদয়ের হৃদয় বলিয়া, তোমার এক মাত্র দ্রষ্টব্য পদার্থ বলিয়া ঠিক করিয়াছ, তাঁহাতে আমি যে সকল লক্ষণ তোমাকে বলিয়া দিয়াছি তাহার সকল গুলিই বিদ্যমান আছে দেখিলে কি? বালক নীরবে ভাবিতে লাগিল। জননী গাহিলেন—

> ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
> ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চ নৈনং।
> হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনম্
> এবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

বৎস! যে আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য তোমার কোমল হৃদয়ের এত পিপাসা হইয়াছে, যাঁহাকে পাই-বার জন্য তোমার প্রাণ এমন ব্যাকুল হইয়াছে, তিনি যে অরূপ, তিনিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রদেশে থাকেন না। তিনি ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থ নন, কেহই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, তিনি অখণ্ড সুখ স্বরূপ। শমদমাদি সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই ইহাঁকে দেখিতে পান। তাঁহাদেরই সংশয়রহিত নির্ম্মল হৃদয়েই আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন। সেই মহাত্মারাই আত্মাকে পাইয়া অমৃত হন। তাঁহারাই সংসার-পাশ ছেদন করিয়া মুক্তির

সন্তসন্তাপ স্নিগ্ধকর বিমল শান্তিনিকেতনে গমন করিয়া থাকেন। অতএব 'তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহেন জানিবে। নাম রূপ বিশিষ্ট পদার্থ সকল তাঁহারই বিকার, তিনি নাম রূপাদির অতীত জিনিস। তুমি যাঁহাকে দেখিয়া আত্মা মনে করিয়াছ, ইহাতেও ত মদুক্ত সকল লক্ষণ গুলিরই আংশিক সত্তা লক্ষিত হয় না। ইহাতে জ্ঞান কই, ইহাতে আনন্দ কই? ইহা অনন্ত কেমন করিয়া? বালক মা'র কথা শুনিয়া আবার আত্মার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। চন্দ্রদেব এবার তাহার অন্তঃকরণে উদয় হইলেন। চন্দ্রকে দেখিয়া বালকের হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইল। বালক ভাবিয়া দেখিল, ইহাঁর রূপ দেখিয়া আমার যে অত্যন্ত আহ্লাদ হইতেছে এবং লোকে অনাদি কাল হইতেই চন্দ্রের কমনীয় রূপের প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছে, সুতরাং ইনি সত্যও বটেন এবং ইনি যে আনন্দময় তাহা ত নিজেই অনুভব করিতেছি, তবে ইনিই আমার আত্মা। বালক এবার আর মা'র কাছে না গিয়া, তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিল, মনে মনে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বালকের মনে পড়িল মার কথা "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" বালকের স্মরণ হইল "সত্যং জ্ঞানং" বালক অমনি চন্দ্রকে ছাড়িয়া দিল। চন্দ্রের ক্ষয় দেখিতে পাইল, অমাবস্যার কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এই রূপে অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত বাহ্য পদার্থ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া বালক হতাশ ভগ্ন হৃদয়ে নিজের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে খুঁজিতে লাগিল। বালককে প্রলোভিত করিবার জন্য দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সকলেই, আমিই তোমার অভীষ্ট পদার্থ, আমাকে আশ্রয় কর, আমার সেবা কর তাহা হইলেই কৃতার্থ হইবে প্রত্যেকেই এই রূপ আশ্বাস দিতে আরম্ভ করিল। মাতৃভক্ত বালক কাহারও কথা শুনিল না। মাতার কথা স্মরণ করিয়া দেহাদিতে আত্ম-লক্ষণ আছে কি না তাহাই দেখিতে লাগিল। কিন্তু কাহাতেও শ্রুতিকথিত লক্ষণ সমূহের সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখিতে পাইল না দেহেন্দ্রিয় সকল যে বিনশ্বর তাহাত প্রতিক্ষণই দেখিতে পাইতেছি। আমার কত আত্মীয় বন্ধু আমাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানও উৎপত্তি বিনাশ রহিত নয়, বালক এই বার একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। সর্ব্ব-সন্তাপ নাশিনী শান্তিময়ী নিদ্রা দেবী অমনি বালকের সকল চিন্তা দূর করিয়া কোলে করিয়া লইলেন। নিদ্রা যাইতে২ বালকের অন্তঃকরণে নাকি চিন্তানল জ্বলিতেছে, তাই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়া শিশু ভাবিতে লাগিল, ইনি কে? এই যাঁহার কোমল কোলে শয়ন করিয়া আমি সকল চিন্তা ভুলিয়া গিয়া ছিলাম ইনি কে? ইহাঁকে ত দেখিতে পাইতেছি না, ইনিত অরূপ বটেন। তবে ইনিই কি আমার আত্মা, আমি কি ইহাঁরই অন্বেষণ করিতেছিলাম, আমার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাই কি তিনি নিজে দেখা দিলেন। মাও বলিয়া দিয়াছিলেন তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ। বালক ভাবিতে২ নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে আবার ঢুলিয়া পড়িল, নিদ্রা দেবী বালককে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলেন। কিছু কাল পরে সময় বুঝিয়া বালককে কোল হইতে নামাইয়া চলিয়া গেলেন। সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী অন্তর্হিতা হইবা মাত্রই বালক জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিয়া দেখিল যাঁহার কোলে আশ্রয় লইয়া সমস্ত চিন্তা ভুলিয়াছিল, যাঁহার কৃপাতে পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা ঘৃণা, আধি, ব্যাধি, অধিক কি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল, যাঁহাকে পাইয়া, বালক তাহার বহু দিনের জন্ম জন্মান্তরের অম্বিষ্ট, তাহার এক মাত্র অভীপ্সিত পদার্থকে পাইয়াছে, মনে করিয়াছিল, যাঁহার কোমল অঙ্কে শয়ন করিয়া তাহার কত দিনের অপূর্ণ আশা পূর্ণ হইল, হৃদয়ে হৃদয় আসিল, প্রাণ প্রাণ পাইল, এক কথায় তাহার আমিকে— অবিদ্যার দুরপনেয় মোহ তিরস্করিণী দ্বারা আচ্ছাদিত

"আমিকে" দেখিতে পাইল বলিয়া হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না তিনি হঠাৎ অন্তর্হিতা হইলেন, ঘোর তমসাচ্ছন্ন গভীর রজনীতে কান্তারপতিত পথিকের অনতিদূরবর্ত্তী, প্রতীয়মান দীপ, দীপ্ত লোলরসনা বলিয়া স্থির হইল, পিপাসাক্ষাম কণ্ঠ, মরীচিকা বিপ্রলব্ধ মুমূর্ষু শেষে জানিতে পারিল, ইহা জল নয়, ইহা জীবন-সংহারিণী মায়াবিনী মরীচিকা। এবার বালক হতাশ হইয়া মার কাছে গিয়া মাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। স্নেহময়ী জননী সন্তানের হৃদয়ে ভগ্ন হৃদয়ের ধ্বনি শুনিয়া অবসাদের চিহ্ন দেখিয়া, কোমল করে তাহার বদন চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন বৎস! তোমার শ্রম একেবারে অনর্থক হয় নাই, তোমার অনুমান একেবারে ভ্রান্ত নহে। তুমি যাঁহাদিগকে আত্মা বলিয়া ধরিয়াছিলে তাঁহারাও যে আত্মা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি এ সংসার তাঁহারই ছায়া। তুমি এ সংসারে যাঁহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করিবে, তিনিই আত্মা। ফলতঃ আত্মব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই। তবে তুমি সূর্য্য চন্দ্রাদিকে আত্মা বলিয়া স্থির করিলেও আমি যে তোমাকে, আবার আত্মার অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলাম তাহার বিশেষ কারণ আছে। মনো-যোগ দিয়া শ্রবণ কর, বুঝাইয়া দিতেছি, কেন আমি তোমার নির্দ্দিষ্ট সূর্য্যাদিকে আত্মা বলিয়া তখন স্বীকার করি নাই। ইহা ত আমারই কথা।

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ, সজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টি র্ধৃতি র্মতি র্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসু কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২ ॥ এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতীংষীত্যেতানীমানিচ ক্ষুদ্র মিশ্রানীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি, চাণ্ডজানিচ জারুজানিচ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

ঐতরেয়ারণ্যক।

এদোষ কার?

জগজ্জননি! জানি বটে, আমি সংসারের কীট, ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া রহিয়াছি। জানি বটে, আমার পাপের তরণি বিষয় সাগরে ডুবু ডুবু হইয়া পড়িয়াছে, তুমি এখন আমার অনেক দূরে অবস্থান করিতেছ। তোমার নিকটে আমার ন্যায় ক্ষীণকণ্ঠ পাপী তাপীর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আশা অতি দুরাশা। কিন্তু ভোলা মন তাহা বুঝে না। বালক কি বুঝে, চাঁদ কোথায়, আর সে কোথায়। দুগ্ধপোষ্য অজ্ঞান বালক চাঁদের সহিত কথা কহিতে চায়, তাই সে অঙ্গুলি সঙ্কেত পূর্ব্বক চাঁদ আয় আয় বলিয়া ডাকে। আমারও আজ ঠিক সেইরূপ দশা উপস্থিত, তাই আজ তোমায় দুই চার কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। প্রথম কথা এই, এদোষ কার? বড় কষ্টে পড়িয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া, পাপে তাপে সংসার যাতনায় দগ্ধহৃদয় হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটী করিয়া অনেক দিন অনেক বয়োবৃদ্ধের নিকটে, অনেক শাস্ত্রজ্ঞের নিকটে, অনেক শাস্ত্রের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা যাহা বলেন, অবোধ মন তাহাতে প্রবোধ মানিতে চায় না। তাই অনন্যগতিক হইয়া আজ তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এদোষ কার। মহেশ্বরি! আজ বুঝাইয়া দাও এ দোষ তোমার কি আমার।

এই যে অনন্ত কাল কলুর বলদের ন্যায় ঘুরাই-তেছ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি যোনিতে লক্ষ ২ বার পরিভ্রমণ করাইতেছ, রোগ শোক মোহ তাপ বিয়োগাদি দ্বারা নিরন্তর অন্তর্দগ্ধ করিতেছ, এ দোষ কি আমার, না তোমার। এই যে শত ২ বার কঠোর জঠরযাতনা ও মৃত্যুযাতনা উপভোগ করাইতেছ, স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া পরদেশে পরের স্নেহে ডুবাইয়া রাখিয়াছ, কাঞ্চনরাশি কাড়িয়া লইয়া কাচের মালায়

সন্তানের মন ভুলাইতেছ. এদোষ কি আমার না তোমার। জীব নিজের ইচ্ছায় কুকার্য্য করিয়া দুঃখ উপভোগ করে, তুমি হয়ত এই বলিয়া দোষটা আমার ঘাড়েই চাপাইবে। কিন্তু এ তোমার ছেলে-ভুলান কথা। আমার আবার স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়। আমার ইচ্ছায় কাজ হইলে আমায় অষ্ট প্রহর কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। কে দুঃখ চায়? আমারত সর্ব্বদাই সুখের ইচ্ছা, কিন্তু ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছায় জগৎ খাটে বলিয়াইত আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ফলবতী হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ আমার কার্য্য করিবার শক্তিই বা কোথায়? তুমি যে আমায় কলের পুতুল করিয়া রাখিয়াছ। যখন যে ভাবে যে তালে নাচাও তখনই আমি সেই ভাবে, সেই তালে নাচিতেছি। তুমি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, কর্ণের কর্ণ, অন্তরের অন্তর হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রামকে যে ভাবে পরিচালিত করিতেছ তাহারা সেই ভাবে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে। জগৎকর্ত্রি! যাঁহারা তোমার ভক্ত, তাঁহারাই ত বলেন "তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি"। সুতরাং তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যাহা বলাও তাহা বলিতেছি, যাহা শুনাও, তাহা শুনিতেছি, যাহা দেখাও তাহা দেখিতেছি, এবং যাহা করাও তাহা করিতেছি। ইহা কিরূপে জানিলাম, জানাইব। জানাইব আর কি, তুমি অন্তর্যামিনী, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তোমার লোচন ত্রয়। জগতের সমস্ত সম্বাদই তুমি জান। তথাপি একটু স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

একদিন একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বৈঠক খানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক জন জ্যোতির্বিৎ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতেছেন। লগ্ন ঠিক হইয়াছে কি না তাহা বুঝিবার নিমিত্তই হউক কিম্বা নিজের বুজরূকি দেখাইবার নিমিত্তই হউক সূতিকা গৃহের কোন দিকে দ্বার ছিল, ঘরে কত জন লোক ছিল, তাহাদের কোন্ বর্ণের বস্ত্র ছিল ইত্যাদি বিবরণ জ্যোতির্বিৎ ঠিক ঠিক বলিয়া দিতেছেন, আর এক জন লোক অন্তঃপুর হইতে জানিয়া সমস্ত বিষয় মিলাইয়া লইতেছে। জ্যোতির্বিৎ অবশেষে বলিলেন, দীপাধারে সাত গাছা বর্ত্তিকা (শলিতা) ছিল। ইহাও ঠিক মিলিল। তখন আমি বলিলাম মহাশয়! এ সকল কথা আপনি কি কৌশলে বলেন। জ্যোতির্বিৎ বলিলেন, কোন্ লগ্নে কোন্ নক্ষত্রে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ দ্রেক্কানে জন্মিলে কি কি অবস্থা ঘটিবে, গৃহে কতজন লোক থাকিবে ইত্যাদি সমস্তই বচনে নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি সেই বচনানুসারে বলিতেছি। তখন আমি বলিলাম মহাশয়! শলিতার পরিবর্ত্তন ত আমাদের হাতেই, আমরা এক গাছা দিলেও পারি, সাত গাছা দিলেও পারি, আপনার বচনে কি করিবে।

জ্যোতির্বিৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, যখন চিরকালই দেখিলাম, বচনের সঙ্গে মিলিতেছে, কেহই ইহার অন্যথা করিতে পারিতেছে না, তখন কিরূপে বলিব যে শলিতা পরিবর্ত্তনের ভার আপনার হাতেই রহিয়াছে। যদি আপনার হাতে থাকিত তবে অবশ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন!

বিশ্ব বিধাত্রি! যে দিন ইহা শুনিয়াছি, সেই দিন হইতেই বুঝিয়াছি আমি কর্ত্তা, আমি হর্ত্তা, ইহা আমার উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। যখন শলিতাটী পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নাই, তাহাও জননি! তোমার হাতে রহিয়াছে, তখন আর আমার কর্তৃত্ব থাকিল কোথায়? তবে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অনেক সময়ে তোমার কার্য্য "আমার" বলিয়া ভাবি, কিন্তু ভাবিলে কি হয়, রাম দাসকে শ্যামদাস ভাবিলে সে শ্যামদাস হয়না। আমি আমাকে বটবৃক্ষ বলিয়া ভাবিলে আমি বটবৃক্ষ হই না। সেই রূপ ভ্রম বশতঃ তোমার কার্য্য আমার বলিয়া ভাবিলেও

তাহা আমার কার্য্য হইবে না। কাজ গুলি বস্তুতঃ তোমারই। আমি যেন ঠিক্ ঢাকের অপর পৃষ্ঠ, আছি মাত্র, কোনও কাজে লাগিনা। তুমি মায়া-যবনিকার অন্তরাল হইতে যাহা করাইতেছ, আমি তাহারই মাত্র অভিনয় করিয়া আসিতেছি। তবে কেন জননি! উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে পড়িতেছে। কাজ কর তুমি, আর তাহার ভাল মন্দের দায়ী হই আমি। এ কেমন বিচার! অনাদ্যে! এখনও কি বলিবে দোষ আমার? একবার স্থির চিত্তে বিচার করিয়া বল দেখি দোষ তোমার, না আমার।

মা জগদম্বে! শুনিয়াছি, তুমি না কি ছলচক্র করিয়া সন্তানের মন ভুলাও। কেবল শুনিব কেন, এখন নিশ্চয় জানিয়াছি ছলচক্র তোমার চির কালীয় ব্যবসা। তাই এখনও হয়ত বলিবে যে জীবকে আমি ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় তালে২ নাচাই বটে কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া নাচাইতেছি। খুনী আসামীর ফাঁসীর হুকুম হয় তাহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের দোষে, বিচারকের দোষে নয়, সেই রূপ তোমারাও পূর্ব্ব জন্ম কৃত কার্য্যের দোষে কুফল ভোগ করিয়া আসিতেছ, ইহাতে আমার দোষ কোথায়? মাগো! এরূপ ব্যবসা দারী কথা তোমার তহবিলে অনেক আছে বটে, কিন্তু ইহাও কি কোনও কাজের কথা, এ যে কেবল ছেলে ভুলান কথা। এই মাত্র না তোমাকে তন্ন২ করিয়া দেখাইয়া দিলাম তুমিই সমস্ত কার্য্য করিতেছ, আমার কিছু মাত্র কার্য্য করিবার শক্তি নাই। এ দেহে যেরূপ কার্য্য করিবার শক্তি নাই, পূর্ব্ব২ দেহেও সেই রূপ ছিল না। তখনও তুমিই সমস্ত করিয়াছ, বা করাইয়াছ! তবে আর আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম থাকিল কোথায়? পক্ষান্তরে যখন না ছিল বায়ু, না ছিল তেজঃ, না ছিল আকাশ, না ছিল জল, না ছিল মেদিনী, যখন চন্দ্র ছিল না, সূর্য্য ছিল না, গ্রহ নক্ষত্রাদি ছিল না, অধিক কি, তুমি বৈ আর কিছুই ছিল না, যখন এক মাত্র তুমি বিরাজ করিতেছিলে, ইচ্ছাময়ি! যখন "একোহং বহু স্যাং" বলিয়া এক তুমি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তখন আমার কর্ম্ম ছিল কোথায়। যখন তোমার জ্যোতির্ম্ময় বিশুদ্ধ দেহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আমাদিগকে পৃথক্ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে,* তখন আমার কর্ম্ম ছিল কোথায়। যখন আমার আমিত্ব ছিল না, জীবত্ব ছিল না, পৃথগস্তিত্ব ছিল না, তখন আমার কর্ম্ম ছিল কোথায়। জীবের সৃষ্টি অনাদি, কেবল একথা বলিলে চলিবে না। অনাদি অনন্ত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকটে, তোমার কাছে আবার অনাদি অনন্ত কোথায়। সৃষ্ট পদার্থের আদি নাই, এবড় অসঙ্গত কথা। ইচ্ছাময়ি! যদি জীব সৃষ্টির আদি না থাকে তবে একোহং বহুস্যাং (এক আমি বহু হইব) তোমার এরূপ কল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই বলি সেই আদিম অবস্থায়, যখন আমি তোমার সঙ্গে অপৃথক্ ভাবে সান্দ্রানন্দ উপভোগ করিতে ছিলাম, তখন আমার কর্ম্ম ছিল কোথায়। তখন ত আর আমি ধর্ম্ম কর্ম্মের ধার ধারিতামনা। তবে কেন আমায় বিনা দোষে সেস্থান হইতে কুস্থানে বাহির করিয়া দিলে। তবে কেন আমায় ঊর্ণনাভের ন্যায় মায়াজাল বিস্তার করিয়া বান্ধিলে। তবে কেন আমায় কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে। তবে কেন আমায় জন্মান্ধ করিয়া রাখিলে। মা গো! বড় কষ্ট পাইয়া বলি, তুমি কি আর মায়ের ধর্ম্ম রাখিয়াছ। জন্ম মাত্রে জ্ঞান হরিয়া লইয়াছ, হস্তপদ দৃঢ় শৃঙ্খলে বান্ধিয়াছ, অজ্ঞান শক্তিহীন শিশুকে ভবার্ণবে ডুবাইয়া রাখিয়াছ। ইহারই কি নাম মাতৃস্নেহ। যাঁহারা তোমার বার্ত্তা জানেন, তাঁহারা বলেন তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। তা ঠিক্ কথা। তোমার

* সত্য লোকে মহাকালী মহঃ রুদ্রেণ সংপুটা। অনাদি পুরুষোদ্ভূতা তদংশা জীব সংজ্ঞকা। অগ্নের্যথা দেবি স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রং।

ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিলে কি আর আমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিত। আবার সকলেই বলেন, তোমার কোনও গুণ নাই, গুণ যে নাই তাহাত চক্ষের উপরেই দেখিতেছি। আবার কেহ ২ বলেন তুমি একে বারে অকর্ম্মা। সে আরও ভাল, নিগুণ মাতার দুগুণের অভাব নাই বটে। তোমাকে কেহ ২ বলেন সেন্দ্রিয়, কেহ ২ বলেন অতীন্দ্রিয়, * আবার কেহ ২ বলেন তুমি নিরিন্দ্রিয় § শেষের সিদ্ধান্তই ঠিক্। মা! তুমি নিরিন্দ্রিয়ই বটে। তোমার যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় থাকিত, তবে সন্তানের এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা একবারও কি চাহিয়া দেখিতে না, কর্ণেন্দ্রিয় থাকিলে এত কান্দি, এত ডাকি, এত আর্ত্তনাদ করি, একবারও কি তাহা শুনিতে না। বাগিন্দ্রিয় থাকিলে একবারও কি সন্তানের ডাকে উত্তর প্রদান করিতে না। ত্বগিন্দ্রিয় থাকিলে এক দিনও কি কোলে করিয়া সন্তানের স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে না। তবে বুঝিয়াছি সত্য সত্যই মা তুমি নিরিন্দ্রিয়। আবার ইহাও শুনি, তুমি না কি রামপ্রসাদের বেড়ার বন্ধন ফিরাইয়াছ। মস্তকে পাষাণ বহিয়া ব্রহ্মাণ্ডগিরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়াছ, তবে কি তুমি তাহাদের নিকটে সেন্দ্রিয়, আর আমার বেলাতেই কেবল নিরিন্দ্রিয়। তোমার নাকি সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি, ইহার নামই কি সেই সমদর্শিতা!

আবার শাস্ত্রে শুনিয়াছি তুমি নাকি পাষাণের মেয়ে! বাল্যকালে ভাবিতাম কথাটা কবিকল্পিত, পাষাণের কি আর ছেলে মেয়ে হয়, কিন্তু এখন দেখিলাম কথা ঠিক। তুমি পাষাণের মেয়ে না হইলে এরূপ পাষাণ হৃদয় হইবে কেন, পিতার গুণ সন্তানে বর্ত্তিয়াছে।

অথবা তুমি কিম্ভূত কিমাকারের মেয়ে? অদ্যাপি তাহা কেহই নিশ্চয় করিতে পারে নাই। তা তুমি যে রূপই হও না কেন, আমি এক কড়ার আদার ব্যাপারী, আমার সে জাহাজের খবরে প্রয়োজন কি। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে তোমার মতলব কি। এই যে জীব গুলির নাকে রশি দিয়া কলুর বলদের ন্যায় ঘুরাইতেছ, তোমার মতলব কি। এরূপ করিবার প্রয়োজন কি। ইহাতে তোমার লাভই বা কি। তুমি পরিপূর্ণ, তোমার কিছুরই অভাব বা কিছুতেই প্রয়োজন নাই, অথচ একবার ভাঙ্গ, একবার গড়াও, একবার ঘুরাও, একবার ফিরাও, এই রূপ কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ডের কাজ চালাইতেছ। তোমার মতলব কি। প্রয়োজন না থাকিলে কাজ করে কেবল বালক বালিকা আর পাগলে। কিন্তু তুমি নিতান্তই বালিকাও ত নও যে প্রয়োজন ভিন্ন কাজ করিতেছ। তবে কি তুমি পাগলিনী? তাই বটে। পাগলিনী না হইলে এত বয়সে উলঙ্গিনী থাকিবে কেন। পাগলিনী না হইলে ত্রিভুবনেশ্বরী হইয়া এত মণিমুক্তা থাকিতে মুণ্ড মালা ধারণ করিবে কেন। পাগলিনী না হইলে পতির বুকে চরণ দিয়া অপ্রসঙ্গে অট্ট ২ বিকট হাসি হাসিবে কেন। পাগলিনী না হইলে মুক্তকেশে মুক্তবেশে বুড়োবয়সে বিকট নৃত্যে মেদিনী কাঁপাইবে কেন? পাগলিনী না হইলে ভয়ঙ্করী লোল জিহ্বা বাহির করিবে কেন? এতক্ষণে বুঝিয়াছি, মা! তুমি পাগলিনী। কিন্তু বড় কাজের পাগল। ভুল নাই, ভ্রান্তি নাই, বিস্মরণ নাই, কাজ কর্ম্মে শৈথিল্য নাই, অথচ পাগ্‌ল্যামি চলিতেছে, তাই বলি, বড় কাজের পাগল। পাগলিনীর ছেলে পাগলই হয়। তাই আমি মাতৃদোষে পাগল হইয়া সমস্ত শক্তি হারাইয়াছি। স্মরণ শক্তি একেবারে নাই, আপনাকে পর্য্যন্ত আপনি ভুলিয়াছি। যাহা আমার ছিল, তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি। যাহা আমার নয়, অনিত্য, অসত্য, তাহাতে অবিরাম "আমার ২" জল্পনা চলিতেছে। আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোথায়

---

* যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। যং শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

§ অপাণি পাদো যবনো গ্রহীতা ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

আসিলাম, কোথায় যাইব, এ সকল কথা একেবারে ভুলিয়াছি। এ সকল তত্ত্ব যদি কেহ বুঝাইয়া দেয়, তবে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ভাবি। বিশ্বাস করিতে পারি না। আমার এই রূপ দুরবস্থা দেখিয়া ঘরের দাস দাসীরা পর্য্যন্ত আমার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। ইহা কি সাধারণ দুঃখের বিষয়, আমি রাজ রাজেশ্বরীর সন্তান হইয়া পথের কাঙ্গাল সাজিয়াছি। ঘরের কর্ত্তা হইয়া কিঙ্করের কিঙ্কর হইয়াছি। দশজন গোলামের গোলামি করিতে করিতে আত্মগৌরব, আত্মমর্য্যাদা একেবারে হারাইয়াছি। পাপের সংসর্গে, পাপের মন্ত্রণায়, পাপপঙ্কে ডুবিয়াছি। তাই বলি, জননি! পাগলিনি! আমার কি আর উদ্ধারের পথ নাই, এ রোগের কি আর ঔষধ পথ্য নাই, যদি থাকে, বলিয়া দাও; না না, কেবল বলিয়া দিলে চলিবে না। আমার যে সে দিন নাই, আমি যে নিতান্ত শক্তিসামর্থ্য হীন হইয়াছি। আমি ঔষধের শোধন জানি না, বোধন জানি না, জীবন্যাস জানি না, কোন্ পথে গেলে পাওয়া যায়, সে পথ পর্য্যন্ত জানি না, আমি এখন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাইতে অক্ষম। যদি প্রস্তুত ঔষধ কোনও চিকিৎসকের নিকট থাকে তবে সেই ভবরোগের চিকিৎসককে দেখাইয়া দাও। আমি তাঁহার চরণে লুটাইয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া লই! কুলকুণ্ডলিনি! একবার দেখাইয়া দাও, আমি তাঁহার কৃপাবলে কুলজ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাঁচি।

শিবলিঙ্গপূজা।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্
অপরাপরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥ ৮॥

অর্থাৎ "ইহারা এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরাপর সম্ভূত ও কামহেতুক বলিয়া থাকে; তাহাদের মতে জগতের অন্য কোন কারণ নাই।"

শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র সেন এই শ্লোকটী সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন "আমাদের শিবলিঙ্গ পূজা কি তবে ইহাদের দ্বারাই প্রচলিত?" [১] কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির লেখনী হইতে এরূপ কথা নির্গত হইলে আমরা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতাম না। কিন্তু এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি যখন সাধারণ সমক্ষে এরূপ দূষণীয় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তখন কোন কথা না বলা উচিত হয় না। বিশেষতঃ এ ভাবটী ভগবদ্গীতার অনুবাদে প্রকাশিত হওয়াতে অনেক হিন্দুর চক্ষে ইহা পতিত হইবে। ইহা দেখিয়া তাহাদের ভাবান্তর হইতে পারে, এবং মহাদেবের প্রতি ভক্তি ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহা অশ্রদ্ধায় পরিণত হইতে পারে।

নবীন বাবু স্থির করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ মহাদেবের শিশ্নকে পূজা করিয়া থাকে, এবং এই নিমিত্তই তিনি উল্লিখিত ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, শিবলিঙ্গ পূজা মহাদেবের শিশ্নপূজা নহে, ইহা মহান্ ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় গুরুদত্তের এক খানি জীবনী আছে। ইহা নৃসিংহ সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রণীত। এই পুস্তকের মধ্যে গোকর্ণ মহাবলেশ্বর নামক একটী প্রসিদ্ধ তীর্থের বৃত্তান্ত আছে। এই বৃত্তান্তটী স্বয়ং গুরুদত্ত তাঁহার এক জন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন। কোন্ সূত্রে শিবলিঙ্গ পূজা পৃথিবীতে প্রকাশিত হইল, এই নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটীর দ্বারা জানা যায়

লঙ্কার অধিপতি রাবণের জননী প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন। একদা রাবণ তাঁহারই জননীকে অভিবাদন করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি মৃত্তিকা-

[১] শ্রীনবীন চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩০ পৃষ্ঠা।

নির্ম্মিত শিবের পূজা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল। প্রকৃত মূর্ত্তির অভাবে তাঁহার জননীকে প্রতি দিন মাটীর মূর্ত্তি গড়াইতে হয় ইহা অবগত হইয়া, রাবণ কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের কাছে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া, মহাদেবের স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া রাবণকে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাবণ সবিশেষ বলিলেন, এবং মহাদেবের কাছে একটী প্রকৃত মূর্ত্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। মহাদেবের নিকট প্রাণলিঙ্গ ছিল। তিনি রাবণকে তাহা প্রদান করিলেন। দিবার সময় মহাদেব রাবণকে বলিলেন যে, এই লিঙ্গটীকে প্রতিদিন তিনবার করিয়া পূজা করিতে হইবে, এবং যে ব্যক্তি ইহাকে পূজা করিবে সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে, এবং মৃত্যু তাহাকে কোন কালে স্পর্শ করিতে পারিবে না। মহাদেব একটী বিষয়ে বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এ লিঙ্গটীকে যেন ভূমিতে রাখা না হয়। এই লিঙ্গটী পাওয়াতে রাবণের মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি স্থির করিলেন যে, কোন খানে বিশ্রাম না করিয়া একেবারে লঙ্কায় গিয়া উপনীত হইবেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে শিবলিঙ্গটীকে কোন খানে রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। মনে ২ এই রূপ স্থির করিয়া, রাবণ লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি মহাবলী নামক স্থানে আগমন করিলেন, নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মুনিপুঙ্গবকে দেখিয়া রাবণ অতীব আনন্দ লাভ করিলেন, এবং বিনীত ভাবে প্রণাম করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উভয়ের মধ্যে সৎপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। এমন সময়ে নারদ মহাদেবের প্রাণলিঙ্গটী দেখিতে পাইলেন, এবং রাবণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি প্রকারে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাবণ নারদ মুনিকে সবিশেষ জানাইলেন। ইহা শুনিয়া নারদ মুনি রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তিনি পরম ভাগ্যবান্, যেহেতু এমন দেবদুর্লভ পদার্থ তিনি হস্তগত করিয়াছেন। রাবণ বিদায় প্রার্থনা করিলে, নারদ তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি যদি আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি এই লিঙ্গ সম্বন্ধে যাহা অবগত আছেন তাহা তাঁহাকে শুনাইতে পারেন। রাবণ সম্মত হইলে নারদ মুনি তাঁহাকে বলিলেন যে, কোন সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর মৃগয়ার্থে গমন করিয়া একটী স্থানে দেখিতে পাইলেন যে, একটী মৃগের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা এই দেহটীকে খণ্ড ২ করিয়া কাটিলেন। ইহার ভিতরে একটী আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ছিল। ইহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এই মূর্ত্তিটীর উপরি ভাগে তিনটী শৃঙ্গ এবং নিম্ন ভাগে তিনটী লিঙ্গ। এই মূর্ত্তিটী মহাদেবকে এত দূর পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছিল যে, তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন, এই মূর্ত্তিটি মহাদেবের কত প্রিয় এবং ইহাকে পূজা করিলে কি প্রকার বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়, নারদ মুনি রাবণকে উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিলেন এই সময়ে সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিলেন। ইহা দেখিয়া নারদ রাবণকে বলিলেন যে, এ স্থলে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সন্ধ্যা ক্রিয়া সমাপন করা উচিত। প্রাণ লিঙ্গটীকে ভূমিতে রাখা নিষেধ, অথচ সন্ধ্যা বন্দনাদি করাও উচিত। রাবণ এই বিষয় মনে ২ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গণপতি ব্রহ্মচারী রূপে দেখা দিলেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ কথা বার্ত্তার পর তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যদি কৃপা করিয়া লিঙ্গটী ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সন্ধ্যাদি করিতে পারেন। গণপতি প্রথমে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাবণের বিশেষ অনুরোধে তিনি লিঙ্গটীর ভার লইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু

তিনি রাবণকে বলিলেন যে, লিঙ্গটী ভারি, তিনি তাহাকে অধিকক্ষণ ধারণ করিতে পারিবেন না। যদ্যপি রাবণ শীঘ্র প্রত্যাগমন না করেন, তাহা হইলে তিনি তিনবার তাঁহাকে ডাকিবেন। যদি আসিতে বিলম্ব না করেন উত্তম, নতুবা লিঙ্গটীকে ভূমিতে রাখিয়া গমন করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। রাবণ ইহাতে সম্মত হইলেন, এবং গণপতির হস্তে লিঙ্গটীকে দিয়া, তিনি সন্ধ্যা করিতে গমন করিলেন। রাবণ একাগ্র মনে সন্ধ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে গণপতি তাঁহাকে ডাকিলেন। কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে আরো দুইবার ডাকিলেন। তিনবার ডাকিয়া যখন কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না, গণপতি শিবলিঙ্গটীকে ভূমিতে রাখিয়া স্বস্থনে প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যা সমাপন করিয়া রাবণ প্রত্যাগমন করিলেন। শিব-লিঙ্গটীকে ভূমিতে প্রোথিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। লিঙ্গটীকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিবার জন্য বিশেষ রূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সজোরে টানাতে লিঙ্গটী রূপান্তর হইল। ইহার মধ্য স্থল গাভীর কর্ণের আকার ধারণ করিল। এই নিমিত্ত ইহার নাম গোকর্ণ হইল। মহাবলী নামক স্থানে ইহা অবস্থিতি করিল বলিয়া, এই লিঙ্গটী অবশেষে গোকর্ণ মহাবলেশ্বর নামে বিখ্যাত হইল। এই অবয়ব বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে।

কোন্ সূত্র হইতে শিবলিঙ্গ পূজা প্রবর্ত্তিত হইল তাহা আমরা বিবৃত করিলাম। এখন দেখা যাউক, শিবলিঙ্গ পূজার পদ্ধতি কি। আমরা কি মহাদেবের শিশ্নকে পূজা করিয়া থাকি, না প্রকৃত মহান্ ঈশ্বরকে পূজা করি? ধ্যানের সময়ে আমরা কোন্ মূর্ত্তির চিন্তা করি, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। তাঁহার বর্ণ শ্বেত, তাঁহার ললাটে চন্দ্র শোভা পাইতেছে, তাঁহার শরীর উজ্জ্বল, তাঁহার চারিটী হস্ত পাঁচটী মুখ এবং তিনটী চক্ষু। কমল ফুল তাঁহার আসন, ব্যাঘ্র চর্ম্ম তাঁহার বসন। শ্বেত বর্ণ পবিত্রতাব্যঞ্জক। অতএব এই বর্ণ মহাদেবের উপযোগী। আকাশে যত উজ্জ্বল পদার্থ আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রকে আমরা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তির রূপ বর্ণনা করিবার সময়ে, আমরা তাহাকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। বিশেষত চন্দ্র সুধাবর্ষণ করেন বলিয়া, আমাদের কাছে তিনি অতীব আদরণীয়। সুতরাং, পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মধুরতা উপলব্ধি করিবার জন্য, আমরা যে তাঁহাকে চন্দ্রশেখর আখ্যা প্রদান করিব ইহা বিচিত্র নহে। আবার যে আদি পুরুষ হইতে সকল পদার্থ সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার শরীর অবশ্যই উজ্জ্বল। মহাদেবে চারিটী হস্ত আরোপিত করিবার অভিপ্রায় আছে। এক হস্তে পরশু ধারণ করিয়া তিনি পাপী দিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। মৃগের অর্থ পশু। আর এক হস্তে মৃগধারণ করিয়া তিনি জীব-গণের উপর তাঁহার আধিপত্য দেখাইতেছেন। এই ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহার একটী নাম পশুপতি। ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তিনি তৃতীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন, এবং চতুর্থ হস্তটী বাড়াইয়া দিয়া তিনি "ভয় নাই" "ভয় নাই" বলিয়া লোককে অভয় দান করিতেছেন। মহাদেবের পাঁচটী মুখ। এই পাঁচ মুখ পঞ্চভূতের পরিচায়ক। এই পাঁচ ভূত হইতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে, এবং মহাদেবই তাহা বর্ত্তমান। তিনি পঞ্চভূতের নাথ। তাঁহার নামও এই জন্য ভূতনাথ। আমাদের শাস্ত্রে পরমেশ্বর এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছেন, "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।" অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানে তাঁহার চক্ষু, সকল স্থানে তাঁহার মুখ, সকল স্থানে তাঁহার বাহু এবং সকল স্থানে তাঁহার চরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পাঁচ, বহু সংখ্যা বাচক। মহাদেবকে পঞ্চমুখ বিশিষ্ট

বলাতে তাঁহার সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা প্রকাশ করিতেছেন। আমরা বলিয়া থাকি "পাঁচ" [পঞ্চায়ত] এই বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কতক গুলি লোক একত্রিত হইয়া বিষয়টী নিষ্পত্তি করিয়াছেন। "পাঁচ ফুলে সাজি" ইহার অভিপ্রায় এই, নানা প্রকার ফুলে সাজিটী পরিপূর্ণ। মহাদেবের তিনটী চক্ষু। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি সর্ব্বদর্শী। তিনটী চক্ষুর দ্বারা তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ব্যাঘ্রের চর্ম্ম তাঁহার বসন এবং পদ্ম পুষ্প তাঁহার আসন। ব্যাঘ্রের চর্ম্ম তাঁহার ভীষণ ভাব এবং পদ্ম তাঁহার কোমল ভাব প্রকাশ করিতেছে। অত্যাচারীর কাছে তিনি উগ্র, কিন্তু পুণ্যবানের সমক্ষে তিনি বিনম্র ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। আবার এই মন্ত্রের মধ্যে তাঁহাকে বিশ্বের আদি ও বিশ্বের বীজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বোধ হয়, আর অধিক বুঝাইতে হইবে না যে, শিবলিঙ্গ পূজা প্রকৃত পক্ষে মহান্ ঈশ্বরের পূজা।

পুরাণেতিহাস।

হিন্দুদিগের জাতীয় ইতিহাস নাই, হিন্দুগণ স্বদেশীয় মহাপুরুষ দিগের জন্ম বৃত্তান্ত লিখিতে জানিতেন না; হিন্দুর মধ্যে কখনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল পরিস্ফুট হয় নাই, হিন্দু নিজের ঘরের কথা নিজেই বিস্মৃত হইয়াছেন। অপিচ হিন্দু মহাবীর তেজস্বী স্বাধীন ছিলেন, হিন্দু অলোক সামান্য ধর্ম্মের দিব্যজ্যোতিতে জগৎকে সমালোকিত করিয়াছিলেন, হিন্দু সুপুষ্ট, সংস্কৃত, সুললিত মধুর ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হিন্দুর অসাধারণ গবেষণার ফলে সৃষ্টি চাতুরীর গুহ্য গর্ভস্থ গোপনীয় বিষয় সকল দর্শন শাস্ত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, হিন্দু তীব্র গণনার গুণে আকাশের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের গতিবিধির সমাচার পাইয়াছিলেন, হিন্দু জগৎকে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, পাশ্চাত্যগণকে রেখাগণিত এবং বীজগণিতের নূতন তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। হিন্দু সকল বিষয়ে জগদ্গুরু ছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের কথা হিন্দুর অম্লান মস্তিষ্কে বিকশিত হয় নাই। আমরা প্রায়ই শিক্ষিত সমাজের নিকট হইতে এই বিষয়ের আক্ষেপ শুনিতে পাই। পাশ্চাত্য অনেক অধ্যাপক এই কথা লইয়া আমাদের পিতৃ পুরুষগণকে রহস্য বিদ্রূপও করিয়াছেন। ইহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ফরাসীস রাজ্যবিপ্লব হইতে এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্য্যন্ত ইউরোপ খণ্ডে অনেক নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হইয়াছে, অনেক নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবনা হইয়াছে, অনেক আশ্চর্য্য যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল আবিষ্কার, উদ্ভাবনা এবং যান্ত্রিক উন্নতি দ্বারা য়ুরোপ সমাজ সম্যক্ আলোড়িত হইয়া এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। এবং যে পাশ্চাত্য সভ্যতা, একতা আদির কথা আমরা এখন এত শুনিতে পাই, তাহাও অতি সম্প্রতি হইয়াছে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপ খণ্ডের সভ্যতা আমাদের হিন্দু-সভ্যতা হইতে বিশেষ ন্যূন ছিল; সে সময়ের মাপকাটি লইয়া বিচার করিতে হইলে ইউরোপকে অনেক বিষয়ে অবনতমস্তকে হিন্দুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। পরন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই সার্দ্ধ এক শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপ যাহা শিখিয়াছে, যাহা বুঝিয়াছে, যাহা দেখিয়াছে এবং যাহা ভুলিয়াছে ও বর্জ্জন করিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে জগতের অন্য কোন জাতির ভাগ্যে হয় নাই। আবার এ দিকে পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরপদ সেবী হিন্দুগণ ভাগ্যদোষে, অবস্থাবৈগুণ্যে সে পুরাতন জাতীয় জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেও পারেন নাই; অধিকন্তু বর্ব্বর ও পিশাচ বিজেতার অত্যাচারে তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি অনেক নষ্ট হইয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুর যাহা ছিল এখন তাহার অনেক সামগ্রীই নাই। সহস্র বৎসর

পূর্ব্বে যে ভাবে, যে উপায়ে এবং যে দিক্ হইতে মানব বুদ্ধি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, হিন্দু তাহার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন মাত্র সংস্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। পরন্তু আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই প্রবীন সভ্যতার পরিমাণ নবীন পাশ্চাত্য তত্ত্বের দ্বারা করিতে ইচ্ছুক। যুক্তি শাস্ত্রের ইহা নিয়ম নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সমাচার ইংরাজ আমাদিগকে দিয়াছেন, এবং তদনুসারী শিক্ষা দিয়া সেই ছাঁচে আমাদের প্রকৃতিকে ঢালিতে চাহেন। এই শিক্ষার গুণে আমাদের জাতীয় চরিত্রে এক ভয়ানক বিপ্লব ঘটিতেছে। যাহা আমাদের পুরাতন, যাহা আমাদের নিজস্ব, তাহা আমরা বিস্মৃত হইতেছি, অথচ নূতন শিক্ষা নূতন তত্ত্ব এখনও আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি নাই। এখন আমরা ইতো ভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ। যদি বিচার করিতে হয়, আলোচনা করিতে হয়, তুলনা করিতে হয় ত অন্যূন শতবর্ষ পূর্ব্বের পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং আমাদের সেই আর্য্য সভ্যতার বিচার, আলোচনা এবং তুলনা করা উচিত। কিন্তু তাহা কেহ করে না; এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণের সে উদ্দেশ্যও নহে। র‍্যালে, কল্যারেণ্ডন, মেণ্ডোজা, জ্যারেট আদি লেখক গণ যে সকল ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের রচিত ইতিবৃত্ত অপেক্ষা কোন বিষয়ে উচ্চতর নহে। ইদানীং পাশ্চাত্যগণ জেনোফন, থুকীদিদীজ্ লিখিত গ্রীক ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া, প্লেটো আরিস্টটেলের ঐতিহাসিক আলোচনা অধ্যয়ন করিয়া জাতীয় বৃত্তান্ত নূতন ভাবে রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাও তাঁহাদের অল্পদিনের শিক্ষা, এখনও সকল কথার সম্যক্ আলোচনা হয় নাই, এখনও অনেক জটিল বিষয় অবিস্তারিত পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও অনেক তত্ত্ব বুঝিতে বাকী আছে। এতদ্ব্যতীত অনেক যুদ্ধবিপ্লব আদি ঘটনানিচয়ের বিবরণ পাশ্চাত্য ইতিহাস আদিতে ঠিক দেওয়া হয় নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিক নিজের জাতির দিকে টানিয়া সকল কথাই বলিয়াছেন, আবার ফরাসীস্গণ ইংরাজের লিখিত ইতিহাসের বার আনা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছেন। যে স্থলে জাতীয় মানাপমানের কথা সেই স্থলেই মহাবিভ্রাট বাধিয়াছে। কাযেই ইতিহাস পাঠের যে উদ্দেশ্য, ইতিহাস লেখার যে অভিপ্রায়, তাহা অনেকটা পরাভূত হইয়াছে। সেই জন্যও গ্রীক দিগের প্রদর্শিত চমৎকার ঐতিহাসিক আদর্শ অনুযায়ী ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিতে নবীন ইতিহাসবেত্তাগণ পারিতেছেন না। জাতীয় অহঙ্কার যতদিন থাকিবে, ততদিন ইহা পারিবেন কি না সন্দেহ স্থল। সে যাহা হউক এখন আমাদের পুরাতন ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিচার করা যাউক।

কোল্‌ব্রুক এবং উইলিয়ম জোন্স সাহেব দ্বয় যখন প্রচারিত করিলেন যে সুসভ্য হিন্দুর গৃহে ইতিহাস নাই, পুরাতন হিন্দুদিগের মধ্যে ইতিবৃত্তলিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল না; তখন ফরাসীস পণ্ডিত আবেল রেমুসাত প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে যদি ঐতিহাসিক বিদ্যা হিন্দুগণ জানিতেন না তাহা হইলে মুসলমান লেখক আবুল ফজল কোথা হইতে হিন্দু দিগের পুরাতন কাহিনী পাইয়াছিল? রাজতরঙ্গিনী, বিজয়বিলাস সূর্য্য প্রকাশ মানচরিত্র আদি ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয় পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায় যে হিন্দুগণ ইতিহাস লিখিতে ভাল রূপেই জানিতেন। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ত দুর্দ্দান্ত, মূর্খ, বিজয়ী পাঠান রাজাগণ স্তূপে২ সংস্কৃত গ্রন্থ ভস্মসাৎ করিয়াছে। কত অমূল্য গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত পুরাণ, কত দর্শন কত রসায়ন চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। সে অপূর্ব্ব মনীষা বুঝি আর জগতে প্রকাশিত হইবে না, যেন অতীতের উপর নিয়তি শ্মশান ধূমের আবরণ জড়াইয়া দিয়াছেন। এখন বিচার্য্য এই যে যদি স্বীকার করা যায় যে রাজতরঙ্গিনীই আমাদের আদর্শ ইতিহাস গ্রন্থ, আর যে সকল ইতিহাস গ্রন্থ

ছিল [যদি সত্য সত্যই তাহাদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়।] তাহারা ইহার অনুরূপ ছিল, তাহা হইলেও আমাদের কাহারও নিকট বড় বিশেষ অপ্রস্তুত হইতে হইবে না। কারণ আধুনিক দুই চারিজন উচ্চাঙ্গের ইতিহাস লেখক ব্যতীত পুরাতন সকল পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক রাজতরঙ্গিনী বিজয়বিলাসাদির ছাঁচে ইতিহাস লিখিতেন। আমরা পুরাতন দুই এক খানি ইংরাজী ক্রনিকল্ পাঠ করিয়াছি, হিস্পানী জ্যারেটাদির দুই এক খানি পুস্তক দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে বরং হিন্দু ইতিহাস গ্রন্থ গুলি সুসঙ্গত এবং অনেকটা সম্পূর্ণ, কিন্তু এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্ভগণের লেখায় কেবল বুড়ী দিদিমার উপকথার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। যাহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বলা যায় তাহার বিবৃতি বকল্, গিজো, হালাম, গিবণ, থিয়রস্ আদি মহা পণ্ডিত গণ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারাই ইতিহাসের গতি ফিরাইয়াছেন, বিবরণ প্রণালীর ভঙ্গি ঘুরাইয়াছেন এবং সত্যের আদর বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রচারিত নিয়মানুযায়ী ইতিহাস লিখিতে গিয়া পুরাতন "উপকথা পূর্ণ" ইতিবৃত্ত সমূহকে মন্থন করিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া, মনগড়া করিয়া তবে ইংলণ্ডের ইতিহাস লেখা হইয়াছে। এই প্রকার কাট ছাঁট ইউরোপের সকল দেশেরই ইতিহাস লিখিবার সময়ে হইয়াছে। এবং টড সাহেব রাজস্থানের যে অতুলনীয় ও অমূল্য ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও তথাকার পুরাতন "গ্রন্থ" বিশেষ মথিত করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নবীন উপায়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবার বাসনা থাকিলে তাহার উপাদানের অপ্রতুল নাই। অষ্টাদশ মহাপুরাণ রহিয়াছে। প্রত্যেক রাজ গৃহে বংশ বিবরণ রহিয়াছে, দেশে ২ গ্রামে ২ কত কথা প্রচারিত রহিয়াছে, সকলের সমাবেশ কর, বিচার কর, যুক্তি অনুযায়ী বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহার বিবরণ লিখিলে উপাদেয় ইতিহাস গ্রন্থ নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু মূলেই গোল বাধিয়াছে, যে কুসংস্কার সকল সঙ্গে লইয়া পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সংস্কৃত শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিতেছেন তাহাতে হলাহল ব্যতীত অমৃত উদ্‌গিরণ হইবে না। পাকা খৃষ্টিয়ান জোন্‌স, কোল্‌ব্রুক, বেণ্টলী প্রথমেই যে সন্দেহ এবং গোলমাল বাধাইয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি কোন ইংরাজ পণ্ডিতের দ্বারা নিরসিত হইল না। সে সকল বিষয়ের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তবে কথা এই যে পাশ্চাত্য আধুনিক ফরমাইস অনুযায়ী এখনও ভারতবর্ষের এক খানিও সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশিত হয় নাই। কাযেই আমাদের নবীন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া পুরাতনে, পুরাতনে তুলনা করা উচিত; তাহাতে আমাদের জয় ব্যতীত পরাজয় হইবে না।

পরন্তু একবার দেখা উচিত যে ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কেবল রাজ সংসারের বংশ পরম্পরার ইতিবৃত্ত দেওয়া। তাহাদের মধ্যে কে কত বড় পাষণ্ড ছিল তাহা নিরূপণ করা, প্রজাগণ কেমন কুক্কুরের ন্যায় অত্যাচারীর পদলেহন করিয়াছিল এই সকলেরই সংবাদ দেওয়া কি ইতিহাসের এক মাত্র কার্য্য? অথবা আরও কিছু মহদুদ্দেশ্য আছে। পাশ্চাত্য গণ বলিয়া থাকেন যে ইতিহাসের প্রধান কার্য্য লোকশিক্ষা। পুরাতন প্রকৃতি পুঞ্জের মতি, গতি, এবং পরিণতি দেখিয়া পরবর্ত্তিগণ তাহা হইতে শিক্ষা পাইবেন, সমাজ পরিপুষ্টির নূতন উপায় উদ্‌ভাবন করিতে পারিবেন, স্বজাতিকে সংবদ্ধ এবং সংযত করিয়া চিরকাল সমুজ্জীবিত রাখিতে পারিবেন। গিজো, বকল্ আদি অধ্যাপকগণ ইতিহাসের ইহাই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যান করিয়াছেন। মোট কথায় সমাজ বন্ধন দৃঢ় করা, এবং স্বজাতিকে আয়ুষ্মান্ করা, ইতিহাসের শিক্ষণীয় বিষয় হয়। বাস্তবিক মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি জাতির এবং সমাজের পরিপুষ্টি না করিতে পারিলাম, নিজের

মহত্ত্বলে নিজের শিক্ষা গুণে, নিজের আত্মত্যাগের তীব্রতায় জাতিকে অমর পদে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলাম, তাহা হইলে বৃথা মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলাম। তবে স্বজাতীর পুষ্টি করিতে হইলে জাতীয় অহঙ্কার বৃদ্ধি করিতে হইবে। সমাজের রক্ষার নিমিত্ত, জাতীয় সম্মান বৃদ্ধির জন্য যখন প্রত্যেক লোকেই অনায়াসে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিবে, যখন বিজাতীয় কাহারও মুখে স্বজাতির সামান্য গ্লানি শুনিতে পাইলে তাহার জীবন গ্রহণ করিতে যে কেহ উদ্যত হইবে, জাতির পরিপুষ্টি এবং উন্নতি সাধনের জন্য সকলেই যখন অম্লান মুখে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিবে, তখনই জাতীয় অহঙ্কারের পূর্ণতা লাভ হইবে। যাহাদিগের মধ্যে এই অহঙ্কার অধিক প্রস্ফুটিত তাহারা অধিক সভ্য, অত্যন্ত বলী। নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব টুকুকে জাতীয় বিরাট "আমির" মধ্যে ডুবাইতে পারিলেই এই জাতীয় অহঙ্কার বিকশিত হয়। সত্যব্রত, সদাচারী, মিতব্যয়ী এবং পরোপকারী হইতে পারিলে এই মহদ্গুণ লাভ করিতে পারা যায়। যে দেশের লোক অধিক স্বার্থান্ধ তথায় মিথ্যাবাদীরও অপ্রতুল নাই। স্বার্থপর হইলে একতা হয় না, সমবেদনা ভুলিতে হয়, অগত্যা আভিজাত্য থাকে না। যে সত্যবাদী সে স্বার্থের জন্য পাগল নহে, যে সত্যের মর্য্যাদা করিতে পারে সে পরদুঃখ কাতর হয় সে তেজস্বী হয়, সমাজ ভক্ত হয়। যেমন কেন সমাজই হউক না, যাহাকে চিরজীবী করিতে হইবে তাহার ভিত্তি সত্যের উপর, ন্যায়ের উপর, পবিত্রতার উপর আত্মত্যাগের উপর সুদৃঢ় রূপে প্রোথিত করিতে হইবে। যদি সমাজের প্রতি জনেই সত্যবাদী, সদাচারী হয় তাহা হইলে সমষ্টিতে সমাজ সত্য প্রিয়, পবিত্র এবং তেজস্বী হইবে। সুতরাং সমাজে সত্যের আদর থাকিলে লোকে সত্যবাদী হইলে জাতিও আয়ুষ্মান হইবে। তাই ইতিহাস পুরাতন কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া, জাতীর উত্থান-পতনের কথা বলিয়া, সত্যের, পবিত্রতার এবং বীরত্বের সুযশ ঘোষণা করিয়া লোক শিক্ষা দিয়া থাকে এবং সুন্দর আদর্শ চক্ষের নিকট রাখিয়া, সাধু জীবন বর্ণন করিয়া স্বজাতি প্রেমের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনাদি কাল হইতে সৃষ্টির সৃষ্টি। কত জাতি, কত মহাজাতি জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কত মহৎকীর্ত্তি করিয়া প্রতাপে, স্পর্দ্ধায় ধরাধামকে বিচলিত করিয়া গিয়াছে, যন্ত্রের, তন্ত্রের উন্নতি করিয়া, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কত গুপ্ত কথা প্রকাশিত করিয়া জীবন ভার কত লাঘব করিয়াছে, তাহাদের কে সমাচার রাখিয়াছে ? অন্বেষণ করিয়া দেখ, পৃথিবীর পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখ কোন প্রকৃত সমাচারই তাহাদের পাইবে না, হয়ত কোথাও কোন গিরি গুহায় একটি সামান্য চিহ্ন মাত্র পাইবে, সে নিদর্শন তোমাকে অতীতের কোন কথাই বলিবে না, বরং তোমার স্পর্দ্ধা দেখিয়া তোমাকে ব্যঙ্গ করিবে। কোটী ২ মানবের জাতি সহস্র ২ বৎসর সংসারে বিচরণ করিল আজ তাহাদের একটি মাত্রও পদচিহ্ন নাই। মেক্সিকো পেরু দেশে আদিম ইণ্ডিয়ানদের পূর্ব্বে কি জানি কোন জাতি বাস করিত, তাহাদের কীর্ত্তির নিদর্শন অল্পই পাওয়া যায়, কিন্তু এখন তাহারা কোথায় ? মিসর দেশের মিস্ত্রীগণ এতবড় প্রতাপান্বিত জাতি ছিল, গতিশীল কাল এখনও তাহাদের কীর্ত্তিচিহ্ন জগতের মুখ হইতে মুছিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাদের ইতিহাস কৈ—সামাজিক ইতিবৃত্ত কৈ, এখন তাহারা কোথায় ? ফিনীক জাতি দিগের ন্যায় বাণিজ্যব্যবসায়ী কয়জন ছিল, হয়ত তাহারাই প্রথমে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র হৃদয় দ্বিধা করিয়াছিল, কে তাহাদের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহাদের মহত্ত্বের, বীরত্বের কে কীর্ত্তন করিয়াছে, এখন তাহারা কোথায় ? কত জাতি জন্মিয়াছে কত জাতি সার্ব্বভৌম

হইয়াছে, আবার অনন্ত কাল সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র জীব মনুষ্য তাহাদের কয়জনের তালিকা করিয়াছে, তাহাদের কয়জনের যশোগাথা স্মরণ রাখিয়াছে? আমরা নিজের কথাই কি স্মরণ রাখিতে পারিয়াছি! কত জানিবার, বুঝিবার ও বলিবার বিষয় ছিল, কোথায় তাহারা হারাইয়া গিয়াছে কে বলিতে পারে। আধুনিক য়ুরোপীয় গণ এক শত, দুই শত অথবা সাতশত বৎসরের কথা স্মরণ রাখিয়াছেন তাই তাঁহাদের মাৎসর্য্য আর ধরে না। কিন্তু জাতীয় জীবনে সহস্র বৎসর কতটুকু, শৈশব হইতে কৈশোর পর্য্যন্তও নহে। এই অল্পদিনের কথাও পাশ্চাত্যগণ সম্যক বিকৃত করিতে পারেন না অনেক মহামূর্খের দোষে জাতীয় ইতিহাসের স্থানে ২ অপবিত্রতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, সত্যের অনাদর করিয়া মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু প্রবীন হিন্দু জাতি মহাকালের মহত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, সৃষ্টির নশ্বরত্ব অনুভব করিয়াছেন তাই সামান্য ইতিহাসের দ্বারা জাতীয় জীবনের পরিমাণ করিতে সাহসী নহেন। যখন অনাদি কালের কোন কথারই সংবাদ জানি না, যখন অনন্ত সৃষ্টির কোন ক্রিয়াই বুঝিনা, তখন দুইদিন, দশদিনের দুইটা সামান্য কথা কণ্ঠস্থ করিয়া লাভ কি? এতদ্ব্যতীত ইতিহাসে সকল কথাই সত্য ঠিক লেখা থাকে না, যে খানে স্বজাতী একটু অপমানিত হইয়াছেন, সেই খানেই অপ্রকৃত বিষয় প্রকটীত হইয়াছে। অর্থ লোভী ঐতিহাসিক কত মহাপাষণ্ডকে ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাজাইয়াছে, কত বীর হৃদয়কে ভীরুতার কালিমায় মলিন করিয়াছে। হলপ লইয়া কেহ ইতিহাস লেখে নাই, সত্যের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য কেহ লেখনী গ্রহণ করে নাই। বরং নিজের খ্যাতি প্রসারের জন্য, অন্নদাতা প্রভুর বিজয় গাথা শতদুন্দুভী ধ্বনিতে বিঘোষিত করিবার জন্য, জাতীয় কোন কলঙ্কের কথা লুক্কায়িত করিবার জন্যই প্রায় ইতিহাস গ্রন্থ প্রণীত হইয়া থাকে। একত শতধাপদ বিপ্লবময় জাতীয় জীবনের সকল বিষয় তৎতৎ সময়ে যথাযথ লিখিয়া রাখা কঠিন, আর যদিও লেখা থাকে ত বিজয়ী মূর্খ জাতির দ্বারা সেসব নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সত্যপ্রিয়, স্বাধীন চেতা লেখকে প্রায়ই ইতিহাস লিখিতে সাহসী হন না, কারণ সমসাময়িক রাজাদিগের দোষগুণের কথা বিচার করিতে গেলেই তাঁহাদের বিষনয়নে পড়িতে হয়। এইত আজকাল এত স্বাধীনতা এত নির্ভিকতা; কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকের মধ্যে কয়জন উচিত বক্তা আছে। সে দিনকায় সিপাহী বিদ্রোহের বিষয় লইয়া কয়জন ইংরাজ ঐতিহাসিক সত্য এবং উচিত কথা লিখিয়াছেন? কেহই নহে। তবেই বুঝাগেল যে যে পদবীতে ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তাহার কোন উদ্দেশ্যই সম্যক সাধন করিতে উহা যোগ্য নহে। বিরাট সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মনুষ্যকীট কতটুকু প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারে, অপ্রতিহত শক্তি প্রবাহে মানব কতদূর ভাসিয়া যাইতে পারে, অনাদিকাল হইতে মানুষ এমন উধাও হইয়া পাগলের ন্যায় কোথায় ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কোন জগদ্দুর্লভ সামগ্রীর জন্য জীব এমন আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া উঠে; ইতিহাস এই সকল সমস্যাভঞ্জন করিতে পারে নাই পারিবেও কি না জানি না।

আমাদের পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণ লোক শিক্ষার জন্য, সমাজকে পরিপুষ্ট এবং চিরজীবী করিবার জন্য এক অপূর্ব্ব সামগ্রী রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইতিহাসের সকল উদ্দেশ্যই সাধন হইয়াছে এবং তজ্জনিত অন্যান্য দোষ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। আমাদের পুরাণেতিহাস অষ্টাদশ মহাপুরাণই এই অমুল্য মহারত্ন। স্বয়ং বেদব্যাস যাহার লেখক, শুকাদি সাধক শ্রেষ্ঠগণ যাহার বক্তা তাহা হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আপ্ত বাক্য রূপ গৃহীত হইবে। তাহার ঐতিহাসিক সত্যাসত্যের উপর কেহই সন্দেহ করিবে না। যেখানে পুরান কথা,

উদ্ভট কথা লেখা আছে, সেই খানেই লোক বুঝিবে যে কোন গুপ্ত শিক্ষণীয় বিষয় অর্থবাদের ভিতরে, উপমার আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের মধ্যে কোন একটা গুণ আদৌ বিকশিত হয় নাই, এবং সেই গুণ বিশেষের অভাবে ঐজাতি ধীরে ২ অবনতি পথে অবতরণ করিতেছে। জাতিয় জীবনে সেই অনুপস্থিত গুণটি অনুস্যূত করিতে হইলে মহৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা উহার প্রচার করা বিধেয়; কারণ দৃষ্টান্ত ব্যতীত জাতীয় শিক্ষা হয় না। আবার বিজাতীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার ব্যাখ্যান করিতে গেলে অনিষ্ট ব্যতীত কখনই ইষ্ট হয় না। স্বজাতীর মধ্যে বৈদেশিক ভাব আসিয়া প্রবেশ করে-জাতীকে প্রকৃতিচ্যুত করে। সুতরাং একটা মনগড়া উপকথা সৃষ্টি করিয়া জাতীয় কোন মহাপুরুষে সেই গুণ বিশেষের আরোপ করিয়া তাহার শিক্ষা দিতে হয়। ভক্তিমান, বিশ্বাসী শ্রোতা পবিত্র চিত্তে তাহা গ্রহণ করিলে, ধীরে ২ কথাংশটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণাংশ টুকু তাহাদের মন মধ্যে গ্রথিত হইয়া যায়। হরিশ্চন্দ্রের সত্য প্রিয়তায় আমরা বিমুগ্ধ, সুধন্বার আত্মত্যাগে আমরা বিস্মিত, কর্ণের দান শৌণ্ডতায় আমরা চমকিত হইয়াছি। কথা ভাগ কেহ দেখে না, কথা ভাগের কেহ পর্য্যালোচনা করে না। তবে একটা কথা আছে যে যে জাতির অতিত বৃত্তান্ত নাই, সে জাতি অধিকদিন জীবিত থাকিতে পারে না। কেবল উপকথার সহিত নৈতিক শিক্ষা দিলে জাতীয় উপকার বড় হইবে না, সকলকে সে সকলের ঐতিহাসিক ভিত্তি বুঝাইয়া দিতে হইবে। পুরাণ মাত্রেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আমাদের পাশ্চাত্য বিদ্যামার্জ্জিত বুদ্ধিতে অনেক পৌরাণিক কথাই আষাড়ে গল্প বলিয়া বোধ হয়।

ধর্ম্মোদ্যোগ।

কাশী—যোগাশ্রম।

কয়েক বর্ষ হইতে কুমার-পরিব্রাজক মহাশয় একটী একান্ত স্থানে থাকিয়া সাধন ভজন করিবার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত ছিলেন। কিছু দিন তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামীর নির্ব্বাণী মঠে বাস করিয়া নিজেষ্ট কার্য্য সাধন করিতেন; কিন্তু সেখানেও তাঁহার মনোমত নির্জ্জনতায় বাধা বিঘ্ন দর্শনে একটী স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল, অমনি একখণ্ড ভূমি-ক্রয় করিয়া আশ্রমের পত্তন করিলেন। দুঃখীর কুটিরের মত একটি ক্ষুদ্র আশ্রম করিয়া তথায় একাকী একান্তে থাকিয়া সাধন ভজন করিবেন এই অভিপ্রায়ে কুটির নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল।

স্থানটী কিরূপ?

কাশীর যে অংশ বিশ্বেশ্বরের অন্তর্গৃহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, মনোনীত স্থানটী তাহারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অন্নপূর্ণার মন্দিরের অদূরেই। এই স্থানটী বিশ্বেশ্বরের নিজস্বই ছিল। পরে তাঁহার পূজক গণ কর্ত্তৃক গয়াধামে ৺গদাধরের শ্রীপাদ পদ্মে ইহার সত্ব অর্পিত হইয়াছিল। গদাধরের পূজকগণ আবার প্রয়োজন বশতঃ এই ভূমি খণ্ড হস্তান্তর করেন। "যোগাশ্রম" জন্য ক্রীত ও প্রতিষ্ঠিত যোগেশ্বরীর চরণে অর্পিত হইয়া এই ভূমি খণ্ড আবার অন্নপূর্ণারই হইল। এটী আবার একটী সিদ্ধ স্থান।

যজ্ঞ কুণ্ড আবিষ্কার!

যোগাশ্রমে ভূগর্ভ গুহাখনন কালে মানব পরিমিত ভূমি নিম্নে বিভূতি পূর্ণ এক কুণ্ড ও ধুনী বাহির হয়। বোধ হয় কোন যোগীর নিভৃত নিলয় রূপে বহু বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান সাধকের দিব্য শক্তিপূত ছিল। কে জানিত, সেই ধরনী-গর্ভস্থ যোগাসন আজ আবার ব্রহ্ম সমাধির স্নিগ্ধ ক্ষেত্র হইবে। কে জানিত সেই যজ্ঞাগ্নির

স্থল। মা মা পূত বিভূতিরাশী আজ ভক্ত হৃদয়ের অন্তস্থল বাহিনী প্রেম মন্দাকিনীর পবিত্র ধারা বিধৌত হইবে!! ধন্য যোগেশ্বরী যোগমায়ার মহিমা!!!

আশ্রমটী কত বড় ?

আশ্রম নির্দ্ধন সন্ন্যাসীর উপযোগী, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট যোগ গুহা, মণ্ডপ, বেদি ও কূপেই পরিসমাপ্ত হইবারই সংকল্প ছিল। কিন্তু পরিব্রাজক মহাশয় প্রচার যাত্রায় প্রায়ই ভারতের দিগ্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ করায়, আশ্রম নির্ম্মাণ কার্য্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা হয়। তিনি এক দিকে কার্য্য আরম্ভ করিতে নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্থপতিগণ কিন্তু অন্য দিকে গাঁথিয়া ফেলিল। এই রূপে যেন বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াই আশ্রমটী একটু পরিসর হইয়া দাঁড়াইল। বলাবাহুল্য এবিষয়ে যোগী ব্যতীত কোনও শিল্পীরই অভিজ্ঞতা অসম্ভব। যোগমঠ যোগ শাস্ত্রানুসারে গঠিত হইয়াছে।

স্বল্প দ্বারমরন্ধ্র গর্ত্তপীঠরং, নাত্যুচ্চনীচায়তং।
সম্যগ্‌গোময় লিপ্ত সম্ভ্রমমলং কুর্য্যাম্মনোভীপ্সিতং
বাহ্যেকূপ বেদী মণ্ডপ রচিতং প্রাকার সম্বেষ্টিতং
প্রোক্তং যোগ মঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈর্যোগাভ্যাসিভিঃ

যোগমঠে একটী ভূগর্ভে গুহা চাই, তাহার দ্বারক্ষুদ্র হইবে, কোন দিকে ছিদ্র থাকিবে না, অনতি উচ্চ বা নীচ হইবে গুহাটি গোময় লিপ্ত, বিশুদ্ধ, আনন্দ প্রদ হওয়া চাই। বহির্দ্দেশে একটী কূপ বেদী ও মণ্ডপ এবং চতুর্দ্দিকে প্রাকার পরিবেষ্টিত থাকা চাই। যোগাশ্রমে এ সকলই রচিত হইয়াছে।

আশ্রমে অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা কেন হইল ?

আশ্রম যথারীতি সমাপ্ত প্রায় হইলে, সর্ব্বভূতের সমৃদ্ধি রূপিণী মা বলিলেন "যোগমন্দিরে বাছা তুমি একাকী না থাকিয়া আমার আশ্রিত হইয়া থাক।" তৎক্ষণাৎ আশ্রমের পূর্ব্ব দিকে প্রাচীরের গায়ে দেবী মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে, ভাণ্ডার ও ভোগ মন্দির নির্ম্মিত হইল। ভগবান্ যাহার সহায় তাহার অভাব কিসের ?

এত ব্যয় সংকুলান হইল কিরূপে ?

সমুদায়ে, যোগাশ্রম নির্ম্মাণে প্রায় পাঁচ সহস্র মুদ্রাব্যয় হইয়াছে। পরিব্রাজক মহাশয়ের প্রণীত গীতার ১ম সংস্করণ (৭৲ মূল্যের হাজার কপি), ভক্তি ও ভক্ত, পঞ্চামৃত, নীতিরত্নমালা প্রভৃতি পুস্তকের আয় হইতে প্রধানতঃ এবং তদ্ব্যতীত তাঁহার অনুগত ও অনুরাগী ভগবদ্‌ভক্ত গণের স্বতঃ প্রবৃত্ত আনুকূল্য হইতে এই গুরুভার সংকুলান হইয়াছে। নৃতবা নির্দ্ধন সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপ ব্যয় বাহুল্য ব্যাপার সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত ছিল। মা যাঁর সহায় তাঁহার আবার অভাব কি ?

কৃপাময়ীর প্রতিমা সজ্জা।

যখন মার যোগাশ্রমে আবির্ভাবের ইচ্ছা হয় তখন পরিব্রাজক মহাশয় অন্তর্যামিনীকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "মা এতো তোমার যে সে মূর্ত্তি নয়, এ যে মা তোমার রাজ রাজেশ্বরী মূর্ত্তি, আমার ন্যায় পথের ভিখারী এ জগন্মনমোহিনী মূর্ত্তি সাজাইবে কোথা হইতে ? যদি আসিতে চাহিয়াছ মা, তবে নিজেই সাজিয়া গুজিয়া যোগাশ্রমে আবির্ভূত হও, দুঃখীকে কৃতার্থ কর"। অমনি দেখিতে দেখিতে চারি দিক হইতে মার প্রেরণায় ভক্তগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কেহ বা স্বপ্নে মায়ের আজ্ঞা পাইয়া মাকে সাজাইবার ভার প্রার্থী হওতঃ পরিব্রাজক মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। মাস কালের মধ্যে মার পদ হইতে মস্তকের মুকুট পর্য্যন্ত স্বর্ণালঙ্কারের সমুদায় ব্যবস্থা হইয়া গেল। সত্য সত্যই মা রাজ রাজেশ্বরীর বেশে আপনিই দিব্যাভরণভূষিতা হইয়া আবির্ভূতা হইলেন; দুঃখ করিবার কারণ মাত্রও থাকিল না। ধন্য করুণাময়ীর করুণা ? ধন্য ভক্তগণ! তাঁদের সাধ এখনও মিটে নাই।

সেবা চলিবে কিরূপে ?

পরিব্রাজক মহাশয়ের ব্যাখ্যাত গীতাদি কতক গুলি পুস্তকের উপসত্ব মার চরণে অর্পিত হইল। তাঁহারই আয় হইতে মার সেবা চলিবে। ইহাতে সঙ্কুলান না হয়, মা আপনিই সমস্ত চালাইয়া লইবেন।

যোগাশ্রমের সত্বাধিকার।

যোগাশ্রম মায়েরই সম্পত্তি রহিল। মা সাধারণের; তাই ইহাও সাধারণের জন্য থাকিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের অবিদ্যমানে তাঁহার কৌলিক বা সাম্প্রদায়িক কোনও উত্তরাধিকারী এ সম্পত্তির সত্বে সত্ববান্ হইবেন না। ট্রষ্টীডিডের মর্ম্মানুযায়ী ইহা সাধারণের সম্পত্তিই থাকিবে।

প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প।

কোনও সাধু সংকল্পে পুণ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসী নিষ্কাম, স্বর্গাদি কামনা তাঁহার নাই, "সকল জীবের ধর্ম্ম বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়" এই সঙ্কল্পে ইহার প্রতিষ্ঠা। জগন্মাতা সকলেরই অন্তঃকরণে জ্ঞান ভক্তি বৃদ্ধি করিতেই যোগাশ্রমে আবির্ভূত।

প্রতিষ্ঠা।

আজ মহাষ্টমী, আজ মার প্রতিষ্ঠা। আজ মহোৎসব, তাই শরতের নির্ম্মল আকাশে সপ্তমীর চন্দ্র, কিশোর বয়স্ক বালার্কের মত কৌমুদীর খেলা করিতে ২ কুমুদিনীর হাসিমাখা মুখখানি দেখিতে ২ আবার স্বচ্ছ সরোবরে নিজের অমল ধবল মুখ খানি কুমুদের প্রতিবিম্বের সহিত মিলাইতে ২ যেন ক্লান্ত হইয়া অষ্টমীর উষার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহাষ্টমীর মহাক্ষণে মহামায়ার আবির্ভাব দেখিতে পাইবে কি না, যেন সন্দেহ করিয়াই বালারুণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া যোগাশ্রমের প্রাঙ্গনে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। প্রভাতেই না কি মার আশ্রমে আবির্ভাব, তাই অরুণের আঁখি এত প্রেমারুণ। অধিবাসের সময় ভক্তগণ মার প্রতিমাকে সাজাইয়া দিলেন। মার আগমনাকাঙ্ক্ষী হইয়া মন্দিরের চিত্ররূপে দেবগণ ঋষিগণ করযোড়ে ও কালদণ্ড হস্তে ভৈরব নাথ আজ মার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। জয়া, বিজয়ার হাসি আর ধরেনা। সিংহ ও বৃষভের প্রেমের মিলন। নন্দী ভৃঙ্গির তাই এত নৃত্য। এ দিকে মলয় পুণ্য গন্ধ হইয়া যত ফুলের পরাগ লইয়া আশ্রমের প্রাঙ্গনে মূর্ত্তিমান। যত সুকণ্ঠ পক্ষী আজ মার বাড়ীর চারি দিকে রাগ রাগিনীদের সঙ্গে ভারি আড়া আড়ি আরম্ভ করিয়াছে। যত দেশের ফুল আজ ডালায় চাপিয়া মাতৃ দর্শনে আসিয়াছে। পুণ্যতোয়া নদী সকল ঘটে ২, অগ্নি যজ্ঞ-কুণ্ডে। কাছাড়-শিলচর, কুচবিহার, শ্রীহট্ট-হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, রাজসাহী-বিলমাড়িয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কলিকাতা, বরাহনগর, বীরভূম-কুণ্ডলা, গুপ্তীপাড়া, বর্দ্ধমান, বোহার, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, খুলনা, বাঁকীপুর, লক্ষ্মীসরাই, মজাফরপুর, বক্সর, মোগল-সরাই, গয়া, গজা, মুরশিদাবাদ, রামপুরহাট, প্রভৃতি দূরাদ্দূরতর দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত এবং স্থানীয় ভগবদ্‌ভক্ত বৃন্দ বেদিকার চারিদিকে। অবধূত-শিষ্য নিষ্কাম সন্ন্যাসী আজি জাতি কুল গোত্রহীন হইয়াও জগতের হিত কামনায় যজমানের আসনে বসিয়াছেন; মাতৃ ভক্ত গণ আজ সর্ব্বত্রে সর্ব্ব কার্য্যে। চারিদিকে মঙ্গল বাদ্য, স্তোত্র পাঠ, সংকীর্ত্তন ও মন্ত্রধ্বনি। যাজ্ঞিক গণ এখন দেবভাষাতেই কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। মন্দির হইতে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তিদ্বয় প্রাঙ্গনের যজ্ঞ মণ্ডপে আনীত হইল। সকলের মস্তক ভূমি চুম্বন করিল। "যোগেশ্বরী" ও "যোগেশ্বর নাথ" নাম করণ হইল। এই উপলক্ষে রচিত পরিব্রাজক মহাশয়ের ৩টী গান গীত হইল। মায়ের আরতি ও ভোগান্তে নিমন্ত্রিত গণের প্রসাদ গ্রহণাবসানে মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপ্ত হইল। অনেকেই মহাষ্টমীর ব্রত করিয়া রহিলেন।

বিদ্বজ্জন সভা।

অপরাহ্নে কাশীস্থ শাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত বিদ্বন্মণ্ডলীর

সমাবেশ। প্রথমে মৃগাজিনোপরি আসনসম্বদ্ধ যজুর্ব্বেদীগণ যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র সকল উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরে পাঠ করিলে পর, বায়ুমণ্ডল স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়া সামগায়ী সুস্বর লহরী তরঙ্গে আকাশ পরিপূর্ণ করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় পাশ্চাত্য শিক্ষার তরঙ্গে কিরূপে আমাদের ধর্ম্মের হানি হইতেছে, তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক সকল এবং কতিপয় সংবাদপত্র ও পুস্তক দ্বারা আমাদের ধর্ম্মের কিরূপ অবমাননা হইতেছে, তাহাও দেখাইলেন। অবশেষে কাশীস্থ সমুদয় প্রধান২ পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। আর্য্য ধর্ম্মের গ্লানিকর পুস্তক পাঠ ও সংবাদ পত্র যাহাতে হিন্দুগণ গ্রহণ না করেন, তজ্জন্য ধর্ম্ম সভা মাত্রেরই—হিন্দুমাত্রেরই প্রযত্ন প্রয়োজন, ইহাই সর্ব্ববাদী মতে নির্দ্ধারিত হইল। পরে মাল্য চন্দন মিষ্টান্ন মুদ্রাদি সহ পণ্ডিত বিদায় ও প্রতিমা সন্দর্শনান্তে সভা ভঙ্গ হইল। সন্ধ্যার পর মহাষ্টমীর মহাপূজার মহানন্দ পড়িয়া গেল। ভক্ত গণ পূজান্তে মহানন্দে মহামায়ার মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। দীনদুঃখী গণ মহাভোজনে পরিতৃপ্ত হইল। কয় দিন ধরিয়া মহানন্দ তরঙ্গ বহিল। জয় যোগেশ্বরী! মা, এক্ষণে ভারতের প্রাণরূপিণী হইয়া ভারতকে নিজ শক্তি যোগে অনুপ্রাণিত কর। তোমার যোগাশ্রমের জয় হউক।—

শ্রী পাঁচকড়ী রায়।

ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহাধিবেশন।

ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী) ২৯এ কার্ত্তিক হইতে ৩ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।

শকাব্দা ১৮১২।

যে ইন্দ্রপ্রস্থে মহাসভা রচনা করিয়া ধর্ম্মরাজ মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বর্গের চরণ প্রক্ষালন করিয়া মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম রাজের রাজধানীতে ধর্ম্মেরই মহাবিজয় পতাকা উড্ডীন ছিল, যেখানে বহুতর বীরবর্গ ও সম্রাটগণ নিজ নিজ সিংহাসন স্থাপন করিয়া সমস্ত ভারতের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, সেই ইন্দ্রপ্রস্থে আজ ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যের পুনরভ্যুদয়ের নিমিত্ত প্রযত্নাতিশয়পূর্ণ ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহাধিবেশন হইল; ইহা দেখিতে শুনিতে ও বলিতে হিন্দু-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। বঙ্গ, বিহার, পশ্চিমোত্তর আসাম, আদি প্রদেশীয় বহুল আর্য্য সভা, ধর্ম্ম সভা, হরি সভার সহযোগীতায় "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" কয়েক বর্ষ হইতে যে মহদ্ব্যাপারের সূচনা ঘোষণা প্রচার ও বিস্তার করিয়া আসিতেছেন, এবং বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভা যেরূপ মহাসমিতি সংগঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল তত্তাবতেরই বিশেষ বিকাশ বলিতে হইবে। মহামণ্ডলের সহযোগী সম্পাদক মহাশয় কুমার-পরিব্রাজক মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই রূপ লিখিত ছিল, "মহাত্মন্! আপনি বঙ্গ বিভাগে যে ধর্ম্ম ভাবের মহোত্তেজনা করিয়া লোক সকলকে স্বধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই মহা আন্দোলনে যে মহা তরঙ্গ এই সুদূর প্রান্তে উত্থিত হইয়াছে, তাহা একবার আসিয়া দেখিয়া যান্, আমরা কৃতার্থ হইব"। বস্তুতঃ মহামণ্ডলের মহাধিবেশন হিন্দু সমাজের আশাপ্রদ হইয়াছে।

দিলীস্থ রেলওয়ের যমুনা সেতুর সন্নিকটে যমুনার পবিত্র তটে মহামণ্ডলের মহাধিবেশন জন্য মহামণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। নানা বর্ণের ধ্বজা পতাকা অনেক দূর লইয়া শূন্য মণ্ডলকে সুশোভিত করিয়াছিল। প্রথম দ্বারে বিজয় বাদ্য ও কিঞ্চিদ্দূরে শুভ কার্য্যের বিঘ্ন বিনাশনার্থ ২৪০০০ গায়ত্রীর পুরশ্চরণ হোমাদি হইয়া-

ছিল এবং নিকটে মিষ্টান্নাদি বিক্রয়ের মেলা বসিয়াছিল। সুবৃহৎ শুভ্র চন্দ্রাতপ রঞ্জিত ঝালরে, শতাধিক স্তম্ভ রঞ্জিত বস্ত্র, পল্লব, পত্র, পুষ্প, ও জরোয়া কারু কার্য্যে, ঝাড় লণ্ঠনে ও সুবিস্তীর্ণ আস্তরণ বিস্তারে স্থান অতি বিকশিত হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণের পীপাসার জল পানাদির জন্য স্বতন্ত্র সদ্ব্যবস্থা ছিল। দ্বাদশ সহস্র লোক একত্রে সুখে উপবেশন করিতে পারে এইরূপ বিস্তীর্ণ ভূমি বেস্টন করিয়া মহামণ্ডপ বিরচিত হইয়াছিল। মহামণ্ডপাভ্যন্তরের উত্তরাংশে উচ্চ বেদির উপরে স্বর্ণছত্র, দণ্ড, চামরাদি শোভিত এক খানি রজত সিংহাসনে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র রাক্ষিত ছিল। প্রত্যহ ধূপ দীপ চন্দন পুষ্পাদির দ্বারা এতাবতের পূজা হইত। সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ভরতপুর, বিকানির আদি মহারাজা বর্গের গুরু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গোস্বামী দেবকী নন্দন আচারী মহাশয়ের ও অন্যান্য রাজ প্রতিনিধি বর্গের এবং বাম পার্শ্বে কাশীস্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিব কুমার শাস্ত্রী ও দিল্লীপ্রান্তের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীধর শাস্ত্রী আদির জন্য শোভিতাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। মণ্ডপের মধ্যস্থলে বক্তা ও ব্যাখ্যাতা গণের স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। এই স্থানে সভাপতি সম্পাদক ও বক্তা ব্যাখ্যাতাদি উপবেশন করিতেন। এই মহাধিবেশনে ভারতের দিগ্দিগন্ত হইতে রাজা, জমিদার, সর্দ্দার, শেঠ, সাহুকার, সভ্য, শিক্ষিত, সুপণ্ডিত, সদুৎসাহী ব্যক্তি বর্গের সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যহ মধ্যাহ্ন কাল হইতে সূর্য্যাস্ত সময় পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের অধিবেশন ও অনুষ্ঠান হইত। সকল লোকের মূর্ত্তিতেই তখন উদ্যম, উৎসাহ ও উল্লাসের চিহ্ন সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছিল। ধর্ম্ম প্রাণ ভারতের ধর্ম্মোৎসব যে কি সুখের সামগ্রী, তাহা প্রত্যেক হিন্দুরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই মহাধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই ধর্ম্মোৎসাহী শিক্ষিত লোক সকল সমবেত হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ধর্ম্ম সভা সমূহ হইতে প্রায় ৪০০ শিক্ষিত ভদ্র লোক আসিয়াছিলেন—

লাহোর, অমৃতসর, গুজরানওয়ালা, জণ্ডিয়ালা, জলন্দর, কপুরথলা, ফিরোজপুর, জগাদ্রি, ফরকনগর, বেরি, রহতক, ঝঝর, রেওয়াড়ি, ভওয়ানি, সোনপথ, ভাদোয়ালি, ভারোরি, কড়ৌলি, লখনা, বৈহরণ, কর্ণাল, মথুরা, আগ্রা, হাত্রাস, ভরতপুর, কামবন, আলিগড়, খ্যাড়, গোমথ, কেয়ারালা, কান্দোলা, বুড়োনা, ডাসনা, মিরাট, সাসনি, বেরিলি, পিলিভিত, বাদাওন, তিলহর, দেরাডুন, মুরদাবাদ, কাশীপুর তড়াই, মুরথল, আলোয়ার, জয়পুর, উদয়পুর, আজমির, পুস্কর, বাঁদিকুই, শিমলাপাহার, হরিদ্বার, সারহিন্দ, আরা, দ্বারভাঙ্গা, কাশী, বোম্বাই, কানপুর, ভাটিয়ালা, কাসগঞ্জ, আর্চসরা, রাজসাহী, বঁসোদি, অচনিরা, করৌলি আদি অশীতি সংখ্যক স্থান হইতে।

নিম্ন লিখিত সুপ্রসিদ্ধ মহোদয়গণ নানা কার্য্যানুরোধে স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ ও মণ্ডলের কার্য্যার্থ পূর্ণ হৃদয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পত্র ও বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা সংবাদ দিয়াছেন—

মহারাজা কাশী-নরেশ, মহারাজা দ্বারভাঙ্গা, রাজা হরবংশসিংহ-লাহোর, কুমারদোবে লক্ষ্মীনারায়ণ বিএ আলিগড়, দেওয়ান রামযশ সি, আই, ই কপুরথলা, দেওয়ান পান্নালাল সি, আই, ই উদয়পুর, দেওয়ান ফতেলাল মেহতা-উদয়পুর, দেওয়ান মিশ্র অশ্রুগল-কপুরথলা, দেওয়ান মথুরাদাস-কপুরথলা, সর্দ্দার সার আতর সিং কে-সি-এস্-আই, লুধিয়ানা, সেট লছমন দাস, সি-আই-ই মথুরা, লালা ঈশ্বর দাস—অমৃতসর, লালা হরভজরায়—জলন্দর, বাবু শিব বকস্ বগলা-পিঁজরা পুল কলিকাতা, পণ্ডিত মদন মোহন মালবী বি, এ—এলাহাবাদ, কাশী-পণ্ডিত সভা ইত্যাদি—

প্রথম দিনের মহাধিবেশন।

[মণ্ডপে লোক সংখ্যা প্রায় ৩০০০।]

প্রথমে গণেশাদি দেবতার পূজা ও বৈদিকগণের বেদ মন্ত্র দ্বারা সভার মঙ্গলার্থ শুভাশীর্ব্বাদ গান হইয়া গেলে জলন্দরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রীর প্রার্থনানুসারে ও সকলের সম্মতি ক্রমে কাশীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়কে "ধর্ম্ম মণ্ডলের" আচার্য্য এবং রাজগুরু শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দনজীকে অধ্যক্ষের পদে বরণ করা হইল। অত:পর শ্রীযুক্ত শিবকুমারজীর অনুরোধে ও সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে আমাদের হিন্দুকুল-ভূষণ তাহিরপুরাধীশ শ্রীযুক্ত রাজা শশী-শেখরেশ্বর রায় বাহাদুরকে মণ্ডলপতি পদে বরণ করা হইল এবং মণ্ডল-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দীন দয়াল শর্ম্মা তাঁহার গলে মাল্য দান করিলেন। রাজা সাহেব এই মহামণ্ডলের মহদুদ্দেশ্য ও কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পণ্ডিত শিবকুমারজী সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। প্রথম দিনের কার্য্য এই রূপেই শেষ হইল।

দ্বিতীয় দিনের মহাধিবেশন।

[মণ্ডপে লোক সংখ্যা প্রায় ৫০০০।]

প্রথম দিনের ন্যায় পূজা ও পুষ্প বর্ষণাদি হইয়া গেলে অমৃতসরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালীদত্ত মহাশয় বাগ্বিস্তারে বুঝাইয়া দিলেন যে অধুনাতন দ্বিজাতি বর্গের মধ্যে গর্ভাধানাদি সংস্কার রাশি ক্রমশ: অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সংস্কার বিহীন পুত্রাদি পূজা পিণ্ডদানাদির অনধিকারী, বৈধ সংস্কারাদি যথোচিত পুনঃপ্রচলিত না হইলে হিন্দুয়ানি বিলুপ্ত হইবে। যেন দিগ্দেশীয় সভা সমিতি ও পণ্ডিত মণ্ডলী সর্ব্ব সাধারণ্যে এই সংস্কার পদ্ধতি পুনঃ প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই তাঁহার অনুরোধ। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী এই মতে পুষ্টি পোষণ করিলে পর মাণ্ডলিক মাত্রেই তাহাই স্বীকার করিয়া লইলেন। বস্তুতঃ যথাবিধি সংস্কারের দিকে হিন্দু মাত্রেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

অতঃ পর মথুরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দকিশোরদেব মহোদয় প্রস্তাব করিলেন যে বিবাহাদি সংস্কার ও স্ত্রী-সমাগম কাল নির্ণয় লইয়া আজ কাল মহা আন্দোলন চলিতেছে, গবর্ণমেণ্ট্ আমাদের ইদৃশ ধর্ম্ম বিষয়ে কোন রূপ হস্ত ক্ষেপ না করেন, তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। আজমিরের পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী এই মতের পরিপোষণ করিলে শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহার উত্তেজনা ও যুক্তি জাল পূর্ণ জলন্ত হিন্দী ভাষায় অনতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা করিলেন; দেখাইলেন—ধর্ম্ম বিষয়ে রাজকীয় হস্ত ক্ষেপ হইলে ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ লোকের কত ক্লেশ হইবে, বুঝাইলেন—মল-বারি আদি হিন্দু ধর্ম্ম বিরোধী বর্গের যুক্তি কিদৃশ অসার, এবং প্রত্যেকের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, যে এই অসার বাদী বৃন্দের কথায় গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত ও তদনুসারে আইন প্রচলন করিবার পূর্ব্বে হিন্দু সাধারণ সমীপ হইতে এক খানি প্রতিবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সভায় মলবারির মতপোষকও অনেকে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এই ধর্ম্মোদ্দীপনা ও সদ্যুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহাদেরও চিরপোষিত মত বিদুরিত হইল। তদনন্তর আলিগড়ের উকিল মুন্সী শ্রীযুক্ত বনওবারি লাল এই ব্যবস্থার পোষকতা করিলে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গবর্ণমেণ্টকে এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত করা অবধারিত হইল। লণ্ডন টাইমস্ পত্রে মহা মণ্ডলের এই সিদ্ধান্ত মুদ্রণার্থ সমাচার তারে প্রেরিত হইল। ২ দিন পরে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর শিমলা হইতে কলিকাতাভিমুখী যাত্রা কালে দিল্লীতে আসিয়া কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মহামণ্ডল হইতে ভাইসরয়ের প্রাইবেট সেক্রেটারীর নিকট মণ্ডল-পতির স্বাক্ষরিত নিম্ন লিখিত পত্র খানি প্রেরিত হইয়াছিল।

TO

THE PRIVATE SECRETARY

To H. E. Viceroy and Governor General of India.

SIR,

Inclosed herein I beg to send a copy of the Resolution II. passed at the meeting of the *Bharat Dharma Maha Mandal*, composed of representatives and Pandits of all Provinces of India, held in this city, on the 15th instant. I request you to be kind enough to lay this paper on the table of His Excellency The Viceroy for His Excellency's kind perusal.

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient servant,

(Sd.) Shoshi Shekhoreshwar Roy.

Bharat Dharma Maha Mandal, Office, *Delhi, November, 18th 1890.* — *President of The Bharat Dharma Maha Mandal.*

RESOLUTION II

Resolved—that this *Bharat Dharma Maha Mandal*, looks with indignation to the movement set on foot by men who are not Hindoos anent marriage reforms and that this Maha Mandal strongly protests against Government interference in socio-religious matters such as raising the age of consent &c.

(Proposed by Pandit Nand Kishore Dev of Muthra and seconded by Pandit Gauri Shankara of Ajmere, Kumar Srikrishna Prasanna Paribrajaka of Benares, and Munshi Banwari Lal, Pleader of Aligarh.)

অবশেষে আজমিরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পীতাম্বর শর্ম্মাজী সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানে দেখাইলেন, যে শুল্ক লইয়া কন্যাদানাদি নিতান্ত শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অতএব এ প্রথা যাহাতে হিন্দুসমাজ হইতে উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ভরতপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র শর্ম্মাজীর পোষকতায় ও সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে এবং পণ্ডিত শিবকুমারজী আদির ব্যবস্থায় ইহাই মহামণ্ডলের সিদ্ধান্ত হইল যে পুত্র বা কন্যার বিবাহ কালে বৈবাহিক পক্ষ হইতে ধন গ্রহণ করা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ আমাদের দেশের পাশ করা ছেলের বাপ মা যদি এই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে হিন্দু পরিবারের অনেক অশান্তি বিদূরিত হয়। দ্বিতীয় দিনের কার্য্য এই খানেই শেষ হইল।

তৃতীয় দিনের মহাধিবেশন।

[মণ্ডপে লোক সংখ্যা প্রায় ১০০০০।]

প্রথমে দেবাদির পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলে লাহোরের "মিত্র বিলাস" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ অতি সুমধুর উর্দ্দু ভাষায় ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রত্যেক সভাসমিতিকে উত্তেজনা পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন এবং যাহাতে স্বধর্ম্মানুগত অনুষ্ঠান আদি অব্যাহত ভাবে পরিচালিত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য সকলকেই উদ্যত হইতে অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর কপুরথলার সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুবর দয়াল বেদান্ত ভূষণ মহাশয় ইহার যথোচিত পোষকতা করিলেন। হিন্দু মাত্রেরই ইহা প্রণিধান পূর্ব্বক সদাই দেখা কর্ত্তব্য, যেন স্বধর্ম্ম স্বত্ব বা সামাজিক স্বত্ব স্বেচ্ছাচার বা রাজনৈতিক কুবাতাসে উড়িয়া না যায়।

অতঃপর সুবিখ্যাত "শতাবধানী" অন্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গট্টুলালজী মহাশয় সংস্কৃত ও দেবনাগরী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য সুমিষ্ট ভাষায় সকলকে উদ্যত

হইতে উৎসাহিত করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত 'কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার ও বেদ বিদ্যার পুনরভ্যুদয় ব্যতীত যে আমাদের সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুন্ন থাকিতে পারে না, বৈদিক অপৌরুষেয় শব্দগত শক্তির সঞ্চার হইলে হৃদয়ের পবিত্র ভাব যে আপনা আপনি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণের হস্তে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ভার ছিল বলিয়াই যে সনাতন ধর্ম্ম কথা এখনও পর্য্যন্ত ভারত হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা সরস হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা করিলেন। পণ্ডিত দীন দয়াল এতাবতের পুষ্টি পোষণ করিলে পর ভরতপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রজী, অমৃতসরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বুলাকী রাম শাস্ত্রী, লাহোরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতিজী, কাশীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবকুমারজী ও আলিগড়ের উকীল শ্রীযুক্ত মুন্সী বনোয়ারি লাল শোলা—কেহ হিন্দী ভাষায় কেহ সংস্কৃত ভাষায় কেহ বা উর্দ্দু ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর ভগবন্নামের জয় জয় ধ্বনি করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

চতুর্থ দিনের মহাধিবেশন।

[মণ্ডপে লোক সংখ্যা প্রায় ১০০০০]

পূজাদির অনুষ্ঠান শেষ হইলে রাজপুতানার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম চন্দ্র জী ও পণ্ডিত রঘুবর দয়াল সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ সাধনের অনুকূলে এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অবশ্যাবশ্যকতা পক্ষে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক যুক্তি দ্বারা দয়ানন্দী দলের অসার মত মর্দ্দন করিয়া দিলেন, তৎপরে আবার গোস্বামী কিশোরী লালজী হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত ভাষার বিস্তারাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। এতদনন্তর বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় বক্তার আসনে দণ্ডায়মান হইলেন, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অমনি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহার হৃদয়াকর্ষিণী ভাষায় সংস্কৃত বিদ্যার বিপুল চর্চ্চার জন্য ধনাঢ্য প্রধান দিল্লী সহরে একটী সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া ভারতীয় ধর্ম্মোদ্ধারার্থ গলদশ্রুনেত্রে সকলকে বদ্ধ পরিকর হইতে অনুরোধ করিলেন। শুভক্ষণে সুসমাচার প্রচারিত হইল, সভাস্থ সুজন গণের হৃদয় আর্দ্র হইল। অমনি পণ্ডিত দীন দয়ালজী সাহায্যের স্বাক্ষরার্থ কাগজ বাহির করিলেন, কয়েক মিনিটে সভা মধ্যেই প্রায় ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইল, অবশিষ্ট আবশ্যকীয় টাকা শীঘ্রই উঠিবার সম্ভাবনা।

পরিশেষে মণ্ডলাধীশ শ্রীযুক্ত রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের প্রসঙ্গানুসারে মণ্ডলের মহামন্ত্রী পণ্ডিত দীন দয়ালের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে ইহাই স্থির হইল যে আগামী বর্ষে কার্ত্তিক মাসে ভারতের সর্ব্বদেশীয় সনাতন ধর্ম্ম সভার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপ মহাধিবেশন কাশী ক্ষেত্রে হইবে। অদ্য যমুনা তটে মহামণ্ডলের কার্য্য শেষ হইল।

পঞ্চম দিনের অধিবেশন।

[উপস্থিত, বিদেশাগত ভদ্রমণ্ডলী ও স্থানীয় সম্ভ্রান্তবর্গ]

মহামণ্ডলের নিয়মিত কার্য্যারম্ভ হইলে মণ্ডলাধীশ সুমধুর ভাষী শ্রীযুক্ত রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর মাণ্ডলিক বর্গের ও দিল্লী নিবাসী গণের সযত্ন ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া ও সুযোগ্য সম্পাদক দীন দয়ালজীর সদুদ্যম পূর্ণ অনুষ্ঠান জন্য এবং পণ্ডিত বর্গের উৎসাহ পূর্ব্বক সমাগম হেতু ধন্যবাদ ও সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে পণ্ডিত বর্গের বহুসম্মাননা পূর্ব্বক বলিলেন, যাহাতে ধর্ম্ম ভাবের উন্নতি দ্বারা ভারতের মুখ পুনরুজ্জ্বল হয় তজ্জন্য সকল সুপণ্ডিতেই চেষ্টা করুন। ত্রিশতাধিক পণ্ডিত যেখানে উপস্থিত, সেখানে সকলের মুখে আমরা উপদেশ শুনিবার অবকাশ পাইলাম না এজন্য রাজা বাহাদুর দুঃখ প্রকাশও করিলেন। আর ইহাও বলিলেন যে দিগ্‌দিগন্ত বাসী সাধু সন্ন্যাসী,

পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত বিষয়ী দিগের মধ্যে এই মহামণ্ডল স্বরূপ কার্য্যক্ষেত্রের একটী কেন্দ্রস্থান স্থির করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। অতঃপর দ্বারবঙ্গাধীশের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যনাথ ঝাঁ বিএ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত গোপীনাথ জীর অনুমোদনে ও সকলের সম্মতি ক্রমে ইহাই স্থির হইল যে ভারত বর্ষের সর্ব্ব স্থানীয় সনাতন ধর্ম্মসভাকে পত্র লেখা হউক যে তাঁহারা ভারতের কোন্ স্থানে ভারতধর্ম্ম-মণ্ডল বা সভার কেন্দ্রস্থান করিতে চাহেন এবং দশ জন ব্যক্তিকে ট্রষ্টী হইবার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া দেন।

সভাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে "শতাবধানী" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গট্টু লালজীর ১১ ভাষায় অবধান, বহুল সমস্যা পূরণাদি হইল। তাঁহার অদ্ভুত শক্তি দর্শনে সকলেই মোহিত হইলেন। রাজা বাহাদুর তাঁহাকে একটি ১৫০৲ টাকা মূল্যের হীরকাঙ্গুরি ও অপর এক জন একটি ঘড়ি দান করিলেন এবং মহামণ্ডল হইতে "ভারত মার্ত্তণ্ড" [আব ত্মাবে হিন্দ-Sun of India,] উপাধি প্রদত্ত হইল।

পরিশেষে সম্রাজ্ঞীর বিজয়ধ্বনি, মহামণ্ডলের জয়-ধ্বনি ও ভগবানের জয় জয় ধ্বনি করিয়া সকলে বিদায় লইলেন।

কোন ২ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে মহামণ্ডলে রৌপ্য সিংহাসন খানি ভারত সম্রাজ্ঞীর সম্মানার্থ রক্ষিত হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহা নহে। উহাতে সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল পরিরক্ষিত ও অর্চ্চিত হইয়া-ছিল। "ইণ্ডিয়ান মিরার" আদি কতিপয় সমাচার পত্রের সংস্কার যে মহামণ্ডলে ইংরাজি শিক্ষিত একজন মাত্র উপস্থিত ছিলেন, এটি সম্পূর্ণ ভ্রম, আমরা বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছি যে স্থানীয় ও বিদেশাগত প্রতি নিধি বর্গের মধ্যে উচ্চ শ্রেণী স্কুলের হেড মাষ্টার, কলেজের প্রফেসর, উকিল, ডাক্তার, হাকিম, পত্র-সম্পাদক আদি ইংরাজি শিক্ষিত লোক অনেক ছিলেন। মিরার নাকি মূর্ত্তি উপাসক হিন্দু গণকে নগণ্যের মধ্যে ধরিয়াছেন। তবে কি বুঝিব, যে যাহারা রাম কৃষ্ণাদির পূজা করে না, জাতি ভেদ মানে না, হিন্দু মতে বিলাত যাত্রা করে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সদাচার আদি স্বীকার করে না, তাহারাই হিন্দু? মিরারে [দর্পণে] এরূপ বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

বীরভূম-কুণ্ডলা।

১৬ই হইতে ২০এ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত এখানকার হরি সভার ১ম বার্ষিক উৎসব অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য দেবতার পূজা, দান, দক্ষিণা, হরি সংকীর্ত্তনাদি অতি সুচারু হইয়াছিল। কুমার-পরিব্রাজক মহাশয় ৩ দিন বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। সহস্রাধিক নরনারী তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ণ ব্যাখ্যানে মন্ত্র মুগ্ধবৎ বিমোহিত হইয়া উপদেশ লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। সুশিক্ষিত দল হইতে তাঁহাকে দুই খানি শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল। গজার জমীদার পরম শ্রদ্ধাবান্ শ্রীমান্ দয়াল নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ রচিত একটি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ও শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় একটি বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃ বৃন্দকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। মান্যবর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জানকী নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ নাথ, ভোলানাথ ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, মহাশয় আদির যত্নে এই হরি সভাটি সংস্থাপিত ও রক্ষিত হইয়াছে। ইঁহাদের সাধু উদ্যোগে এখানকার অনেকের উপকার হইতেছে।

হালি সহর-প্রসাদ মেলা।

ভক্ত রাম প্রসাদ সেনের জন্মভূমি হালি সহর। একটি বনাকীর্ণ স্থানে "রাম প্রসাদের ভীটে" নামক তাঁহার বাসগৃহের মৃন্ময় স্তূপ বিদ্যমান, তৎসমীপেই

পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডের আসন অবস্থিত। হালিসহর "পূর্ণিমা ব্রত সমিতির" বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত দীন নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহে এই মৃত ভূমিতে আবার মহাশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। ভক্ত বৎসলা ভক্তের নাম উজ্জ্বল করিবার জন্য বুদ্ধি রূপিণী হইয়া সাধু হৃদয় বৃন্দে প্রেরণা করিয়াছেন। দুই বৎসর হইতে ৺ কালী পূজার সময় এই স্থানে অট্টহাসিনী নৃমুণ্ডমালিনী, জগত্তারিণীর পূজা ও ধর্ম্মোৎসবাদি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবারও যথা-বিধি মহোৎসব হইয়াছিল। উৎসবে বহু শিক্ষিত ভদ্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। কুমার-পরিব্রাজক মহোদয়ও ভক্ত প্রসাদের সাধন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দুই দিন জ্ঞান ও ভক্তি মাখা বক্তৃতা করিয়া পবিত্র ক্ষেত্রের মুখ উজ্জ্বল ও শ্রোতৃ গণের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। মায়ের ষোপচারে পূজা, চণ্ডীর গান ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। সাধারণের সাহায্যে এ স্থানে একটি ৺ কালী মন্দির ও সম্মুখে নাট মণ্ডপ ও মায়ের নিত্য পূজার ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, আশা করি কোন হিন্দুই যথা সাধ্য সাহায্য দানে বিমুখ হইবেন না।

দিল্লী।

৪ টা ও ৫ই অগ্রহায়ণ দুই দিন ধরিয়া দিল্লী বর্ণা-শ্রম ধর্ম্ম বর্দ্ধিনী সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাঁকে লাল গোস্বামীর প্রযত্নে এই সভাটী স্থাপিত হয়, অনেক প্রধান ২ ব্যক্তি ইহার পরি-পোষক আছেন। এই উৎসবোপলক্ষে প্রায় ৩০০০৲ টাকা মূল্যের সংস্কৃত শাস্ত্র পূর্ণ একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইল। সভায় বক্তৃতা ব্যাখ্যানাদিও অতি উত্তম হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ "শতাবধানী" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গট্টুলাল জী, পণ্ডিত শিব কুমার শাস্ত্রী, রাজা শশীশেখরেশ্বর, কুমার-পরিব্রাজক আদি প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি সভাস্থ ছিলেন।

গুপ্তিপাড়া।

বিগত ৯ই কার্ত্তিক শনিবার হইতে ১১ই কার্ত্তিক সোমবার পর্য্যন্ত গুপ্তিপাড়া ধর্ম্মসভার অষ্টম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে ও নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়দ্বয় ধর্ম্মবিষয়ণী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে আপ্যায়িত ও শান্তি রসে আপ্লুত করিয়াছিলেন। সভাস্থল দিগ্দেশীয় পণ্ডিত ও ভদ্র লোকের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। হরিনাম সংকীর্ত্তনের উত্তাল তরঙ্গে সকলের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল।

হিন্দুদিগের চিঠী লিখিবার কাগজ।

ভগবান্‌কে ছাড়িয়া হিন্দু হৃদয় কোন কার্য্যই করিতে ভাল বাসে না। খাইতে, শুইতে, বসিতে, যাত্রা করিতে হিন্দু ভগবানের নাম লইয়া থাকেন। পত্র লিখিতেও শ্রীহরিঃ শ্রীদুর্গাদি নাম লিখিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের প্রীত্যর্থে ভগবানের ভুবন মোহন মূর্ত্তির চিত্র (রাধা কৃষ্ণ, অন্নপূর্ণা, সরস্বতী, গণপতি আদি) ও সংস্কৃত শ্লোক সহ কাগজ মুদ্রিত করা হইয়াছে। প্রতি প্যাকেটে ৫ দিস্তা আছে, একাগজ বাজারের চিঠির কাগজ অপেক্ষা আকারে বড়, নির্ম্মল, চিক্কণ ও উৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি প্যাকেট।৴০ সাড়েচারি আনা, ও ডাক মাশুল দেড় আনা। আশা করি হিন্দু মাত্রেই চিঠির মধ্যে।৵০ ছয় আনার ডাক টিকিট "কাশী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষের নামে পাঠাইয়া এক বার এই চিঠীর কাগজ গ্রহণ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। চিঠী খানি লিখিবার সময় ও খুলিয়া পড়িবার সময় দেবদর্শন হইবে। ভক্ত হিন্দু! ইহা কত আনন্দ জনক! স্বর্ণের জল দেওয়া মূর্ত্তি ও শ্লোক এবং ছোট আকারের কাগজ বহু রকমেরও প্রস্তুত হইতেছে। প্রত্যেক প্যাকেট পাঁচ রঙ্গা কাগজ এবং শুদ্ধ সাদা কাগজও থাকিবে।

স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরই এই রূপ ক্রম জানিবে।

ক্রমশঃ।

বিদ্যা ও বিদ্যাবান্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

" তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ "

অর্থাৎ " বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং " ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬ষ্ঠ প্রপাঠকস্থ এই শ্রুতি বচন দ্বারাই কারণ হইতে কার্য্য যে অভিন্ন তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রুতি বলেন তোমরা যাহাদিগকে কার্য্য বলিয়া বুঝিতেছ, কার্য্য নামে যাহাদিগকে অভিহিত করিতেছ, সেই সমস্ত প্রতীয়মানসত্তাক কার্য্য সমূহের — সেই সকল উপলভ্যমান বিকার জাতের স্ব স্ব কারণ হইতে, নাম ছাড়া তত্ত্বতঃ কোন রূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কারণ হইতে তৎ কার্য্যের যে পৃথক্ সত্তা উপলব্ধি হয়, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় তাহা বিকল্প বৃত্তি মাত্র। বস্তু বস্তুতঃ নাই অথচ শব্দ জ্ঞানানুপাতিনী শব্দ শ্রবণ জনিতা অবিদ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব সূচক এক প্রকার মানস বৃত্তি, শব্দ শক্তি প্রসূত এক প্রকার মানস ভাব, শ্রূয়মান শব্দ-বাচ্য বস্তু যেন আছে আছে এই রূপ প্রত্যয় — চিত্ত মুকুর প্রতিবিম্বিত এই প্রকার ভ্রান্তির ছবি, ইহাকেই বিকল্প বৃত্তি বলে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আকাশ কুসুম নামে বস্তুত কোন পদার্থ জগতে বিদ্যমান নাই, তথাপি আকাশ কুসুম শব্দটি শুনিবা মাত্র, আকাশ-কুসুম নামে যেন কোন বস্তু আছে বলিয়া বোধ হয়; এই রূপ বোধ বিকল্প বৃত্তি জনিত। পদার্থ স্বরূপতঃ একটি, কিন্তু শব্দশক্তি তাহাকে দুইটি করিয়া গড়িয়া আমাদের মনের কাছে যে ধরে, বস্তু একটি হইলেও শব্দ প্রভাবে তাহাকে যে দুইটি বলিয়া বুঝা যায়, শব্দ প্রয়োগের গুণে তাহাকে যে দুইটি ভিন্ন বস্তু বলিয়া প্রত্যয় হয় তাহাও বিকল্প বৃত্তির খেলা। বিকল্প বৃত্তিই একটি বস্তুকে দুইটি করিয়া নির্ম্মাণ করে, আমাদিগকে ভ্রমে ফেলে। " পুরুষস্য চৈতন্যম্ " পুরুষের চৈতন্য, রাহোঃ শিরঃ—রাহুর শির, " শিলা-পুত্রকস্য শরীরম্ " শিলা পুত্রের শরীর ইত্যাদি শব্দ সকল শুনিবা মাত্র মনে হয়, পুরুষ ও চৈতন্য, পরস্পর বিভিন্ন দুইটি বস্তু, মনে হয় রাহুর সহিত শিরের, শিলা পুত্রকের সহিত তাহার শরীরের অবয়ব অবয়বী সম্বন্ধ, সুতরাং রাহুও যা তাহার শিরও তাই নয়, শিলা পুত্রক ও তাহার শরীর এক জিনিস নহে। ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি সাং দং ৬। ৩। আমরা, " আমার শরীর, আমার বুদ্ধি, আমার মন " এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি। যদি আমরা জানিতাম, আমি ও আমার শরীর, আমি ও আমার বুদ্ধি এবং আমি ও আমার মন এক অভিন্ন পদার্থ, তাহা হইলে আমরা কখনই আমার শরীর, আমার বুদ্ধি, আমার মন এই রূপ কথা বলিতাম না, তাহা হইলে এই প্রকার বাক্য ব্যবহার করিতাম না। অত্যন্তাভেদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না, স্ব স্বামি ভাবাদি ভেদাত্মক সম্বন্ধেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে, সুতরাং পুরুষাদি শব্দ যখন ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত, তখন, পুরুষাদি শব্দ প্রতিপাদ্য অর্থের সহিত চৈতন্যাদি শব্দার্থের — চৈতন্যাদি শব্দের অভিধেয়ের যে স্ব স্বামি ভাবাদি সম্বন্ধ আছে তাহা সহজেই মনে আসে। এবং সম্বন্ধ থাকিলেই ইহারা যে এক নয়— অভিন্ন পদার্থ নয় তাহাও নিশ্চিত, যে হেতু সম্বন্ধীর সহিত সম্বন্ধের ভেদ চির প্রসিদ্ধ ; " সম্বন্ধি ভেদ নিয়তত্বাৎ সম্বন্ধস্য, মঞ্জুষা "। অতএব দেখা গেল' সম্বন্ধি-সম্বন্ধের অভেদ অসম্ভব। " পুরুষস্য চৈতন্যম্ ইত্যাদি বাক্য শুনিবা মাত্রই ইহাদিগকে সম্বন্ধি-সম্বন্ধ ভাবে সম্বদ্ধ—পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে হওয়া সুতরাং অন্যায় বা নির্নিমিত্ত নহে। পুরুষ ও চৈতন্য, রাহু ও তাহার শির এবং শিলা পুত্রক (লোড়া) ও তাহার

শরীর যথা ক্রমে এক অভিন্ন বস্তু হইলেও ইহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে সম্বন্ধি সম্বন্ধ ভাব না থাকিলেও, যে ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, ইহাদিগকে যে সম্বন্ধি সম্বন্ধ ভাবে সম্বন্ধ বস্তু দ্বয়ের মত ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বস্তু একটি হইলেও শব্দ শক্তি যে তাহা দুইটি ভিন্ন বস্তু বলিয়া বুঝায়, শব্দ শক্তির প্রভাবে যে দুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মে তাহাও বিকল্প বৃত্তির ধর্ম্ম।

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ"।

পা দং

বিদেশীয় ন্যায় শাস্ত্রে 'Logic' যাহাকে Nominal definitions বলে, আমাদের বিকল্প বৃত্তির সহিত তাহার কতকটা মিল দেখা যায়। Nominal definition এর লক্ষণ এই--Those which define a term to which there is no really existent object corresponding. Thus the definition of a 'horse' would be called a real definition that of a 'centaur' a nominal definition. Deductive Logic Fowler P 55 কার্য্যের—বিকার বস্তুর কারণ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাম মাত্র, স্বরূপতঃ কারণ ব্যতিরিক্ত কার্য্য পৃথক্ কোন দ্রব্য নয়। "আকাশ কুসুম" কথা শুনিবা মাত্র যেমন তন্নামধেয় কোন পদার্থ আছে বলিয়া বোধ হয়, পুরুষের চৈতন্য, রাহুর শির, শিলা পুত্রকের শরীর ইত্যাদি শব্দ সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইলেই যেমন পুরুষ ও চৈতন্য, রাহু ও তাহার শির এবং শিলা পুত্রক ও তাহার শরীর ইহারা পরস্পর বিভিন্ন বস্তু বলিয়া ধারণা হয়, সেই রূপ "কার্য্য কারণ" শব্দ দ্বয় শ্রুতি বিবরে প্রবেশ করিলেই সাধারণতঃ মনে হয় কারণ হইতে কার্য্য স্বতন্ত্র বস্তু, মনে হয় কার্য্য নামক বস্তুর স্বকারণ হইতে পৃথক্ সত্তা আছে। কার্য্য কারণের পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন ২ সত্তা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইলেও, ইহাদের সম্বন্ধ পুরুষের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধের ন্যায় রাহুর সহিত তাহার শিরের সম্পর্কের ন্যায় ভেদমূলক সম্বন্ধ নহে, ইহাকে ব্যপদেশিবদ্ভাব কহে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" এই শ্রুতি বচনের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ এবং তদনন্যত্ব মারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ এই শারীরক সূত্রটিও ঐ শ্রুতি বচনেরই মর্ম্মব্যাখ্যাপক—ঐ মন্ত্রমূলক "বাচয়া কেবল মারভ্যতে বিকার জাতম্ ন তু তদ্বস্তোস্তি, যতো নামধেয় মাত্রমেতৎ, যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি রাহোঃ শির ইতি বিকল্প মাত্রম্" ভামতী। আমরা এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মহামূল্য ভাবগম্ভীর শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য আরও বিশদরূপে বুঝাবার চেষ্টা করি। ঘট-কার্য্যের কারণ—ঘট কার্য্যের প্রকৃতি—ঘট কার্য্যের যোনি মৃত্তিকা। মৃত্তিকা হইতেই ঘট, উৎপন্ন হইয়া থাকে, মৃত্তিকাই ঘটকে প্রসব করিতে সমর্থ। বস্ত্র একটি কার্য্য, তন্তু ইহার কারণ; তন্তু হইতেই বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য ঘটের উৎপাদক হইতে পারে না এবং তন্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু হইতেও বস্ত্র জন্মায় না। সহস্র চেষ্টাও মৃত্তিকা দিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিতে কখন সক্ষম হইবে না, বহু আয়াস এবং বিপুল শ্রমও তন্তু হইতে ঘট নির্ম্মাণ করিতে কদাচ পারগ হইবেনা। ঘট প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইলেই, আমরা, মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া থাকি। জগতে মৃত্তিকা হইতে মূল্যবান্, মৃত্তিকা হইতে সুন্দর অনেক জিনিসইত আছে। কিন্তু ঘট নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন তাহাদের দ্বারা সিদ্ধ হয়না। তাই ঘট নির্ম্মেচ্ছু হইয়া আমরা মৃত্তিকা হইতে মূল্যবান্ মৃত্তিকা হইতে রমনীয়, স্বর্ণ মণি মুক্তাদির কাছে না গিয়া ঘট নির্ম্মাণ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সুবর্ণাদির সংগ্রহ না করিয়া অকিঞ্চিৎকর হইলেও মৃত্তিকারই সংগ্রহ করিয়া থাকি। মৃত্তিকা যে ঘট নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম এবং তন্তুর যে ঘটোৎপাদন করিবার সামর্থ্য নাই ইহা আমাদের সকলেরই

জানা কথা। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মৃত্তিকার বস্ত্রপ্রসবসামর্থ্য এবং তন্তুর ঘট নির্ম্মাণ করিবার শক্তি নাই কেন? মৃত্তিকা দ্বারা বস্ত্র এবং তন্তু দ্বারা ঘট শরাবাদি প্রস্তুত করা অসম্ভব কি জন্য? আবার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট ও তন্তু হইতে পট নির্ম্মাণ করাই বা সম্ভব কি নিমিত্ত? ঘট যখন মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না এবং পট যখন তন্তু হইতে জন্মিয়া থাকে অন্য বস্ত্বন্তর হইতে জন্মায় না তখন আমরা ইহা দ্বারা এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, যাহা যাহাতে থাকে, যে দ্রব্য যে দ্রব্যের মধ্যে অবস্থিতি করে তাহা হইতেই সেই দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি এক বারে অসম্ভব। তিলে তৈল অব্যক্ত তৈল বিন্দু রূপে থাকে বলিয়াই তিল নিষ্পীড়ন করিলে তৈল পাওয়া যায়, কিন্তু শত সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বালুকা রাশি নিষ্পীড়ন কর, বিন্দুমাত্রও তৈল নির্গত হইবে না।

মৃত্তিকাতে ঘট বিদ্যমান ছিল, তন্তু সমূহের মধ্যে ঘট প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাই মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত হইল, তন্তু দ্বারা পট নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইলে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যের উপাদান বা সমবায়ি কারণ—কার্য্যের প্রকৃতি নিয়মিত. "উপাদান নিয়মাৎ" ১।১১৫ সাং দং "মৃদ্যেব ঘট উৎপদ্যতে, তন্তুম্বেব পট ইত্যেবং কার্য্যাণামুপাদান কারণং প্রতি নিয়মোস্তি" সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য। বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়-অভিব্যক্ত হয়। এই রূপ উপাদান-নিয়ম স্বীকার না করিলে, সকল দ্রব্য, সকল সময় সকল দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হওয়া উচিত হয়। কিন্তু তাহা কদাপি হয় নাই, হইতে পারেনা। আম্র বৃক্ষ কখন ফল প্রসব করে নাই, নারিকেল ক্রমেও কখন আম্র ফল উৎপন্ন হয় নাই। উপাদান-নিয়ম স্বীকার না করিলে বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অবির্ভাব হয়,-অভিব্যক্তি হয়, একথা না মানিলে, যাহা যাহাতে নাই তাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হইতে পারেনা এ প্রাকৃতিক তথ্যকে অশ্রদ্ধা করিলে, অগ্নি হইতে দুগ্ধ, জল হইতে দধি, দধি হইতে ঘট এই রূপ সকল দ্রব্য হইতে সকল দ্রব্যের উৎপত্তি হওয়া যে সম্ভব একথাও অস্বীকার করিবার যো থাকেনা। কিন্তু তাহা কি কখন হয়? অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, কার্য্য স্বকারণে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। মানিতেই হইবে, কার্য্য, কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কারণ রূপ অব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে।

ভগবান্ বাদরায়ণ, কার্য্য যে কার্য্য রূপে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে, কারণ ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে এবং কার্য্য যে কারণ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, অর্থাৎ কার্য্য কারণ হইতে যে অনন্য, এই সকল কথা বুঝাইবার জন্য নিম্নোদ্ধৃত সূত্র সকলের রচনা করিয়াছেন। "সত্বাচ্চাবরস্য" শাং সূ ২।১।১৬, যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ শাং সূ ২।১।১৭। সত্বাৎ চ অবরস্য। অবরস্য—কার্য্যস্য সত্বাচ্চ—বিদ্যমানত্বাচ্চ অর্থাৎ কার্য্য কার্য্য রূপে প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে বলিয়া + + + সূত্র হইতে আমরা এই পর্য্যন্ত পাইতেছি সূত্র হইতে ইহার অতিরিক্ত কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, সূত্রকার পূজ্যপাদ বেদব্যাস এই কয়েকটি কথার মধ্যে কত ভাব নিহিত রাখিয়াছেন, কত জ্ঞান বিজ্ঞান এই দুই তিনটি কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সূত্রের ভাবার্থ হইতেছে, কার্য্য, কার্য্য রূপে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, কার্য্য নাম রূপ গ্রহণ করিবার আগে যখন কারণাত্মাতে বিদ্যমান থাকে, তখন কারণ হইতে কার্য্য যে অনন্য-অভিন্ন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কার্য্যেরই সূক্ষ্মাবস্থায় অস্তিত্ব কারণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে অবর শব্দের অর্থ-

চরম—শেষ। কার্য্য কারণের চরমাবস্থা মাত্র। আমরা যাহাকে কার্য্য বলিয়া বুঝি, যাহাকে কার্য্য এই নাম দিই তাহা কারণের চরমাবস্থা। কথাটির তাৎপর্য্য এই, আমরা বর্ত্তমান অতীত ও অনাগত, বা ভবিষ্যৎ এই কথা কয়েকটি ব্যবহার করিয়া থাকি, এবং যখন সর্ব্বদাই ইহার ব্যবহার করিয়া থাকি তখন ইহার অর্থও সম্ভবতঃ আমাদের জানা থাকারই কথা। অর্থ আমরা যে জানি, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু ঠিক অর্থ ইহার যাহা, তাহা আমাদের মধ্যে সকলেরই জানা না থাকিতেও পারে, সুতরাং এই কথা কয়েকটির ঠিক অর্থ কি? তাহা আগে দেখা যাউক। বর্ত্তমান শব্দের অর্থ, আমরা যাহা জানি, সচরাচর যে অর্থে ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহা আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলেও ঠিক বলিয়া বোধ হইলেও, সূক্ষ্মদর্শী যোগীদিগের কাছে যথেষ্ট নহে। ত্রিকালদর্শী মহর্ষি দিগের নিকট বর্ত্তমান কথাটির সে রূপ অর্থ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। আমরা যে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করিতে পারি, তাহাদিগকেই বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকার করি, তাহাদেরই অস্তিত্ব আমরা মানিয়া থাকি। কিন্তু যাহাদিগকে দেখিতে পাই না, কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না, আমাদের বিবেচনায় তাহারা নাই। যাহাদের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে অক্ষম, তাহারা বস্তুত বিদ্যমান নাই এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নবাবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র সমূহ আজ যে সকল দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে তাহা দিগকে আমরা সৎ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; তাহারা আছে বলিয়া স্বীকার করা আমাদের উচিত হয় না। অতএব আমরা স্থূল দ্রব্য গ্রহণ পটু ইন্দ্রিয় সকলের কথা শুনিয়া সূক্ষ্ম দ্রব্য সমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও সূক্ষ্ম বস্তু সকল বাস্তবিক অসৎ হইয়া যায় না। যাহা আছে যাহা সৎ, তাহা থাকিবে তাহা কোন দিন অসৎ হইবার নহে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদি যখন আবিষ্কৃত হয় নাই তখন ত আমরা স্থূল চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম বস্তু সকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া ছিলাম, আমাদের কাছে, তখন ত উহারা অসৎ ছিল। অতএব কিছু দিন পূর্ব্বে যাহা নাই বলিয়া স্থির ছিল, সূক্ষ্ম দর্শন যন্ত্রাদি আজ সেই সকল বস্তুর সত্তা প্রমাণ করিয়া দিতেছে, সুতরাং আমরা যাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না তাহাই যে বাস্তবিক অসৎ, তাহাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান নাই তাহা নহে। বস্তু বস্তুত বিদ্যমান থাকিলেও বক্ষ্যমাণ ছয়টি অনুপলব্ধি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণ বিদ্যমান থাকিলে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না,—বিদ্যমান বস্তুর সত্তা অনুভব করিতে আমরা অক্ষম হই। "ষড়্‌ভিঃ প্রকারৈঃ সতাং ভাবানামনুপলব্ধি র্ভবতি। অতি সন্নিকর্ষাদতিবিপ্রকর্ষান্ মূর্ত্ত্যন্তর ব্যবধানাৎ সমাবৃতত্বাদিন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যাদতি প্রমাদাদিতি পাতঞ্জল মহাভাষ্যং ৩। ৪।

অতি সন্নিকর্ষ, অত্যন্ত সামীপ্য বশতঃ অত্যন্ত দূর স্থিতি প্রযুক্ত, মূর্ত্ত্যন্তর দ্বারা ব্যবহিত হইলে, অন্ধকারাক্রান্ত হইলে, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন এবং বিষয়ান্তরে আসক্তচিত্ততা হেতু বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও তাহা জ্ঞানগোচর হয় না। আমরা যাহাদিগকে অতীত বা অনাগত বলি, সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিরা তাহাদিগকেও বর্ত্তমান বলিয়া থাকেন। তপস্যা দ্বারা নির্দগ্ধদোষ বিধূতকল্মষ ত্রিকালনেত্র মহর্ষিরা অতীতানাগত বিষয়কেও প্রত্যক্ষ করিতে—জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে সর্ব্বথা পারগ, তাঁহাদের অতীতানাগত জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে কোন বিশেষ পদার্থ নহে।

আবির্ভূত প্রকাশানামনুপদ্রুত চেতসাম্।
অতীতানাগত জ্ঞানং প্রত্যক্ষান্ন বিশিষ্যতে॥

হরি কারিকা ৩৭।

ইহা দ্বারা আমরা বুঝিলাম যে আমরা সাধারণতঃ যে অর্থে বর্ত্তমান, কথাটির প্রয়োগ করি তাহা ইহার পর্য্যাপ্ত অর্থ নহে। অতীতানাগত শব্দ দ্বয়ও যে আমরা যথাযথ অর্থে ব্যবহার করি না তাহাও ইহা হইতেই হৃদয়ঙ্গম হইল। প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থেরই সূক্ষ্ম ও স্থূল অব্যক্ত ও ব্যক্ত (Invisible and visible) এই প্রকার অবস্থা আছে। সকল বস্তুই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় এবং স্থূলাবস্থা হইতে আবার সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হইতেছে। এই সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত বস্তু সকল অতীত বা অনাগত এবং স্থূল অবস্থায় স্থিত বস্তু জাত বর্ত্তমান নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভগবান্ তাই বলিয়াছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥
ভগবদ্গীতা ২।২৮

অতএব যাহা আছে তাহাই থাকিবে, তাহার কখন অভাব হইবে না এবং যাহা নাই তাহা চিরদিনই অসৎ থাকিবে তাহাকে কেহ সৎ করিতে কখন পারিবে না এই কথাই ঠিক। এখন আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব, ভগবান্ বাদরায়ণ কার্য্য শব্দটির প্রযোগ না করিয়া অবর কথাটি, কার্য্য কথায় স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? সূক্ষ্মাবস্থা হইতে বস্তু সকল যখন স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন আমরা তাহাদিগকে কার্য্য বা বস্তু জাতের স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অস্তিত্ব বলিয়া থাকি ; এবং স্থূলাবস্থা হইতে— ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থা হইতে যখন সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয় অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন ইহাদের " কারণ, অতীত অনাগত " ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়া থাকে, সুতরাং কারণের শেষাবস্থা যে কার্য্য তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। কার্য্য কারণ একই জিনিস, এক বস্তুরই পূর্ব্ব ও চরম অবস্থা দ্বয়ই যথা ক্রমে কারণ কার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিদেশীয় চিন্তাশীল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গণ ঠিক এই কথাই বলিতেছেন। পাঠক একবার অনাদি কাল-প্রবৃত্ত ভগবানের মুখনিঃসৃত সত্যজ্ঞানপ্রসূতি শ্রুতি দেবীর এবং তাঁহার গর্ভজাত তাঁহার অনুগত দর্শনাদি শাস্ত্র প্রণেতা দিগের, অভ্রান্ত বাক্যের সহিত-সারাৎসার সারতম উপদেশ বচনের সহিত নবাভ্যুদয়-শীল বিদেশীয় পণ্ডিত দিগের মতের ঐকমত্য বিচার করুন। আমরা আমাদের শাস্ত্রীয় মতের সহিত বিদেশীয় মত মিলিতেছে বলিয়া বিন্দু মাত্র বিস্মিত বা হর্ষযুক্ত হই নাই, কারণ, বুঝি না বুঝি ইহা আমাদের সরল হৃদয়ের সহজ বিশ্বাস যে শ্রুতি অপৌরুষেয়, শ্রুতি নিত্য এবং শ্রুতিই সত্য জ্ঞান প্রসূতি। যে মত শ্রুতি বচনের বিরোধী, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য তাহা অশ্রোতব্য। তবে যাঁহাদের বিশ্বাস, আমরা অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ সভ্য হইতেছি অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছি, যাঁহাদের হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, যে আমাদের শাস্ত্র সকল যাঁহাদের দ্বারা রচিত হইয়াছে তাঁহারা নিতান্ত অসভ্য ও মূর্খ ছিলেন তাঁহারা মিলাইয়া দেখুন, তাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করুন অসভ্য মূর্খেরা কি বলিয়াছেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের পারদর্শী সভ্যতার উচ্চমঞ্চে অবস্থিত. বিদেশীয় পণ্ডিত গণই বা কি বলিতেছেন—

When we are aware of something which begins to be, we are by the necessity of our intelligence, constrained to believe that it has a cause. But what does the expression, that it has a cause signify? If we analyse our thought, we shall find that it simply means, that as we can not conceive any new existence to commence, therefore, all that now is seen to arise under a new appearance, had previously an existence under a prior form.

We are unable, on the one hand, to conceive

nothing becoming something; or on the other, something becoming nothing. (Hamilton's Lectures on metaphysics, Vol II. P. 377.)

We are compelled to imagine that what we see has originated in the unseen and in using the term we disire to go back even further than ether which according to one hypothesis has igven rise to the visible order of things. (Taits unseen Universe.)

The entire process of things as displayed in the aggregate of the visible universe is analogous to the entire process of things as displayed in the smallest aggregate. (Spencer's First principle, P 536.)

ক্রমশঃ।

কামরূপ কামাখ্যা যাত্রা।

গোয়াল পাড়ার শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলী ধর্ম্মার্থ পূর্ণ বক্তৃতা শুনাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেও আমি ইন্‌ফলুয়েন্‌জার অত্যাচারে তাহাতে অস্বীকৃত হইলাম এবং মা কামাখ্যাকে দর্শনানন্তর এই স্থান হইয়া ভগবদ্ ভক্ত বৃন্দের মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইব এই বলিয়া, তৎপর দিন ভিক্ষাবসানে বেলা ১১ টার সময় ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম। ষ্টীমার ব্রহ্মপুত্রের প্রবলতর একটানা স্রোতের উজান জলে বাহিয়া চলিল। নদের দুই ধারে শ্বাপদ সমাকুল বনে সমাকীর্ণ শৈলমালা ভূপৃষ্ঠে উত্তাল তরঙ্গ মালার ন্যায় সুশোভিত। ব্রহ্মপুত্রের এ বিভাগে পণ্য পূর্ণ নৌকাদি বড় দেখা যায় না, কারণ উজান জলে সুবাতাস না পাইলে গুণ টানিয়া যায়, এরূপ সুগম তটবর্ত্ম নাই। একে প্রচণ্ড স্রোত, তাহাতে জল গর্ভে লুক্কায়িত শৈলশৃঙ্গ রাশিতে বিপদের বিষম আশঙ্কা। ভাবিয়াছিলাম, সেই দিনই গৌ-হাতী (গৌহাটী) গ্রামে পৌঁছিব, কিন্তু পলাশবাড়ী ষ্টেশনে যাইতেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, অগত্যাই নাবিক জলগর্ভশায়ী শৈলে শঙ্কিত হইয়া ষ্টীমার আর চালাইল না, অদূরেই নোঙ্গর করিল। শেষ রাত্রিতে আবার ষ্টীমার ছাড়িল ও প্রভাতেই গৌহাটীতে গিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টীমার হইতে নামিয়াই কুচবিহারের শ্রীশ্রী মদন মোহন জীর নব মন্দির-প্রবেশোৎসবে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মার্থপূর্ণ ব্যাখ্যান করিবার জন্য ষ্টেট্ টেলিগ্রামে নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। গৌহাটীতেই শৌচাদি সমাধা করিয়া মা কামাখ্যা দেবীর শৈল শিখরে উঠিব মনে করিলাম। ক্রিয়া সমাধা করিয়া ব্রহ্ম পুত্র তটে আসিতেছি এমন সময় তথাকার এসিষ্টাণ্ট্ কমিশনর বাবু, নর্ম্মাল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মহাশয়, আদালতের সেরেস্তাদার মহাশয় আদি আসিয়া পথিমধ্যে সাক্ষাৎ করিলেন, আমিও তাঁহাদের কথানুসারে শৈল হইতে অবতরণ করিয়া তথায় ২। ১ দিন থাকিতে স্বীকার করিলাম।

কামরূপে কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিতে হইলে প্রথমে পঞ্চতীর্থের (উর্ব্বসী, উমানন্দ, ব্রহ্মকুণ্ড, পাণ্ডুনাথ ও গৌরী শিখর) পূজা করিয়া যাইতে হয়। উর্ব্বশী ও উমানন্দ ব্রহ্ম পুত্র নদের মধ্যজলে সংস্থিত, নৌকা না হইলে তথায় যাওয়া যায় না। গৌহাটীতে ভাল নৌকাও মিলে না। এক খানি কাঠে খোদিত ডোঙ্গা পাইলাম। সেই ডোঙ্গায় চড়িয়া খরতর তরঙ্গে প্রবহমান ব্রহ্ম পুত্রের বিশাল বক্ষের উপর দিয়া উর্ব্বশী পাহাড়ের দিকে চলিলাম। উর্ব্বশী একটি জল-মগ্ন ক্ষুদ্র শৈল, তাহাতে অনেক গুলি দেব দেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। বর্ষা কালে "উর্ব্বশী" জল মধ্যে গা ঢাকা দিলে পাছে ষ্টীমার আদির বিপদ্ হয়, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ উর্ব্বশীর শীর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক কুক্কুটধ্বজ স্তম্ভ (Cockhead pillar) সংস্থাপন করিয়াছেন। কুক্কুটধ্বজ না করিয়া তথায় একটি গরুড়ধ্বজ বা বৃষভধ্বজ স্থাপন করিলে ভাল

দেখাইত। উর্ব্বশীতে যেরূপ স্নান পূজাদি করিতে হয় তাহা হইল। এই সময় ঘনঘোর মেঘের প্রবল বৃষ্টি ও অত্যন্ত ঝড় তুফান আরম্ভ হইল, ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গ রাশি ভয়ঙ্করাকার ধারণ করিল ; এই দুর্য্যোগেই আবার নৌকায় উঠিলাম। গৌহাটী হইতে আর একখানি যাত্রীর নৌকা আসিতেছিল, তুফানের তেজে সেখানি উর্ব্বশী বা উমানন্দে পৌঁছিতে পারিল না, গৌহাটীতে ফিরিয়া গেল। আমরা কিন্তু নির্বিঘ্নে "উমানন্দ" শৈল পাদে অবরোহণ করিলাম। কামাখ্যা মহাপীঠ-ভৈরবের নাম "উমানন্দ"। ইনি যে পর্ব্বতের উপর বিরাজমান, তাহার নাম "উমানন্দ পাহাড়"। এই পর্ব্বত উচ্চশৃঙ্গে বিশাল ব্রহ্মপুত্রের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া বীরবেশে দণ্ডায়মান আছেন। ষ্টীমারে চড়িয়া যাইবার সময় বোধ হয় যেন কোন জটাজূটধারী মহাতাপস জলসমাধি করিয়া বসিয়া আছেন। সেই সৌম্য শৈল শিখর সন্দর্শনে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া আসে, নিকটে যাইতে যেন গতিরোধ হয়। ষ্টীমারও যেন তাই আর অগ্রসর না হইয়াই গৌহাটীতে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আবার অনুমতি পাইলে তবে ধীরে ২ উমানন্দের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়। পর্ব্বতের উপরে অতি বিস্তার স্থান নাই। ভগবান্ ভূতভাবন ভৈরব নাথের মন্দির, নাট মন্দির ও পাণ্ডাদিগের ২।৩ টী ক্ষুদ্র গৃহ ও একটি প্রকাণ্ড তার তরু। একটি স্বল্পায়তন গভীর গুহা গর্ভে "উমানন্দ" সংস্থিত। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন করিলে হৃদয়ে উল্লাসের উৎস উৎসারিত হয়, ভক্তির বেগ আপনি ফুটিয়া বাহির হয়। তথায় তাঁহার যথারীতি পূজার্চ্চনা করিয়া তথাকার "যোগী গুহায়" কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, ও অতঃপর সেই তুফান মাথায় করিয়া পাণ্ডুনাথাদি দর্শনে যাত্রা করিলাম। গভীরগর্ভ ব্রহ্ম পুত্রের উত্তাল তরঙ্গমালার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া মাঝী নৌকা চালাইল, আমার সঙ্গীগণ সন্তরণ-সমর্থ হইলেও ভীত হইয়া মাঝীকে কিনারায় ২ নৌকা চালাইতে বলিল ; আমি সন্তরণে অপটু হইলেও আমার কিন্তু ভয় হইল না। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন কে স্মেরাননা কারুণ্যপূর্ণনয়না নৌকার কর্ণস্থান স্পর্শ করিয়া পশ্চাতে ২ আসিতেছেন, আমি সঙ্গীদের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, ভয় নাই ভাবনা নাই। মার কাছে যাইতেছ চিন্তা কি। যাহা হউক আনন্দে পাণ্ডুনাথাদি দর্শন হইয়া গেল "গৌরী শিখরে" আসিয়া নৌকা লাগিল। এই পর্ব্বতের শীর্ষেই মা কামাখ্যা দেবী বিরাজ করিতেছেন। এই পর্ব্বতের দ্বিতীয় নাম "নীলাচল"। এই সুরনরবন্দিত জগন্মাতার আসন স্বরূপ পবিত্র পর্ব্বতে পাদস্পর্শ জন্য অপরাধ হয় বলিয়া জীবের কল্যাণার্থ শাস্ত্রে প্রথমে পর্ব্বতের পূজা বিহিত হইয়াছে। তদনুসারে গৌরীশিখরের যথাবিধি সোপচারে পূজা ও নিম্ন লিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিলাম।

"নীলাচল গিরিশ্রেষ্ঠ! শিখরং তব কামদম্।
আরোহয়ামি শিখরং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥
নীলাচল মহাবাহো ধর্ম্মমার্গ! ত্রিপৃষ্ঠতঃ।
আরুহ্য বীক্ষে কামাখ্যাং যোনিমুদ্রাং জগন্ময়ীম্॥

গৌহাতী হইতে যে পথে নীলাচলে উঠিতে হয়, সেটি পুরাতন ও দুরারোহ। কিন্তু আমরা সে পথে না উঠিয়া নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যে পথ দিয়া উঠিলাম, সেটি ময়মনসিংহ জেলার জনৈক জমীদার কর্ত্তৃক নবনির্ম্মিত ও সুগম।

নিম্ন হইতে দেখিলে বোধ হয় যে শৈলশিখর কেবল বনাকীর্ণ। কিন্তু উঠিয়া দেখি সেখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মালাকর আদি প্রায় ৩০০ গৃহস্থের বাস, এতদ্ভিন্ন অনেক গুলি দেবালয়, উদ্যানাদি আছে "সৌভাগ্য কুণ্ড" আদি কয়েকটি ক্ষুদ্র২ জলাশয় ও স্থানে২ নির্ঝরিণী বিদ্যমান আছে। গ্রীষ্ম কালে জলের কিছু কষ্ট হয় বলিয়া বোধ হইল। নারিকেল, কাঁঠাল, আম্র

আম্রাতক, বিল্ব, নিম্ব, জম্বু আদি অনেক বড় ২ বৃক্ষও শৈলশিরে সুশোভিত আছে। অত্রত্য জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। এত লোক বাস করিতেছে, অথচ পুলিশের কোন ব্যবস্থা নাই, শান্তিরক্ষক প্রহরী একজনও দেখিলাম না। চৌরের উপদ্রব বড় নাই। গৃহ গুলি এরূপ উচ্চাবনত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে অন্ধকারে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে গেলেই পড়িয়া যাইতে হয়। যত লোক উপরে বাস করে, তাহাদের সকলেরই উপজীবিকাস্থান মা কামাখ্যা দেবী। মাল্লাকর গণ যাত্রী দিগের পূজাদির সমস্ত ব্যবস্থা ও আয়োজন করিয়া দেয়, ব্রাহ্মণ গণ পূজারি ও পাণ্ডার কার্য্য করিয়া থাকেন। অন্যান্য তীর্থ-ব্রাহ্মণাপেক্ষা এখানকার ব্রাহ্মণ গণ সরল, শিষ্টাচারী ও সন্তোষযুক্ত।

শাস্ত্রে কথিত আছে এই নীলাচল শিবাঙ্গ সদৃশ শুভ্র ছিল। কামাখ্যা দেবী দর্শন করিলে দেব দানব মানব সকলেরই কাম বৃত্তি স্তম্ভিত হইত। এই পর্ব্বতে কল্পলতা বিজড়িত কল্পতরু বিরাজিত ছিল, এ স্থান সকলেরই পূজিত। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে—

শ্রীভগবানুবাচ।

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা॥
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥
একা সমস্ত জগতাং প্রকৃতিঃ সা যতস্ততঃ।
ব্রহ্ম বিষ্ণুশিবৈর্দেবৈঃ স্তুতা সা জগতাং প্রভুঃ॥
তত্র পূর্ব্বো ব্রহ্মশৈলঃ শ্বেত ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
মদ্রূপধারী শৈলস্তু নীল ইত্যুচ্যতে তথা॥
অজীর্ণপত্রঃ সুচ্ছায়ো বৃক্ষস্তত্র তু সংস্থিতঃ।
আম্রাতকঃ কল্পবৃক্ষঃ কল্পবল্লীসমন্বিতঃ॥
পীঠেতু সিদ্ধগঙ্গাখ্যা স্বয়ং গঙ্গা সমুত্থিতা।
আম্রাতকস্য নিকটে মম প্রীতিবিবৃদ্ধয়ে॥
তত্রত্যা পৃথিবী সর্ব্বা দেবীরূপা স্মৃতা বুধৈঃ।
ততঃ পরতরং স্থানং পূজ্যং নাস্তি জগত্রয়ে॥

এই কামাখ্যা শৈলশিখরে আরোহণ স্থিতি ও পূজা পাঠাদি করিলে ভক্তের মনে কোন্ সঞ্জীবনী শক্তি তড়িদ্বেগে বহিতে থাকে তাহা ভক্ত ও ভক্তবৎসলাই জানেন, আমার ন্যায় অভক্ত, পাষাণ হৃদয়ও কিন্তু বিগলিত হইল, প্রাণ মন কাঁদিয়া উঠিল। পাণ্ডাগণ "অদ্য বিশ্রাম পূর্ব্বক কল্য পূজাদি করিবেন" বলিয়া অনুরোধ করিলেন,-কিন্তু মন মানিল না, প্রাণ বুঝিল না, আত্মা শুনিল না, মাকে দেখিবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আর বাসায় বসিতে পারিলাম না,-মায়ের দর্শনার্থ—আমার চিরাকাঙ্ক্ষার সামগ্রী দেখিবার নিমিত্ত মার মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যথানিয়মে সৌভাগ্যকুণ্ডের জলে মার্জ্জনাদি করিয়া মার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

মন্দিরে প্রবেশ মাত্রেই অষ্টধাতুবিনির্ম্মিত "কামেশ্বরী" দেবী মূর্ত্তির দর্শন হয়। মন্দিরের এই বিভাগে কামেশ্বর মহাদেব, অন্নপূর্ণা, চামুণ্ডা, বটুকাদি দেবপ্রতিমূর্ত্তি ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা পরম ভক্ত মহারাজা শুক্লধ্বজ, মল্লধ্বজ ও ব্রাহ্মণকেন্দ ইঁহাদের কলেবরের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ সমস্ত দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া বামে ৫। ৬ টী সোপান অবরোহণ করিলে মা যোনিমুদ্রা স্বরূপিণীর সিদ্ধ পীঠ দর্শন হয়। এই স্থানটি অতি অন্ধকারময়, দীপালোকে পীঠস্থানের দর্শন ও অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে। সেখানে মায়ের পদ হস্ত মুখাদিযুক্ত কোন মূর্ত্তি নাই। প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উদ্‌ভেদ করিয়া প্রতিনিয়ত জলধারা বহিয়া যাইতেছে—বর্ষাকালে এই ধারা কিছু প্রবলা হয়। প্রস্তর ফলক সিন্দূরমণ্ডিত, এবং যে যোনিমুদ্রা হইতে নির্ম্মল জলধারা নির্গত হইতেছে, তাহা কোটী শিবলিঙ্গ-পূর্ণ সুগভীর গহ্বর। এই স্থানেই মায়ের পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। এই স্থানের পার্শ্বেক প্রদেশে লক্ষ্মী ও

কুমার পরিব্রাজকের আবেগময়ী জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে হিন্দুস্থানী রেহিস্‌গণ নিজ ২ শক্ত্যনুসারে বেদবিদ্যালয়ের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, কুঠিয়াল মহাজনদের মধ্যে পঞ্চায়তী ধরণের সভা করিয়া বেদবিদ্যালয়ের একটা বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করিবেন। সভায় এখানকার খ্যাতনামা স্বধর্ম্মানুরাগী জমীদার শ্রীযুক্ত প্রমদা দাস মিত্র মহাশয়ও বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ধনীর সন্তান হইয়া সংস্কৃত ভাষায় এরূপ বাগ্মিতা প্রায়ই দেখা যায় না। প্রমদা বাবু কাশীর বাঙ্গালিকুলের গৌরব স্বরূপ। তিনি বেদবিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আশা করি, প্রমদা বাবু অন্তরের আগ্রহ কার্য্যে পরিণত করিবেন।

অনন্তর বেদবিদ্যালয়ের ছাত্র গণকে পারিতোষিক দান আরম্ভ হয়। উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পারিতোষিক রূপে প্রদত্ত হয়। তার পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণকে বিদায়ী দক্ষিণা দিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

২৩ শে অগ্রহায়ণ সভার কার্য্যালয় হইতে যাত্রা করিয়া চক চৌখাম্বা হইয়া বিন্দুমাধব পঞ্চগঙ্গা পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী টোলায় বাঙ্গালিদের এ নাম সংকীর্ত্তন এক বিচিত্র নূতন ব্যাপার। হিন্দুস্থানীগণ বিস্মিত নয়নে নর্ত্তন কুন্দনপরায়ণ বাঙ্গালি সভ্য বাবুর উন্মাদময়ী ভক্তিলীলা দেখিয়া মোহিত হইয়া ছিল। এখান কার একজন প্রধান মহাজন বাবু গোকুলচাঁদ সেই সঙ্কীর্ত্তন দলকে আদর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক নিজের ঠাকুর বাড়িতে লইয়া গেলেন। তথায় চারিদিক্ হইতে ভক্তবৃন্দের মস্তকে বাতাসা ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ বাবু গোকুল চাঁদ সপুত্র একবার সেই সংকীর্ত্তন-দলকে প্রদক্ষিণ করিয়া লইলেন। ভক্তমণ্ডলী তাঁহার নয়নরঞ্জন পুত্রটিকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া গঙ্গাতীরের দিকে চলিয়া গেলেম। সন্ধ্যা আটটার সময় সঙ্কীর্ত্তনদল কার্য্যালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন।

২৪ শে অগ্রহায়ণ কারমাইকেল লাইব্রেরিতে সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় হিন্দী ভাষায় "ধর্ম্মরাজ্য" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। তাঁহার হিন্দী ভাষায় বলিবার ভঙ্গীতে ও পরিচ্ছদে অনেক হিন্দুস্থানী তাঁহাকে একজন "হিন্দুস্থানী স্বামীজি" অনুমান করিয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে ধর্ম্ম তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়াছিলেন। বিধর্ম্মীদের মত খণ্ডনাবসরে বলিয়াছিলেন, "যাহারা বলে হিন্দু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে, ক্রিয়া কর্ম্মে কোন রূপ সার নাই, তাহারা যদি হিন্দুধর্ম্মের রীতিমত অনুষ্ঠান করিয়া কোন রূপ ফল না পাইয়া এই কথা বলিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম তাহাদের বলিবার অধিকার আছে। ধর্ম্মের কোন রূপ সাধনা না করিয়া অথচ সাধনার ফল বা সার বুঝিবার যাহারা দাবিদাওয়া করে, তাহারা আগুন, জল ও তণ্ডুলাদি কারণ সামগ্রীসম্ভারের আয়োজন না করিয়াই প্রস্তুত অন্ন পাইবার বাসনা করে। সুতরাং তাহাদের উন্মত্ত প্রলাপে এক জন আনুষ্ঠানিক হিন্দুর বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই"। পরিব্রাজক মহাশয় প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল এই রূপ যুক্তিময়ী তেজোময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ছিলেন।

২৫ শে অগ্রহায়ণ পরিব্রাজক মহাশয়ের নবনির্ম্মিত যোগাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া বাঙ্গালি টোলায় নগরসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। এ দিন বড় আনন্দের দিন। এমন নাম রসের উত্তেজনা আর কোন দিন হয় নাই। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শম্ভু চন্দ্র মল্লিক ইহাঁরা কাশীধামে একটি সঙ্কীর্ত্তনদল গঠন করিয়াছেন। ইহাঁরাও সদলবলে সেদিন যোগ দিয়া ছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয়কে মধ্যস্থলস্থায়ী করিয়া ভক্তগণ মণ্ডলাকারে নাম সঙ্গীত গাহিতে ২ বাহির

হন। সঙ্কীর্ত্তনের লোকে বড় রাস্তা ভরিয়া গেল। খোল করতাল বাদ্য ভাণ্ডের তুমুল রোলে দিঙ্মণ্ডল পুরিয়া গেল। প্রেমিক ভক্তের হরি২ ধ্বনিতে দর্শক বৃন্দের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে উচ্ছাসময়ী উত্তেজনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। কাশীধাম বিশুষ্ক জ্ঞান ভূমি। হর হর বোম্ বোম শব্দই এখানকার ধর্ম্মের ভাষা। সাধু সন্ত সন্ন্যাসী দণ্ডীই এখানকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। এ জ্ঞান বৈরাগ্য-পূর্ণ ধামে আজ ভক্তির এ আনন্দময় লহরী—প্রেমিকের এ প্রেমমাতোয়ারা ভাব অভূত পূর্ব্ব ব্যাপার। আজ বিরাগীর এ বৈরাগ্য ক্ষেত্র যেন প্রেমিকের নিকুঞ্জকানন হইয়া উঠিয়াছে। মহাদেবের মহা শ্মশানে বৃন্দাবন বিহারীর প্রেমময় মাহাত্ম্য যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। পরম পাষণ্ডও বিগলিত হৃদয়ে প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে একবার সে দৃশ্য চাহিয়া দেখিল। দোকানদারগণ চারিদিক্ হইতে বাতাসার হরির লুঠ দিতে আরম্ভ করিল। ভক্তিমতী প্রাচীনা স্ত্রীগণ ভক্ত-গণের পদধুলি লইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। এই রূপে সঙ্কীর্ত্তন রাত্রি প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত হইয়া শেষ হইয়া যায়।

২৬ এ অগ্রহায়ণ অপরাহ্ন বেলা ৪॥ টার সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্ম বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়া ছিল। ২৭এ অগ্রহায়ণ ৪টার সময় পুঁটিয়া মহারাজার সত্রালয়ে প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিব চন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় "সাধনা ও সিদ্ধি" বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে সিদ্ধি ও সাধনা নিহিত। আজ ইংরাজি লেখা পড়া শিক্ষাকে একটা সাধনা বলিয়া বুঝিলে এ মে বি এ ল, আদি উপাধিধারী হওয়া তাহার সিদ্ধি স্বরূপে ধরা যাইতে পারে। সৃষ্টি তত্ত্বের মূলেও এ সিদ্ধি ও সাধনা রহিয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন রূপ সাধনার সিদ্ধি জগৎ রূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। সাংসারিক জগতেও স্ত্রী পুরুষের বিবাহ রূপ সাধনার সিদ্ধি সন্তানোৎপত্তি। আজ তুমি সন্তানোৎপত্তি রূপ সিদ্ধি লাভের জন্য শাস্ত্রের বিবাহ রূপ সাধনার কথায় বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু মহা-শক্তির মহাসিদ্ধি লাভের জন্য শাস্ত্রের গুহ্য সাধনার কথায় আস্থা করিবে না কেন? পুত্রোৎপত্তি রূপ সিদ্ধি যেমন প্রত্যক্ষ ব্যাপার, ধর্ম্মরাজ্যে সেই রূপ তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্রের সিদ্ধিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা। তোমার আমার মত অসাধক সিদ্ধি শক্তি অবিশ্বাস করিলে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যিনি সাধক, তিনি বিরলে বসিয়া নীরবে নিজ সিদ্ধিশক্তি অনুভব করিয়া থাকেন।"

২৮ এ অগ্রহায়ণ আমরেড়িয়ার সত্রালয়ে কুমার পরিব্রাজকের "আঁধারের মানিক" এই বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক বর্ত্তমান ভারতবর্ষের আদর্শবক্তা। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্ব ২ বারের উৎসবোপলক্ষে তাঁহার যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা যেমন প্রথম খণ্ড বক্তৃতা পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই রূপ এবারকার "আঁধারের মানিক" বিষয়িণী বক্তৃতাটিও অন্য কতক গুলি নূতন বক্তৃতার সহিত দ্বিতীয় খণ্ড বক্তৃতাপুস্তকে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং উক্ত বক্তৃতার এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

২৯ এ অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে গঙ্গাবক্ষে জলযানে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। অপরাহ্ন বেলা ৪ টার সময় কাকিনার সত্রালয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। জলযানে নিম্নলিখিত গানটি গীত হইয়াছিল।

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর। তাল খয়রা।

(সুর—"গুপ্ত আনন্দ ধামের মেলা")

কুঞ্জ কাননে কেও কামিনী [স্থদি]। চিদ্‌ঘনকৃষ্ণ-কাদম্বিনী কোলে খেলিছে সৌদামিনী। (চিদ্ ঘনের কোলে খেলিছে রূপ দামিনী)

কিবা মধুর মুরতি, রূপের অপরূপ জ্যোতি, দেখে

সরমে মরমে মরে মন্মথ রতি ;—যেন কোটী চাঁদ নিঙ্ড়ানো সুধা (ও তার) মাখা মুখ খানি।

রূপের নাহিকো সীমা প্রেমের কণকপ্রতিমা, আমার শ্যাম অঙ্গে মিশায়ে সে রূপ ধরে শ্যামা ;—তখন অসি বাঁশী ভেদ থাকে না, বনমালী মুণ্ডমালিনী।

রূপের নাই যে আদি শেষ, এরূপ স্বরূপের বিশেষ, যেন অরূপ গাছে রূপের লতা জড়িত এ বেশ ;—এই রূপ সাগরে ডুব্‌লে পরে মিটে নাম্‌ রূপের ঢেউ আপনি।

পরিব্রাজক বলে মন, হও এই বেলা চেতন, ওরে, চৈতন্যে চৈতন্যময়ী কর দরশন ;—ও যে চেতন জলের ফুটন্ত ফুল, লোকে তাই বলে "কমলিনী"।

পত্র।

সবিনয় নিবেদন মিদং

মহাত্মন্! আপনারা হয়ত অবগত আছেন যে, সংপ্রতি শ্রীহট্ট নিবাসী কতিপয় শিক্ষিত যুবক হিন্দু বিধবার বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য একটা সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারকগণ সেই সভাকে অর্থ এবং সহানুভূতি দ্বারা সাহায্য করিতেছেন। হিন্দু-সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য এই যে একটা অনুষ্ঠান হইল, তাহার প্রতিবিধানের জন্য শ্রীহট্টে কি উদ্যোগ হইল, হিন্দু-সমাজের আদর্শ-ভাব রক্ষা করিবার জন্য আপনারা কি উপায় অবলম্বন করিলেন, জানিবার জন্য হিন্দু-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে।

আপনাদিগকে নীরব দেখিয়া বাস্তবিকই প্রাণ ব্যথিত হইতেছে। যদি এই অনিষ্টের প্রতিবিধান জন্য কোন উদ্যোগ নিঃশব্দ ভাবে আপনাদের মধ্যে চলিয়া থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু বালকের অনুষ্ঠান বলিয়া যদি ইহাকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তবে বড়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আজ যাহারা বালক, তাহারা চিরদিন বালকই থাকিবে না, আপনাদের পরে এই বালকদের নেতৃত্বেই সমাজ চলিবে। সুতরাং এখন বালক বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলে তাহাদের নেতৃত্ব-সময়ে সমাজকে কে রক্ষা করিবে? যাঁহারা বিধবা-বিবাহের উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা বালক নহেন, তাঁহারা সমাজে উদীয়মান মার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত যুবক; আপনারা নীরব থাকিলে তাঁহাদের কথাই লোকে শুনিবে। বিধবা বিবাহের এত আয়োজন দেখিয়া আপনারা একটি কথাও বলিতেছেন না, ইহাতে সাধারণ লোকে কি বুঝিবে? অবশ্যই তাহারা মনে করিবে যে, যখন সমাজের মান্য গণ্য লোক এবিষয়ে রীতিমত কোন প্রতিবাদ করিতেছেন না, তখন বিধবা-বিবাহ অবশ্যই যুক্তিযুক্ত এবং ধর্ম্মানুমোদিত। আপনাদের প্রতিবাদের অভাবে আবালবৃদ্ধ সাধারণের মনে যখন এই ধারণা জন্মিয়া যাইবে, তখন হিন্দু-সমাজের ধ্বংস কিরূপে বারণ করিবেন? কেবল শাস্ত্রে সমাজ-রক্ষা হইবে না—এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির যুগে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা জন্মাইতে হইবে, এবং শ্রদ্ধা জন্মাইতে হইলে হিন্দু-শাস্ত্রের যুক্তিযুক্ততা সাধারণকে বুঝাইতে হইবে। তাহার আপনারা কি করিতেছেন? বৈবাহিক পবিত্রতাই হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড। আজ যদি অক্ষত-যোনিকে বিবাহের অনুমতি দেন, কাল ক্ষতযোনিকেও সে অনুমতি দিতে হইবে, পরশ্ব সন্তানবর্ত্তী রমণী সন্তান কোলে লইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিবে, আপনাদের অনুমতির অপেক্ষা করিবে না। তখন অন্য সমাজের তুলনায় হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠতা কোথায় থাকিবে? বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ মানবজাতির আদর্শ,—অনন্যগতি বিবাহ-প্রথা কেবল হিন্দু-সমাজেই আছে। এই সুন্দর প্রথাটি একবার ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আর কি কেহ কখন তাহা গড়িতে পারিবে?

অতএব বিনীত প্রার্থনা, আর নীরব নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না, অনন্যগতি বিবাহ-প্রথাকে হিন্দু-সমাজে বদ্ধ-মূল রাখিবার জন্য আপনারা—সমাজের অগ্রণীগণ সমবেত-চেষ্ট হউন, ঈশ্বর আপনাদের যত্ন জয়যুক্ত করিবেন।

আর একটি কথা। যে সকল যুবক বিধবার বিবাহে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা দেশের বা সমাজের শত্রু নহেন; কিন্তু না বুঝিয়া হয় তো এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনারা শান্ত ধীর বিজ্ঞভাবে প্রকৃত হিতৈষী বৃদ্ধের ন্যায় তাঁহাদিগের ভ্রান্তি দেখাইয়া দিউন; দেহ-সুখ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য নীতির অসারতা একবার বুঝিলে তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার চটকে ভুলিবেন না,—অন্যদেশে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য নাই বলিয়া তাঁহারা তাহা ভারতবর্ষ হইতে দূর করিবেন না, বনে বনে চন্দন মিলে না বলিয়া মলয়-গিরিকে তাঁহারা চন্দনশূন্য করিবেন না। ইতি—

মৌলবীবাজার
তারিখ ২৪ এ অগ্রহায়ণ-
বঙ্গাব্দ ১২৯৭।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরকিঙ্কর দাস।

বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অপকারিতা "ধর্ম্ম প্রচারকে" ও অন্যান্য সংবাদ পত্রে অনেক বার আলোচিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদিও প্রচারিত হইয়াছে। বরিশালের সুশিক্ষিত সর্ব্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র ভট্ট মহোদয়ের ও ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট্‌ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার দানিয়াড়া মহাশয়ের প্রকাশিত বিধবা বিবাহ নিবারণ" পুস্তকদ্বয় আনাইয়া পাঠ করিলে এই অবৈধ বিবাহের উদ্যোগী গণ অনায়াসেই এ কার্য্যের অশাস্ত্রীয়তা ও অপকারিতা বুঝিতে পারিবেন। বিধবা পুনর্ব্বার সধবা হওয়া শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্বেচ্ছাচারের পদাঘাতে তিরস্কার করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে কোন সদুপদেশই উপকারী হইবে না। বিধবা বিবাহের অনুরাগী গণ এ বিবাহের অনুকূল দুই এক খানি গ্রন্থ যেমন পাঠ করিয়াছেন, আশা করি নিরপেক্ষ ও ধীর ভাবে ইহার প্রতিকূল ও শাস্ত্রার্থপূর্ণ ২।৪ খানি পুস্তকও পাঠ করিয়া যথাবিধি কার্য্য সাধন করিবেন।

ধঃ, প্রঃ, সং।

ধর্ম্মপ্রচারকের গ্রাহক ও পাঠক বর্গ বোধ হয় অবগত আছেন যে কতিপয় হিন্দুকুল-কুঠার একত্র হইয়া সনাতন ধর্ম্মানুশাসিত হিন্দুসমাজকে কলুষিত ও নির্য্যাতিত করিবার জন্য বরবর্ণিনী কুলকামিনী গণের স্ত্রী মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া "স্ত্রীসমাগম-সম্মতি কাল" [Age of Consent] নিরূপণার্থ রাজদ্বারে আইন-প্রার্থী হইয়া সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন করিয়া তুলিয়াছে। এই মহান্দোলনের মহাতুফানে বিলাতকেও বিচলিত করিয়াছে ; গবর্নর জেনেরলও নিজ অভিপ্রায় জানাইয়া পার্লেমেণ্টে পত্র লিখিয়াছেন। এক্ষণে সমগ্র হিন্দু সমাজ নীরবে বসিয়া থাকিলে (মৌনং সম্মতি লক্ষণম্) ইহাতে হিন্দু সমাজেরও সম্মতি আছে জানিয়া গবর্ণমেণ্ট হয়তো শীঘ্রই এই নিদারুণ কষ্টকর আইন প্রচার করিতে পারেন।

মনে করুন যদি "সমাগম-সম্মতিকাল" ১২শ বর্ষ স্থির হয়, আর কুলবধূ যদি তৎপূর্ব্বেই রজস্বলা হয়েন, তবে গর্ভাধান সংস্কার হইতেই পারিবে না। বৈধ সংস্কার না হইলে সে গর্ভে যে পুত্রাদি উৎপন্ন হয়, সে শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের, পিণ্ডদান তর্পণাদির উপযুক্ত অধিকারী হয় না। অতএব আইনটি প্রচলিত হইলে ধর্ম্মাধিকারের মূলোচ্ছেদ হইবে।

এক্ষণে যাহাতে এই আইনটি প্রচলিত হইতে না পায়, তজ্জন্য হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ সমস্ত সভা হইতেই ইহার প্রতিবাদ হওয়া অবশ্যাবশ্যকীয়। আমরা আজ আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, হিন্দু সমাজের এই বিপত্তির দিনে ধর্ম্মসভা সমূহ স্বকর্ত্তব্য সাধনার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নলিখিত স্থান গুলির ধর্ম্মসভা হইতে উক্ত আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের নিকটে আবেদন পত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে।

জামালপুর, মুঙ্গের, খুলনা, বরিশাল, কালনা, বীরভূম, ভাঙ্গা, ময়মনসিংহ, ডায়মণ্ড হার্ব্বার-দেরিয়াগ্রাম, বর্দ্ধমান-বনপাস, নন্দনপুর, বোয়ালিয়া, ধুবড়ি, ঝিখিরা।

বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে অর্থাৎ সন ১২৯৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে সন ১২৯৭ সালের কার্ত্তিক মাহা পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

মুষ্টি ভিক্ষা লব্ধ	২৭৩৫৷৶৹
এক কালীন দান প্রাপ্তি	৮৬৭৷৹
মোট আয়	৩৬০২৸৶৹

ব্যয়।

আচার্য্যদিগের মাসিক দক্ষিণা ও ছাত্রগণের মাসিক বৃত্তি ও ছাত্রাবাসের ব্যয়	১০২১৸৹
ভিক্ষা লিপি, বিজ্ঞাপনাদি ছাপাই খরচ	২০৩৸৶১৹
মাসুল খরচ	৫৩৷৹
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদ ও বাজে খরচ	১৭৭৸৶১৫
মোট ব্যয়	১৪৫৭৶৫
বাকী	২১৪৫৸৶১৫
তন্মধ্যে সেভিংস্ বেঙ্কে জমা	১৫৩৫৲

শ্রী তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
লেখাধ্যক্ষ।

বারাণসী বেদবিদ্যালয়
তারিখ ২২ এ অগ্রহায়ণ ১২৯৭

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥"

১৩শ ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১১
১০ম সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"	মাঘ—মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো বৈশ্যাদ্ বৈদেহিকস্তথা।
শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে সূতজাতির উৎপত্তি। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদেহিকের উৎপত্তি, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি। ইহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত।

ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যাচ্ছূদ্রাৎ ক্ষত্তারমেবচ।
শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতং ॥

বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মাগধের উৎপত্তি, শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ক্ষত্তার উৎপত্তি, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব নামক জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥

মাহিষ্য কর্ত্তৃক করণী স্ত্রীতে রথকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতিলোমজ অর্থাৎ নীচ জাতীয় পুরুষ দ্বারা উত্তম জাতীয় স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র নিকৃষ্ট ও অনুলোমজ অর্থাৎ উত্তমজাতীয় পুরুষ দ্বারা নীচ জাতীয় স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র উৎকৃষ্ট শ্রেণির বলিয়া গণ্য হইবে।

ইতি বর্ণ জাতিবিচারপ্রকরণ সমাপ্ত।

কর্ম্ম স্মার্ত্তং বিবাহাগ্নৌ কুর্বীত প্রত্যহং গৃহী ॥
দায়কালাহৃতে বাপি শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু।

গৃহস্থ প্রতিদিন বিবাহাগ্নি অথবা ধন বিভাগ কালে প্রাপ্ত অগ্নি দ্বারা বলি বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিবে, এবং শ্রৌত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বৈতানিক অগ্নি দ্বারা সম্পন্ন করিবে।

শারীর চিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধি র্দ্বিজঃ।
প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবন পূর্ব্বকম্ ॥

প্রাতঃকালে দ্বিজাতি মল মূত্রোৎসর্গাদি শারীর-কৃত্য ও হস্তমুখ প্রক্ষালণাদি শৌচকৃত্য এবং দন্তধাবনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যথাবিধি প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন।

হুত্বাগ্নীন্ সূর্য্যদৈবত্যান্ জপেন্ মন্ত্রান্ সমাহিতঃ।
বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।

অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া সমাহিত হইয়া সূর্য্য দেবতা সম্বন্ধীয় মন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর বেদার্থ ও অন্য বিবিধ শাস্ত্রার্থ বিচার করিবে।

উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়েদর্চ্চয়েত্তথা॥

অনন্তর যোগ ক্ষেমার্থ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর পরিরক্ষার প্রয়োজন হইলে রাজ-সমীপে গমন করিবে।

বেদাথর্ব পুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধার্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীং জপেৎ॥

অনন্তর বৈদিক মন্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস যথাশক্তি অধ্যয়ন করিবে এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যা জপ করিবে।

ক্রমশঃ।

হৃদয়-দৌর্ব্বল্য।

দুর্ব্বলতাই ব্যাধির বাসভূমি। শক্তিহীন শরীরকেই ব্যাধি নিজ বিলাস-ক্ষেত্র করিয়া তুলে। কিন্তু ব্যাধি কি? ব্যাধি স্বাস্থ্য হইতে বিভিন্ন পদার্থ নহে, অস্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের অবস্থান্তর মাত্র। ব্যাধি প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। ব্যাধি প্রকৃতির স্থায়ী ভাব নহে, স্বভাবে স্বভাব-অভাব কখনও চিরদিন এক ভাবে থাকিতে পারেনা। তেজোহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নিজের শক্তিই নিজ শত্রু হইয়া থাকে, নিয়মই অনিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। অন্ধকারের কোন অস্তিত্ব নাই, কিন্তু আলোকের অবসানই তাহার এক মাত্র আধার। ব্যাধিও তদ্রূপ, ব্যাধি পূর্ব্ব প্রকৃতির ক্ষণিক অপ্রকাশ, বর্ত্তমান বিধির কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য। সুতরাং দেখিলাম, অনুকূল শক্তির অভাবই বিকারের আকর। অগ্নি তেজোহীন বলিয়াই ভস্মাচ্ছাদিত, কন্যারাশিস্থ ভাস্কর বীর্য্যসার-শূন্য, তাই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডও আজ নিষ্প্রভ।

এই স্বাভাবিক সত্য সার্ব্বভৌমিক, ইহা অন্তর্বহি-র্ব্যাপৃত। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই অবিশ্বাসের মূল, চিত্ত-চাপল্যই অভক্তির ভিত্তিভূমি, অনন্যতার অভাবই মনের মলিনতার মূলীভূত কারণ। তীব্রতার তিরোভাবই জীবের মানসাকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছে। তুমি ভাল হও বা মন্দ হও, আস্তিক বা নাস্তিক হও, পণ্ডিত বা মূর্খ হও তাহাতে ক্ষতি নাই, তুমি ভগবদ্ভক্ত হও অথবা দেব-দ্বেষী হও, তাহাতেও তত যায় আসেনা; কিন্তু তুমি যাহাই হওনা কেন, তাহাতেই অনন্যচিত্ত হইতে যত্নপর হও, তাহারই তীব্রভাবনা কর, নতুবা সমস্তই নিষ্ফল জানিও। তীব্রতা থাকিলে তুমি ঘোর নাস্তিক হইলেও আস্তিক হইতে পার, হৃদয়ের বল থাকিলে অজ্ঞ হইলেও বিজ্ঞ হইবে, পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইবে, ঈশ্বর-বিরোধী হইলেও তোমার একদিন পরম প্রেমিক হইবার আশা আছে; কিন্তু তীব্রতা চাই, একনিষ্ঠ হওয়া চাই, তদ্গতমনা হইলে তবেই কার্য্যসিদ্ধি হয়, একাগ্রতাই সর্ব্বসিদ্ধির সার মন্ত্র। এই শক্তি সাধনেই জীব শিব হইয়া যায়।

মনের আসক্তি বা আকর্ষণী শক্তি স্বভাবতঃই আছে সত্য, কিন্তু তাহা জীব সাধারণে প্রায়ই বিক্ষিপ্ত ভাবে স্থিত। যাঁহাতে এই শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তিনি ভাল বা মন্দ যে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউন না কেন নিশ্চয়ই কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, বক্ররেখায় যে শক্তি সঞ্চালনে যে ফল লাভ হয়, সরল পথে সেই শক্তি সন্ধান করিলে অতিসত্বর শুভ ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ঐকান্তিক অনুরাগ শক্তির প্রয়োগই কার্য্যসিদ্ধির মূলমন্ত্র। অনুরাগের অল্পতাই অকৃতকার্য্যতার অন্তরঙ্গ—নীচাশয়তার নিজনিবাস—পাপাচরণের পৈশাচিক প্রবৃত্তিবর্দ্ধক ও পদস্খলনের পিচ্ছিল ভূমি। কথিত আছে কোন মহাত্মাকে জনৈক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ অভিবাদন পূর্ব্বক প্রশ্ন করিল, "ভগবন্! কিসে আমার ভগবানে ভক্তি হয় অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ করুন"। তদুত্তরে মহাত্মা বলিলেন, তোমার কোন্ বিষয়ে বিশেষ আসক্তি বা প্রীতি আছে বল, তবেই আমি তোমাকে উপায় বলিয়া দিতে পারি, কেননা অনুরাগ-শক্তি এক অমিশ্র ও পরম পবিত্র, কেবল স্থান ভেদে তাহার বৈলক্ষণ্য বোধ হইয়া

থাকে। বিষয়ানুগামিনী হইলেই তাহা বিষয়াসক্তি নামে অভিহিত হয় এবং ভগবদ্ভক্তি অনুসারিণী হইলেই তাহা পরম প্রেমরূপে পরিণত হয়, সুতরাং তোমার স্বাভাবিক অনুরাগ বিষয়ান্তরে ন্যস্ত থাকিলেও কৌশল ক্রমে তাহাকে অহৈতুকী ভাবে ভক্তিভাবাপন্ন করিবার উপায় আমি তোমায় বলিয়া দিতে পারি। তদুত্তরে লোকটী বলিল যে তাহার কোন বিষয়েই বিশেষ প্রীতি নাই, তখন মহাত্মা বলিলেন "তবে তোমার কল্যাণের উপায়ান্তর দেখিনা"। অনুরাগ বৃত্তি তাহার যে আদৌ নাই এরূপ নাহে, কিন্তু তাহা এত বিক্ষিপ্ত ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে যে কোন বস্তুবিশেষে তাহার উপলব্ধি হইতেছেনা। এই বিক্ষিপ্ত ভাবই দুর্ব্বলতা, ইহাই রোগের মূল। এ অবস্থায় ইহা কোনও কার্য্যকরী নয়, এই ভাব একত্র হইয়া পুঞ্জীভূত হইলেই অনুরাগ বৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। তখন দুঃসাধ্যও সুসাধ্য হইয়া পড়ে।

দুর্ব্বল চিত্ত মানব! তুমি কোন পাপাসক্ত পুরুষকে দেখিয়া কদাচ ঘৃণা করিওনা। মনের বল তীব্র থাকিলে সে যে দিন নিজ কার্য্য কুকার্য্য বলিয়া বুঝিবে সেই মুহূর্ত্তেই সে তাহা হইতে বিরত হইবে, কেননা হৃদয়ের সে বল তাহার আছে—তখনই তাহার পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে—নরহন্তা রত্নাকর সদৃশ হৃদয়বান মহাত্মাই রামভক্ত বাল্মীকি হইয়া থাকেন, তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র হৃদয়ের সে কাজ নয়, তোমার অবস্থাই শোচনীয়—দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতেছে, রোগ ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে, প্রাণ শান্ত না হইয়া বরং শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে—দেখিতেছি তোমার সুখের পথ কণ্টকময়, তোমার বিষয়ভোগ কেবল কর্ম্ম ভোগ, তোমার পরিণাম বিষম! হৃদয়ে বল থাকিলে সাধুশিরোমণি না হইতে পার, পিশাচ-চূড়ামণি হইতে পারিলেও উপায় ছিল। প্রহ্লাদের ন্যায় প্রেমিক যদি না হইতে পার, ধ্রুবের ন্যায় ধ্রুব বিশ্বাস যদি না থাকে, হিরণ্য কশিপুর মত যদি হরিবৈরী হইতে পারিতে, কংসের ন্যায় যদি সর্ব্বকালেই কৃষ্ণারি হইতে, তাহা হইলেও ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি নিতান্ত হীনবীর্য্য তোমার সে পৌরুষ কোথায়! অনুকূল সাধনা তো সুগম, কিন্তু বিরূপ সাধনা—বীরাচার অতীব কঠোর ও দুঃসাধ্য, তাহা তোমার ন্যায় অল্প প্রাণের পক্ষে প্রকৃতই অসাধ্য। সে বল, বীর্য্য, তীব্রতা কৈ? রাবণ, কংস, কশিপু আদি এক এক জন এক একটী দুর্দ্দমনীয় তীব্র শক্তির অবতার, এই এক একটী শক্তি সংযমন জন্য ভগবান্‌কে বিশেষ বিশেষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কলিযুগের জীব তুমি, ক্ষুদ্রহৃদয় তুমি, তুমি কি বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ? তুমি মন মিটাইয়া পাপ করিতেছ, তথাপি, অবতার ত দূরের কথা, অন্যেও তাহার উপেক্ষা ভিন্ন লক্ষ্যও করে না। কেন? তুমি নিতান্ত অকিঞ্চন, প্রাণ ভরিয়া তীব্রতেজে পাপ করিবারও তোমার সামর্থ্য নাই, তোমাতে পাপেরও পূর্ণতা নাই। তুমি ভাবিলে নাস্তিক হইব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিব, আবার পরক্ষণেই বিভীষিকাময় বিষয়ের কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া তোমার অতীত কোন অসীম শক্তির অস্তিত্ব আপনিই মানিয়া ফেলিলে। দিবসে তোমাকে দেখিলাম, আত্মার অস্তিত্ব লোপ করিয়া পুনর্জ্জন্মবাদ লইয়া বিবাদ করিতেছ, আবার সেই তুমিই রাত্রিতে ভূতের ভয়ে ভীত হও কেন? পাশব প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া একটী স্ত্রীভোগেও তুমি সমর্থ নও, তুমি কৃষ্ণ-লীলার কি বুঝিবে? অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিলে—আবার পরক্ষণেই সে দর্প চূর্ণ হইল কেন? বুঝিতাম পূর্ণমাত্রায় অহংকারীই হইয়াছ, তাহা হইলেও তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইত *। সাকার উপাসনা মূর্খতাপ্রণোদিত প্রতিপন্ন করিয়া, বিপদে পড়িলে

* অহংকার শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বা কোন স্বার্থসাধনের সম্ভব বুঝিলে পরিত্যক্ত পদদলিত প্রস্তরে তোমার মাথা কুটিবার প্রয়োজন কেন হয় ? তুমি দেশাচার, শাস্ত্রবিধিকে কুসংস্কার বলিতে চাও, কিন্তু তোমাকে শব বহন করিতে হইবে জানিলেই স্ত্রীর তোমার গর্ভের সঞ্চার হয় কোথা হইতে ? সুতরাং শাস্ত্রে কুসংস্কার নাই, তোমারই মন কুসংস্কারপূর্ণ । তুমি এত দিন শাস্ত্রআজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, এতদিন দেশাচার বিচার করিলে না, এই শববহনের সময়ই শাস্ত্রবিধি এত বলবান্ হইল কেন ? এ বিধির ব্যত্যয় করিবার কি তোমার পুরুষার্থ নাই ? এত শাস্ত্রমর্য্যাদা এখনই বা আসে কেন ? বুঝিলাম এ তোমার দেশবিধিতে বিশ্বাস নহে, ইহা তোমার কাপুরুষতা । জানিলাম তুমি অতীব ধূর্ত্ত, ভীরু ও অন্তঃসারশূন্য, মূর্খ তুমি, তোমার সে হৃদয়ে আর্য্যতেজ থাকিবে কেন ? সুতরাং প্রকৃতই যদি নিজ কল্যাণ-কামী হও, তবে দেখিতে পাইবে বিপরীত ভাবনা সহজসাধ্য নয় । সেই জন্য বলিতেছি, সরল পথ অনুসরণ কর, আস্তিক্য বুদ্ধির আশ্রিত হও, বিশ্বাস, ভক্তি করিতে শিক্ষা কর । স্বীকার করিলাম, তোমার পূর্ব্ব সুকৃতি নাই —নতুবা এ দুর্দ্দশা হইবে কেন ?—অহৈতুকী ভক্তি—অচল বিশ্বাস ঈশ্বরানুগ্রহেই হইয়া থাকে সত্য ; কিন্তু যতক্ষণ তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিয়াছে, সে পর্য্যন্ত ভবভয়ের ভারটীমাত্র ভগবানের স্কন্ধে চাপাইয়া নিস্তার পাইবার আশা নাই । যতদিন কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি বদ্ধমূল থাকিবে, ততদিন নিজে যত্ন করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হও—অল্পে ২ যতটুকু পার প্রাণ পণে চেষ্টা কর—" স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ "।

অন্নপূর্ণা তো অন্নহস্তে সদৈব তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তুমি তো দুই পা অগ্রসর হইবেনা, তাই নিজের দোষেই ক্ষুধায় ক্লেশ পাইতেছ। একটু ক্লেশ করিয়া এক পা গিয়া শুন ঐ তিনি কি বলিতেছেন—

" তেষাং সততযুক্তানাং যোগ ক্ষেম বহাম্যহম্ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ ।"
দদামি বুদ্ধি যোগন্তান্ যেন মামুপযান্তি তে ।
কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

ইহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তোমার পরিণাম বড় বিষম । ঐ শুন—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।
নায়ং লোকোস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

তাই বলিতেছি এখনও সময় থাকিতে সাবধান হও ।

সাম্য ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের সৌভাগ্যই বল, দুর্ভাগ্যই বল বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষ বিদেশীয়গণের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী । ভারতবর্ষের নামে অসাধ্য সাধন হইয়াছে, ভারতবর্ষের গমনাগমনের সুগম পন্থা আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় শত ২ য়ুরোপীয় উত্তর মেরুর তুষারক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে । এই " আকাশের চাঁদ " ধরিবার জন্য কোথাকার লোক কোথায় যাইতেছে—হিন্দুর সম্রাট ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী ইংরাজ হইয়াছে । চিরদিনই সুবর্ণপ্রসূ ভারতের শ্যামল ক্ষেত্রে বিদেশী দস্যুগণ আসিয়া আপতিত হইয়া থাকে, চিরদিনই লোকমোহন ভারতের জন্য দেবদানবের সংগ্রাম হইতেছে । তজ্জন্য ভারতীয়গণকে সদাই সশঙ্কিত ও সাবধানে থাকিতে হয় । অনন্ত রত্নভাণ্ডার ভারতের অনেক অমূল্য নিধি অপহৃত হইয়াছে বটে, অনেক মুকুট-ভূষণ বর্ব্বরের চরণচুম্বন করিতেছে, কিন্তু সে সকলের নিমিত্ত আচার্য্যগণ তত চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহারা জানিতেন যে অনুসন্ধান করিলে পর্ব্বতকন্দর হইতে অগণিত হীরক খণ্ড সর্ব্বকালেই পাওয়া যাইবে । পরন্তু তাঁহারা আমাদের " ভারতীয়ত্ব" বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন যে এত বৈদেশিক প্রবল সংঘাতে হিন্দু-

গণ নিজস্ব হারাইয়া ফেলিবেন, মহাকালের বিরাট পরিবর্ত্তনের চক্রে পতিত হইয়া ঋষিকুমার ম্লেচ্ছের দাস হইবে। তাই হিন্দুর শিক্ষা এই যে সচল জগতে অচল পদার্থের অবতারণা করিতে হইবে, হিন্দুর সভ্যতা তাহাই, যাহাতে জাতি চিরকাল-স্থায়ী এবং সুসংবদ্ধ থাকে, হিন্দুর মধ্যে পুরুষ-প্রধান তিনিই, যিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন।

দেখা গিয়াছে যে, যাহা অমিশ্রিত, পবিত্র এবং প্রকৃত, তাহা বহুকাল-স্থায়ী, যাহাতে পরকীয় কোন সংস্রব নাই, যাহা নিজ সহজগুণের দ্বারা পরিচালিত, সহজ শক্তির দ্বারা উজ্জীবিত, তাহাই অবিনশ্বর। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ব্যবস্থা দেখিলে মনে হয় যেন কোন হতভাগিনী শতপুত্রকে যমের মুখে দিয়া, পরিশেষে এক অন্ধ রুগ্নবালকের প্রসূতি হইয়া তাহার দীর্ঘ-জীবন-কামনায় তাহাকে নানা উপদেবতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার আশায় এবং তাহাকে পবিত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে বহুবিধ কবচাদি গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। হিন্দুর নিজের কিছুই নাই—আছে কেবল অন্ধ পুত্র তাঁহার পবিত্র হিন্দুত্ব—সনাতনত্ব। এইটুকু নষ্ট হইলে হিন্দু নাম জগতের ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাইবে। আবার এই ক্ষুদ্র "নিজত্ব" টুকু রক্ষা করিতে পারিলে সুদিন হইলে ভাগ্য প্রসন্ন হইবে, সেই আর্য্যগণ পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন। মুসলমানদিগের সহস্রবৎসর-ব্যাপী ভীষণ অত্যাচারেও হিন্দুর জাতীয়ত্ব বেশ সজীব ছিল, কিন্তু বুঝি তাঁহাও আর অধিক দিন টিকে না। সাম্যের সম্মোহন মন্ত্রের তেজে সম্বদ্ধ হিন্দুসমাজ বিচ্ছিন্ন এবং শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

এখন দেখা যাউক কি উপায়ে পরপদানত হিন্দু এত দিন, এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, নিজের "জাতীয়ত্ব" শুদ্ধ এবং পবিত্র রাখিতে পারিয়াছেন। আমাদের হিন্দু-সমাজ-শৃঙ্খলার পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে এই উপায় আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিব। হিন্দু সমাজে ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্ব বড় গণ্য করা হয় না। সমাজে রাম বাবু শ্যাম বাবুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, সমাজ বুঝে রাম বাবু শ্যামবাবু কোন সংসার বিশেষের অন্তর্গত ব্যক্তিদ্বয়। হিন্দুসমাজ লোক-সমষ্টি নহে, উহা অনেক গুলি একান্নবর্ত্তী সংসারের সংযোগ-ফল মাত্র। শাস্ত্রের আদেশ আছে যে গৃহের স্বামী—গৃহপতি, তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি অনুগত এবং অধীন ব্যক্তিগণ পরিচালিত হইবে। তিনি খাইতে দিলে তবে তাহারা আহার পাইবে, তিনি পরিচ্ছদ দিলে তবে তাহারা লজ্জানিবারণ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা গৃহপতির চরণে আনিয়া ঢালিয়া দিবে। ব্যক্তি বিশেষ কেহই স্বোপার্জ্জিত অর্থের অধিকারী নহে; গৃহপতিও নহেন, তিনি কর্ত্তা—ব্যবস্থাপক মাত্র। পুত্রপৌত্রাদি জ্ঞাতি বর্গের সমষ্টি যে সংসার, উহাই উপার্জ্জিত বিত্তের অধিকারী। কিন্তু গৃহপক্ষে গৃহপতিই একমাত্র অধিকারী। গৃহের অথবা সংসারের খাতিরে ভার্য্যাপুত্রাদি তাহার ধন-স্বরূপ। মনু বলিয়াছেন—

"ভার্য্যাপুত্রাশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবং ধনং স্মৃতং।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনম্॥"

এস্থলে ধনশব্দে এই বুঝিতে হইবে যে যাহার ব্যবহারে ধনাধিকারীর বিশেষ উপকার হইতে পারে। ফলে ইহা স্থির যে, হিন্দুসমাজের ব্যষ্টি এক একটি সংসার (Family), ব্যক্তি (Individual) নহে। কারণ ব্যক্তি অধিকারী হইতে পারে না। ব্যাস বলিয়াছেন—

"স্থাবরং দ্বিপদঞ্চৈব যদ্যপি স্বয়মর্জ্জিতম্।
অসম্ভূয় সুতান্ সর্ব্বান্ ন দানং ন চ বিক্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ স্থাবর দ্বিপদাদি সম্পত্তি যদি নিজেই অর্জ্জন করিয়া থাক, তথাপি পুত্রাদিকে আহ্বান না করিয়া তাহাদের দান অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে না। তবেই উপার্জ্জনশীলের সম্পত্তির উপর পূর্ণাধিকার রহিল না, সম্মিলিত সংসারই তাহার অধিকারী হইল।

বাঙ্গালার জীমূতবাহন প্রাদেশিক স্বত্ববাদের অবতারণা করিয়া হিন্দুসমাজের সাম্প্রদায়িক স্বত্বকে (corporate ownership) ব্যক্তিগত অধিকারে নামাইয়া আনিয়াছেন। তথাপি বঙ্গদেশেও যাহা আছে, তাহাতে একান্নবর্ত্তী সংসারপ্রথা বিনষ্ট হয় নাই। দশজনে এক গৃহে বাস করিয়া সংসারের মঙ্গলকামনায় সকলে সচেষ্ট হইলে, সমর্থ অসমর্থকে আহারাচ্ছাদন দিলে দশজনের মধ্যে একটা একপ্রাণতা জন্মে, এবং সংসার-গর্ভে এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে। তাই শাস্ত্রে সামুদায়িক স্বত্বের প্রাধান্য দিয়া ব্যক্তিগত স্বত্বকে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে। এই রূপ সামুদায়িক স্বত্ব-প্রধান এক শত কিম্বা দুইশত সংসারের (Family) সমষ্টিতে একটি গ্রাম্য সমাজ সৃষ্টি হয়। এই গ্রাম্য সমাজের নৈতা ও অভিভাবক তদধিগত সংসার সকলের গৃহপতিগণ হইয়া থাকেন। সকল সংসারের সকল কর্ত্তারা একত্রে সমাজের শুভকামনায় যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই সকলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আবার এই সকল ক্ষুদ্র ২ গ্রাম্য সমাজের সমষ্টিতে একটা প্রাদেশিক বৃহৎ সমাজ গঠিত হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তি মাত্রের সংযোগে একটি সংসার সৃষ্ট হয়, এবং সংসার সকলের সমাবেশে গ্রাম্য সমাজ ও সমাজের সম্মিলনে প্রাদেশিক সমাজ সৃষ্ট হয়, ঠিক সেই ক্রিয়া দ্বারা প্রাদেশিক সমাজ সকল মিলিত হইয়া ভারতবর্ষের বিরাট হিন্দু সমাজ উৎপন্ন করিয়াছে। মনুষ্য স্বভাবতই সামাজিক, মনুষ্য একাকী থাকিতে পারে না; যে ব্যবস্থাপক মানব প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া সমাজের পরিপোষক করেন তিনিই প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং দূরদর্শী। সমাজকে সামুদায়িক স্বত্ব-প্রধান করাতে লাভ এই হইল যে, ব্যক্তি মাত্রেই সমাজের শক্তি পুষ্টি করিবে। পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলেও সমাজের উন্নতির প্রতি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি থাকিবে। কারণ সকলেই পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ আনিয়া সংসারে ঢালিয়াছে, নিজে একলা কেহই ভোগ করিতে পারে না। পারিশ্রমিকের অনুরোধে অনেককেই সংসারের জন্য ভাবিতে হইবে, নিজের ক্ষুদ্র শক্তি সংসারশক্তির পুষ্টির জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাহার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা করা যায়, স্বভাবতই তাহার উপর একটা মায়া জন্মে, তাহার মঙ্গলকামনা করিতে সদাই ইচ্ছা হয়। পক্ষান্তরে সমাজে যদৃচ্ছাচারের স্ফূর্ত্তি পাইবে না, যাঁহার যাহা অভিরুচি, তিনি তাহা করিতে পারিবেন না। ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতার বিপক্ষে সংসার দাঁড়াইবে, সংসারের উদ্দাম বৃত্তির রোধ সমাজ করিবে; সুতরাং খেয়াল মিটাইতে, সখের খাতিরে হঠাৎ কেহ সমাজের মতবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এই এক নীতি অনুযায়ী সমাজ সংগঠন করা হইয়াছে। তবে টীকাকার ও ব্যাখ্যাতা গণের ব্যাখ্যা ও টীপ্পনীর গুণে সকল প্রদেশেই ব্যবহারে পার্থক্য হইয়াছে। কাশীর লক্ষ্মীধর, দ্রাবিড়ের মাধবাচার্য্য, মিথিলার বাচস্পতিমিশ্র, বঙ্গের জীমূত এবং মহারাষ্ট্রের নন্দ পণ্ডিত, এই সকল ব্যাবহারিক বিভিন্নতার জন্মদাতা। তাঁহাদের শিক্ষা-গুণে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য নানা দেশে নানা ভাবে প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত দেশের জল বায়ুরও প্রাকৃতিক বৈষম্য দোষে লোকের প্রকৃতি ও স্বভাব ভিন্ন প্রকারের হইয়া পড়িয়াছে; এবং এই আচার পদ্ধতির পার্থক্য থাকাতে বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ীগণ এক জাতি বলিয়া বোধ হয় না; মনে হয় না যে ইহারা সকলেই আর্য্য ঋষিগণের বংশাবতংস। পরন্তু যেমন বিশাল সৌর জগতে মধ্যস্থিত সূর্য্যদেবের প্রবলা সমাকর্ষণী শক্তির প্রভাবে সকল গ্রহ উপগ্রহ, তারা নিজ২ কুক্ষির মধ্যে ঘুরিতেছে, সকলের মধ্যে আকারগত এবং প্রকৃতিগত ভিন্নতা থাকিলেও এক মহাশক্তির দ্বারা সমুজ্জীবিত এবং সংরক্ষিত; তেমনি বিশাল ভারতক্ষেত্রের

প্রাদেশিক সকল মণ্ডলী গুলি জলবায়ুর তারতম্যানুসারে কিছু ২ ভিন্ন ভাবাপন্ন হইলেও লোকপাবন সনাতন ধর্ম্মের সঞ্জীবনী শক্তির দ্বারা জীবিত এবং রক্ষিত রহিয়াছে।

অতঃপর বুঝিতে হইবে যে হিন্দুসমাজের এই অপূর্ব্বনির্ম্মাণ কৌশলে ইহার স্থিতিশীলতা কতদূর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম এই যে, শক্তি শক্তিকে পরাভূত করিবে। কোন প্রবল শক্তিকে অভিভূত করিতে হইলে এক সমশক্তির সঞ্চার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে গতি না হইলে পরিবর্ত্তন হয় না, যাহা অচল, তাহার পরিণতি নাই। তবে আদ্যা শক্তির রাজ্যে স্থির থাকিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। পরন্তু যাহা সৃষ্টিপ্রবাহের একটানা স্রোতে পতিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন সুদূর সাগর-সঙ্গমে, যে পদার্থ ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে তাহার বিনাশ সমাগত প্রায়। যে ক্ষুদ্র শক্তি বাহিরের প্রবল শক্তিকে স্বয়ং বাধা না দিয়া তাহার আক্রমণ সহ্য করিতে পারে, তদ্দ্বারা কবলিত হয় না, তাহাই স্থিতিশীলা এবং আয়ুষ্মতী। যে পুরাতন সমাজ বাহিরের প্রবল পরিবর্ত্তনের বেগকে বাধা দিতে অক্ষম, তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করিলে তাহার অন্তরে এমন ক্ষুদ্র ২ শক্তির সঞ্চয় করিতে হইবে যে বাহ্যিক প্রবলা শক্তির তাড়না কেন্দ্রীভূত ক্ষুদ্র ২ শক্তি সমষ্টি অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, তদ্দ্বারা যেন কবলিত না হয়। শক্তির প্রবল ফুৎকার শীঘ্রই প্রশমিত হয়, কিন্তু যে বেগ ধীরে ২ প্রবাহিত, অলক্ষ্যে অস্পষ্ট ভাবে যাহা ক্রিয়াশীল, তাহার দমন অসম্ভব! কাযেই অনবরত অবিরাম গতি উৎপন্ন করিতে হইলে বারুদে আগুনে মিলাইলে হইবে না; বিন্দু২ জল সঞ্চয় করিতে২ ক্ষুদ্র ২ সরিৎপথ নির্ম্মিত হইবে, তাহাদের মিলনে ক্ষুদ্র নদী হইবে, সেই নদী অপর অনেক নদীর সাহায্যে প্রবলা বেগবতী কল্লোলিনী হইয়া উঠিবে। তখন সেই বিশাল নদীর বেগ রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও হইবে না, উহা সর্ব্বংসহা হইয়াও দুকূল প্লাবিনী হইবে। পুরাতন হিন্দু সমাজ ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়াও জগতের চক্ষুঃশূল। ইহার বিনাশ চেষ্টা জগৎ শুদ্ধ সকলেরই করিতে ইচ্ছা হয়। তজ্জন্য পুরাতন সমাজ নানাবিধ বাহ্যিক প্রবল শক্তিকে স্বয়ং বাধা দিয়া নষ্ট করিতে পারে না, রাক্ষসীর সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণ পরাভূত করিতে অক্ষম। তাই চমৎকার কৌশলে এক অপূর্ব্ব কবচ ইহার রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক সংসার এক একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। এই স্বাধীন অস্তিত্ব এক একটি শক্তিকেন্দ্র, একটির সহিত অপরটির সংস্রব অল্প, সুতরাং একটি নষ্ট হইলে অপরটি নষ্ট হইবে না। যিনি একটি গ্রাম্য সমাজের উচ্ছেদ প্রয়াসী, তাঁহাকে বাছিয়া ২ একে ২ সকল সংসারকে নষ্ট করিতে হইবে। আবার এই সকল গ্রাম্য সমাজের সমষ্টিতে একটি প্রাদেশিক সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। এবং এই সকল প্রাদেশিক সমাজের সম্মিলনে বিরাট ভারত সমাজের উৎপত্তি। সংসার গর্ভস্থ কেন্দ্রীভূত শক্তি সমষ্টিতে সমাজ শক্তি পরিপুষ্ট হইতেছে। অতএব হিন্দু সমাজের স্থিতিশীলতা অবিনাশী। মুক্তাসকল একসূত্রে গ্রথিত থাকায় মনোহর এক মালা প্রস্তুত হয়। যদি সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলেও প্রত্যেক মুক্তাফলকে নষ্ট করা সময় সাপেক্ষ। তদ্রূপ হিন্দু সমাজকে নষ্ট করিতে হইলে বন্ধনী রজ্জু ছিন্ন করিতে হইবে, প্রাদেশিক সমাজকে মথিত করিতে হইবে, গ্রাম্য সমাজকে দলিত করিতে হইবে, পরিশেষে প্রত্যেক সংসারকে নষ্ট করিতে হইবে। এতটা করিলে তবে হিন্দুর ধাতু নষ্ট হইবে, হিন্দু নাম জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে। সনাতন সমাজ সৃষ্টি প্রবাহের প্রশান্ত একটানা স্রোতে পতিত হইয়া অনন্ত কাল ভাসিয়া চলিতেছে। মহাপ্রলয় কালে ইহা বিলুপ্ত

হইবে। বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের বিক্রম বিকাশে ইহা কখনই সংকুচিত হইবে না।

মনুষ্য সমাজ স্বভাবতঃ স্থিতিশীল, গতিশীলতা মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যেমা ধীরে ২ অল্পে ২ মহাশক্তি মহাপ্রলয়ের মহাআয়োজন করিতেছেন, মানব প্রকৃতিও তদনুযায়ী ক্রমে ২ পরিণতির পথে যাইতে প্রয়াসী। ক্ষণস্থায়ী পদার্থ মাত্রেই পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া থাকে, শীঘ্রই তাহারা সকল সাধ মিটাইয়া বিশুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য স্বভাবতঃই অমরত্ব—অবিনাশিত্ব পাইবার জন্য ব্যস্ত। কাযে কাযেই প্রকৃতির প্রেরণায় স্থিতিশীলতার দিকে মনুষ্যবুদ্ধি প্রধাবিত। পাশ্চাত্য জগতে এই যে পরিবর্ত্তনের ও উন্নতির বিষম ঝঞ্ঝাবাত উঠিয়াছে, উহা প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র, স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার নহে। গ্রীস্, রোম দুই দিনের চমক্ দেখাইয়া, বাহার দেখাইয়া জগৎকে ভুলাইয়া বড়ই বাহাদুরী লইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহারা কোথায়? হয়ত সাগর গর্ত্তের প্রতিধ্বনি উত্তর দিবে, কি জানি কোথায়। আপাত-মনোহর পরিণাম-বিষম ব্যাপারে বালক ভুলিতে পারে, উগ্রতপা আর্য্য ঋষিগণ ভুলিবার নহে। তাই তাঁহারা যে বাঁধুনির মধ্যে হিন্দু সমাজকে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করিতে এখনও সময় লাগিবে। কিন্তু যে যাদুকরী শিক্ষা আসিয়াছে, তাহাতে বুঝিবা হিন্দু সমাজকে অকালে প্রলয়সাগরে পতিত হইতে হয়। সাম্যই এই সম্মোহন মন্ত্র, এই যাদুকরী বিদ্যা। আমরা হিন্দু-সমাজের নির্ম্মাণ কৌশল বুঝিয়াছি, হিন্দু সমাজের ভিত্তি কোথায় অবগত হইয়াছি, এখন দেখিব এই দানবী মন্ত্র কেমন নিঃশব্দে এই অপূর্ব্ব সমাজ-শৃঙ্খলা বিচ্ছিন্ন করিতেছে, কেমন অনায়াসে হিন্দুর প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে। সাম্য উন্নতির ধুয়া নহে অবনতির ধুয়া, সভ্যতার শঙ্খধ্বনি নহে বর্ব্বরতার বিকট নাদ, চিরজীব আশীর্ব্বাদ নহে, মৃত্যুর ভয়ানক বিভীষিকা। এই যে ইউরোপের এত সভ্যতা, এত স্পর্দ্ধা এত গৌরব প্রতাপ; আজ যদি কোন কারণে সমগ্র য়ুরোপ খণ্ডের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে কল্যই দেখিবে, ইংরাজ ফরাসীস আদি সুসভ্য জাতি বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইবে। বৈষম্য না হইলে সমাজসৃষ্টি অসম্ভব, বৈষম্যই সমাজের ভিত্তি, সাম্য হইলে বৈষম্য দূরে যাইবে, সমাজ খণ্ড ২ হইয়া পড়িবে। বৈষম্যপ্রধান হিন্দু সমাজের বৈচিত্র্য, সাম্যের আবির্ভাব হইলে কেমন হঠাৎ চূর্ণ হইয়া যাইবে পরে আমাদের তাহাই আলোচ্য রহিল।

ক্রমশঃ।

জ্ঞানদেবচরিত।

নানা তীর্থ দর্শন করিয়া জ্ঞানদেব সমধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। চারি দিকে ভগবানের লীলা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মন উদার ভাব ধারণ করিয়াছিল। ভগবানের গুণকীর্ত্তন ও আপামর সাধারণের হিতসাধন যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ইহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এবং এই উদ্দেশ্য সংসাধনা করিবার জন্য তিনি দৃঢ়ব্রত হইলেন। দিবাভাগে তিনি সাধারণকে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং রাত্রিতে ভজন ও কীর্ত্তন করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি লোকের শিক্ষার নিমিত্ত দুই খানি উত্তম গ্রন্থ রচনা করিলেন। এক খানির নাম অমৃত অনুভব আর এক খানির নাম পৈঁসট্টী। ৬৫টী অভঙ্গ ইহাতে সন্নিবেশিত বলিয়া শেষোক্ত গ্রন্থ খানি পৈঁসট্টী নামে বিখ্যাত। জ্ঞানদেবের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কত অতি মূঢ় জ্ঞান লাভ করিল, কত সংশয়বাদী ভগবদ্ভক্ত হইল এবং কত কুপথগামী সৎপথ অবলম্বন করিল।

জ্ঞানদেবের খ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল দলে২ লোকে তাঁহার কাছে আগমন করিতে লাগিল।

ক্রমে আলন্দী একটী তীর্থস্থান হইয়া উঠিল । কিন্তু অধিকাংশ লোক পার্থিব সুখ লাভের আশাতেই আগমন করিত। লোকে জানিত যে জ্ঞানদেব যোগ-প্রভাবে অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং অনেকের বিশ্বাস ছিল যে তিনি তাহাদের বৈষয়িক অভাব পূর্ণ করিতে সক্ষম। কেহ পুত্র কামনায়, কেহ বা বিত্ত-কামনায় তাঁহার কাছে আগমন করিত। কিন্তু পরমার্থ-লাভের বাসনা অতি অল্পলোকেরই ছিল । যোগবল প্রকাশ করা যেখানে আবশ্যক বিবেচনা করিতেন, জ্ঞানদেব সেই খানেই তাহা প্রকাশ করিতেন। নতুবা, লোকের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যই তিনি সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিতেন। এই প্রকারে কএক বৎসর অতি-বাহিত হইলে পর, জ্ঞানদেব সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করত সমাধিস্থ হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । ইহা অবগত হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ নিবৃত্তিদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ইকি বিপরীত কথা। আমাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হওয়া তোমার পক্ষে উচিত নহে। আমারই অগ্রগামী হওয়া উচিত। নিবৃত্তিদেব জানিতেন যে জ্ঞানদেবের মন ঈশ্বর-প্রবণ, তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে । তথাপি স্নেহেতে আবদ্ধ হইয়া, জ্ঞানদেবকে আর দুই বৎসর সংসারে থাকিতে অনুরোধ করিলেন । জ্ঞানদেব জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালন করিলেন। দুই বৎসর অতি-বাহিত হইলে পর, জ্ঞানদেব পুনরায় সংসারত্যাগের কথা উল্লেখ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সোপান দেব তাঁহাকে আরো দুই বৎসর সংসারে থাকিতে অনুরোধ করিলেন । কনিষ্ঠের কাতর উক্তি তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না । সুতরাং জ্ঞানদেবকে আরও দুই বৎসর সংসারে থাকিতে হইল । এই সময় অতিবাহিত হইলে পর, তাঁহার ভগিনী মুক্তাবাই রোদন করিতে ২ জ্ঞানদেবের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং করুণ বচনে তাঁহাকে আরো কিছু কাল তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাঁহাদের দুঃখপূর্ণ জীবনে শান্তিদান করিতে অনুরোধ করিলেন । জ্ঞানদেব তাঁহার দুই ভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, এখন তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীর কথা কি প্রকারে উপেক্ষা করেন ? সুতরাং এ অনুরোধও তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইল । তিনি আরো দুই বৎসর সংসার মধ্যে অবস্থিতি করিলেন। ইহা লেখা বাহুল্য যে এই কএক বৎসর তিনি শাস্ত্র-আলোচনায় এবং উপদেশ দানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখন আর জ্ঞানদেবের সমাধি লইবার পক্ষে কোন বাধা রহিল না। তাঁহার পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইল। এখন তিনি ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । কথিত আছে যে, জ্ঞানদেব পাণ্ডারপুরে গমন করত বিঠোবা দেবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং সমাধি লইবার সময় তিনি তাঁহার ইষ্ট দেবতার দর্শন পাইয়াছিলেন। অভ্যাগত দিগের অবস্থিতি জন্য আলন্দীতে—একটী মণ্ডপ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে বিঠলদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জ্ঞানদেব “ আলন্দী মাহাত্ম্য ” নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই সময়ে নানা স্থান হইতে সাধু সজ্জনগণ আসিয়া উপনীত হইলেন । কার্ত্তিক মাসের একাদশীর রাত্রিতে নামদেব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। লোকে তাহা শুনিয়া মোহিত হইল । দ্বাদশীও এই রূপে অতিবাহিত হইল। ত্রয়োদশীতে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । যেখানে সিদ্ধেশ্বরের স্থান, সেই খানে একটী আজান বৃক্ষ আছে। এই স্থানটী জ্ঞানদেবের ভাল বলিয়া বোধ হইল। উক্ত বৃক্ষের তলে একটী গুহা প্রস্তুত হইল । ইহা দুই অংশে বিভক্ত । গহ্বরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, জ্ঞানদেব সাধু, সজ্জন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, সকলের সহিত আলাপ করিলেন, যথাযোগ্য তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন এবং সকলের কাছে

ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও সদুপদেশ হইতে বঞ্চিত হইবেন বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি যে এত কাল তাঁহাদের হিত সাধন করিয়া আসিতেছিলেন ইহা স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার জীবনের শেষ অংশ ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করা উচিত বিবেচনা করিয়া, কেহ আর তাঁহাকে বাধা দিলেন না। তদনন্তর, জ্ঞানদেব সকলের অনুমতি লইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কুশাসন ও মৃগাজিন পাতা ছিল। জ্ঞানদেব তাহার উপর পদ্মাসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে, যোগবাশিষ্ঠ জ্ঞানেশ্বরী প্রভৃতি কএক খানি গ্রন্থ রাখিয়া দিলেন। গুহার মধ্যে চারিটী দীপ জ্বলিতে লাগিল। জ্ঞানদেব ইন্দ্রিয় দ্বার সকল রোধ করত ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইলেন। এই সময়ে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, আকাশ হইতে দুন্দুভির ধ্বনি শ্রবণ-গোচর হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে "শ্রী জ্ঞানদেবো জয়তি" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহারা স্ব ২ স্থানে গমন করিলেন।

ক্রমশঃ।

কঙ্গ্রেস্ ও সমাজ।

১৮১০ শকাব্দার ধর্ম্মপ্রচারকে ধর্ম্মসভা ও কংগ্রেস্ নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে আমরা বলিয়াছিলাম, "আমরা যত দূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, কঙ্গ্রেসের দুইটি মূর্ত্তি আছে। একটি প্রকাশিত অপরটি অপ্রকাশিত। রাজনৈতিক মূর্ত্তি ইহার প্রকাশিত, সামাজিক মূর্ত্তি আবরণের ভিতর বিরাজ করিতেছে"। কিন্তু এবারকার ষষ্ঠ অধিবেশনে কঙ্গ্রেসের সামাজিক মূর্ত্তিও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাই হইতে তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও এবার কঙ্গ্রেস মণ্ডপেই সোসিয়াল্ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। কঙ্গ্রেসের প্রধান ২ মুরুব্বিরা এ সামাজিক সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ আইনের বলে উঠাইয়া দেওয়া, বিলাতফেৎরকে সমাজে গ্রহণ করা ইত্যাদি নানাবিধ অহিন্দু প্রস্তাব উক্ত সমাজ সংস্কারক সভার সিদ্ধান্তের বিষয়। যখন হিন্দুদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কঙ্গ্রেস মণ্ডপে সামাজিক সমিতির অধিবেশন হইল, তখন কঙ্গ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষের অনেকেরই যে সমাজসংস্কার সভায় তলে ২ সহানুভূতি আছে ইহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছে। এ সম্বন্ধে অমৃতবাজারও সন্দিহান হইয়াছেন। সহযোগিনী হিন্দুরঞ্জিকা, যিনি এত দিন আমাদিগকে বুঝাইয়া আসিতেছিলেন, কঙ্গ্রেসের সহিত সমাজ-সংস্কারের কিছু মাত্র সংশ্রব নাই, তিনিও এখন কি বলিতেছেন শুনুন—

"ঘুম ভাঙ্গিবে কি?

দেখিবে কি চক্ষু মেলে? হিন্দু! নিশি ডাকিল, তুমি ঘুমের ঘোরে পাছে পাছে চলিলে। দেখিলে না কাহার পাছে পাছে যাইতেছ? কংগ্রেস বিলে কাদার মধ্যে তোমাকে মাথা নীচে এবং পা উপরে করিয়া পুতিয়া রাখিবে তাহা কি ভাবিলে না? সুবর্ণ কঙ্কণের লোভে ব্যাঘ্রের কথায় ভুলিয়া কংগ্রেস পুখুরে স্নান করিতে চাহিতেছ, জান না উহাতে সমাজ সমিতি রূপ ভয়ানক পঙ্ক আছে, পড়িলে আর উঠিতে পারিবে না। প্রাণে মরিবে। এখনও চক্ষু মেলিয়া দেখ কংগ্রেস তোমার নহে, তোমার উহাতে স্বত্ব নাই, নিশিরূপী, ব্যাঘ্ররূপী সংস্কারকদের কংগ্রেস। তোমার উহাতে কোন অধিকার নাই। দেখিলে ত! রাজসাহী-বাসী, বোম্বাই বাসী হিন্দুগণ পত্র লিখিল, তারে সংবাদ দিল, তারস্বরে বলিল কংগ্রেস মণ্ডপে সমাজ সমিতি করিও না। শুনিল কি তাহারা? যাহাদের কংগ্রেস তাহারা কি শুনিল? না, শুনে নাই। তোমাদের হইলে তো তোমাদের কথা শুনিবে? এই শুন, গত রবিবারে কংগ্রেস মণ্ডপে সমাজ সমিতি হইয়া গিয়াছে। দৈনিক সংবাদ আনিয়াছে, বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার হইয়া ছিলেন সভাপতি। এখনও কি বলিবে, কংগ্রেস আমাদের! তাই বলি হিন্দু ভাঙ্গহ ঘুমের ঘোর দেখহ চাহিয়া। কিন্তু হায় তাই কি হবে? তোমাদের ঘুম ভাঙ্গিবে কি?"

হিন্দুরঞ্জিকার স্বরে আমরাও বলিতে চাই, হিন্দু! তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে কি? বৃথা রাজনৈতিক প্রলোভনে ভুলিয়া কঙ্গ্রেসের কুহকে মজিওনা। রাজনৈতিক উপকার ত এ পর্য্যন্ত কঙ্গ্রেসের দ্বারা কিছুই হইল না, বরং সামাজিক ঘোরতর অনিষ্ট হইবার সূত্রপাত হইতেছে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিবে না?

যাহারা কংগ্রেসের ক্ষমতাপন্ন পৃষ্ঠপূরক, তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকেই ত "সহবাস-সম্মতির আইন" লইয়া গোলযোগ তুলিয়াছে। যাহারা হিন্দু সমাজচ্যুত, হিন্দু সমাজের কোন বিধি ব্যবস্থা যাহারা মানিয়া চলেনা, আপনার স্বাধীন চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা শাস্ত্রীয় চিন্তাকে পদাঘাত করে, এবম্বিধ প্রকৃতির লোকই কংগ্রেসে অধিক। এই সম্প্রদায়ের অধিক লোকই হিন্দু সমাজ ভ্রষ্ট হইয়াও আপনাদিগকে হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে বুঝাইতে চাহে। এই প্রকৃতির লোকেই age of consent সম্বন্ধে বিষম চীৎকারে গবর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছেন, হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন সহবাস-সম্মতির বয়োবৃদ্ধি সম্বন্ধে আগ্রহ পূর্ব্বক আইন চাহিতেছে, তখন সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আর কোন বাধা নাই। যাহারা এতৎ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতেছে, তাহারা মূর্খ-অজ্ঞ। তাহাদের কথা শুনিবার যোগ্য নহে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্ট আইন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এখন উপায় কি? কর্ত্তব্য কি?

হিন্দু সমাজ! এখন আর নীরবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সামান্য প্রতিবাদে কোন কায হইবে না। গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছেন, সতীদাহ-প্রথা উঠাইবার সময় হিন্দু সমাজে যেরূপ ক্ষণিক প্রতিবাদ হইয়াছিল, এখনকার প্রতিবাদও সেই রূপ। এ প্রতিবাদের ক্ষীণপ্রভা ক্ষণপ্রভার মত এখনই বিলীন হইয়া যাইবে। এখন হিন্দু-সমাজ সতীদাহ উঠিয়া যাওয়ার দরুণ যেমন সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে, সেই রূপ ঋতুমতী বালিকা-সহবাসের বর্ব্বর প্রথা উঠিয়া গেলে হিন্দু সমাজ ভবিষ্যতে আনন্দিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট হয় তো এই রূপ ভাবিতেছেন। সুতরাং প্রতিবাদের সুর আরও দ্বিগুণ চড়াইয়া ধরিতে হইবে। হিন্দু সমাজের অন্তস্তল হইতে প্রতিবাদ যাইতেছে, গবর্ণমেণ্টের কাছে এই রূপ প্রতিপন্ন করিতে হইবে। আমাদের কাতর ক্রন্দন, স্তুতি মিনতি প্রার্থনা, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গৃহে অগ্নি লাগিবার সম্ভাবনা হইলে গৃহস্থ যেমন মনোবেদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠেন, সেই রূপ ব্যাকুলিতান্তঃকরণে, যাহাতে বাল্য বিবাহের আইন হিন্দুর অন্তঃপুরে অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত না করে, তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে হইবে, উদ্যোগ আয়োজন রীতিমত করিতে হইবে। বিপক্ষদের সামর্থ্য, চেষ্টা, আয়োজন, উদ্যম অতি তীব্র। সুতরাং সে চেষ্টাকে পরাজিত করিতে হইলে বিপুল শক্তির বিনিয়োগ করিতে হইবে।

বিপক্ষগণ নিজমত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন, হিন্দুগণ তাহার শতাংশের একাংশও করিতেছেন না। রাজা আমাদের বিদেশীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। তিনি আমাদের সমাজের ধাতু, প্রকৃতি নিজে কিছুই বুঝেন না। বিপক্ষগণ যেমন তাঁহাকে বুঝাইতেছেন, তিনি তেমনই বুঝিতেছেন। হরিমোহন মাইতির ব্যাপার লইয়া বাল্যবিবাহের এমনই একটা বিকট চিত্র গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে ধরা হইয়াছে, যে তিনি তাহাতে চমকিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু সে চিত্র যে নিতান্তই মিথ্যা, তাহা হিন্দুচিত ভাবে হিন্দুর পক্ষ হইতে এখনও বিশেষ করিয়া কিছু গবর্ণমেণ্টকে বুঝান হয় নাই। এই যে পার্লেমেণ্টের মেম্বর কেন সাহেব ভারতে আসিলেন, তিনি অহিন্দু ভাবাপন্ন বাবুদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াই বুঝিয়া গেলেন, যেমন মদে ভারতবর্ষ উৎসন্ন যাইতেছে, সেই রূপ বাল্যবিবাহ নামক একটা বর্ব্বর প্রথায় দেশ অধঃপাতের পথে চলিয়াছে। বাবু গণ তাঁহাকে যেমন বুঝাইয়াছেন, তিনি তেমনই বুঝিয়াছেন। কৈ কয় জন হিন্দুমতাবলম্বী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন? এই কেন

সাহেব ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে যে রূপ ধারণা ও সংস্কার লইয়া চলিলেন, বক্তৃতায় ইহার উপর আরও একটু রং চড়াইয়া তিনি হয়ত বিলাতে প্রচার করিবেন, বাল্য-বিবাহের নিদারুণ বিষে ভারত সমাজ জর্জ্জরিত। বাল্য-সহবাসের ভীষণ অত্যাচারে সহস্র ২ ভারত ললনা প্রতিদিন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, বাল্য-বিবাহের গুণেই ভারতবাসী ক্ষীণপরমায়ু দুর্ব্বল হইতেছে, বহুমূত্রে ভারতের যত চিন্তাশীল ব্যক্তি মারা গিয়াছে, তাহার এক মাত্র কারণ বাল্যবিবাহ। অতএব ভারতবাসীর সুখ সমৃদ্ধি শান্তি সম্বর্দ্ধনার্থ ঐ রাক্ষসী প্রথা বাল্যবিবাহকে আইনের বলে উঠাইতেই হইবে। কেন সাহেব এই ভাবে বিলাতবাসীকে ভারত সমাজ সম্বন্ধে উত্তেজিত করিতে পারেন। ইহার জন্য তাঁহাকে কোন দোষ আমারা দিতে পারিনা। তিনি সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই, যেমন আমাদের সমাজতত্ত্ব বুঝিয়াছেন, সেই রূপই প্রচার করিবেন। ইহার উপর আবার মালাবারি প্রমুখ সংস্কারক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা ত সর্ব্বদাই সুর ধরিয়া আছেন। আজ ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় বাল্যবিবাহ বা বাল্যসহবাসের আইনের কথা উঠিলে তাহার বিরুদ্ধে হিন্দুচিত ভাবে প্রতিবাদ করিবার লোক বেশি নাই। সর্ব্বত্রই বিপক্ষগণ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং 'হিন্দু-সমাজ এখন ভিতরে বাহিরে চারিদিকে শত্রুমণ্ডলী' কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। এমন অবস্থায় "গবর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না" এই রূপ বৃথা আশায় প্রলোভিত হইয়া চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিলে আর চলিতেছে না। হিন্দু সমাজ! আর নীরব-নিশ্চেষ্ট-ঘোর সুষুপ্তির সাগরে নিমগ্ন থাকিওনা। ঘোর নিদ্রা পরিহার করিয়া একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, তোমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তোমার সমাজশিরে তোমার ধর্ম্মের মেরুদণ্ডে বিষম বজ্রাঘাত করিবার সূচনা হইতেছে। আকাশে কালো মেঘ দেখা দিয়াছে। চারিদিকেই বিদ্যুৎ হানিতেছে। ভীম গর্জ্জনে দিগন্ত বিকম্পিত হইতেছে, প্রলয় ঝটিকার আভাস পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু সমাজ! এই বেলা সাবধান হও। সময় থাকিতে সাবধান হও! তীব্র আন্দোলনে আকাশ পাতাল এক করিতে হইবে। প্রতি জেলায় ২ প্রতি নগরে ২ প্রতি গ্রামে ২ তারস্বরে প্রতিবাদ করিতে হইবে। দুই একটা মন্তব্য পত্র বা টেলিগ্রাফে কিছুই হইবে না। হাজার ২ টেলিগ্রাফ হাজার ২ আবেদন পত্র গবর্ণরজেনেরলের কাছে প্রতিদিন স্তূপে ২ পাঠাইতে হইবে। প্রতিজেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া কৃষকগণ, শ্রমজীবীগণ, মধ্যবিত্তগণ, গৃহস্থগণ প্রার্থনা করুন "আমরা এ আইন চাহি না। আমরা বেশ আছি, বাল্যবিবাহে আমাদের পরমায়ু কমে নাই, এখনও আমাদের সমাজের কত শতবর্ষজীবী পুরুষ ৺ কাশীধামে বাস করিতেছেন। ঋতুমতী বালিকার গর্ভাধান সংস্কার আমাদের ঋষিদের বিধিবদ্ধ ব্যাপার—ধর্ম্মের সহিত এক সূত্রে গাঁথা ৷ ডাক্তারদের কথায় ইহার উপর আঘাত করিবেন না। ধর্ম্ম আমাদের অন্তরের বস্তু। আমরা ধনচ্যুত মানচ্যুত রাজ্যচ্যুত স্বাধীনতাচ্যুত হইয়াছি, কিন্তু ধর্ম্মচ্যুত হইতে পারিব না।"

আজ আইনের বলে, বালিকার দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পরই সহবাসের উপযুক্ত সময় এই রূপ একটা গণ্ডী যদি বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন কি রূপ ভয়ানক অত্যাচার হইবে। কুলবধূ যদি একাদশ বর্ষ বয়সেই রজস্বলা হয়েন, তাহা হইলে গর্ভাধান-সংস্কার রূপ ধর্ম্ম রক্ষার্থ হিন্দু স্বামী যদি সেই স্ত্রীতে উপগত হয়েন তাহা হইলে সে সম্বাদ কোন ক্রমে জানিতে পারিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ শমন দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন। অতএব স্পষ্টতঃ ধর্ম্মের উপর আক্রমণ হইল। এ বিষম অত্যাচারের কথা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট বুঝাইতে চাহেন পুলিশের কোন রূপ অত্যাচার হইবে না, কিন্তু

ইহা এখন তাঁহার স্তোভ. বাক্য মাত্র। গবর্ণমেণ্ট ধীরে ২ সহাইয়া ২ সমাজবক্ষে গুপ্ত ছুরিকার আঘাত করিতে চাহেন। আপাততঃ পীনালকোডের নিয়মানুসারে সহবাস সম্মতির বয়স দশম বৎসর নিরূপিত আছে, নূতন আইনে ইহাকে দ্বাদশ বৎসরে পরিণত করা হইবে। দ্বাদশ বৎসরের পর আবার হয়ত দিন কতক বাদে ইহাকে ষোড়শবর্ষে পরিণত করিবার চেষ্টা হইবে। এই রূপে ধীরে ২ আইনের বলে হিন্দু সমাজে পূর্ণরূপে যুবতীবিবাহের প্রচার করা হইবে। যুবতী বিবাহের প্রচার হইলেই ডাইভোর্স প্রথারও [স্বেচ্ছানুসারে স্ত্রী স্বামিপরিত্যাগের পদ্ধতি] প্রচলন আবশ্যক হইয়া উঠিবে। তার পর হয়ত যুবতী বিধবাদের কষ্ট মোচনার্থ বাবুগণ গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করিবেন, যেহেতু বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সমাজে ভ্রূণহত্যা হইতেছে, একাদশী উপবাসাদি নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচারে বিধবাগণ নির্য্যাতিত হইতেছে অতএব বিধবাদের রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আইন করা উচিত। বাল্য-সহবাস উঠাইয়া দিয়া যেমন গবর্ণমেণ্ট বালিকাগণকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই রূপ বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিয়া হিন্দু সমাজের তীব্র অত্যাচার হইতে বিধবাগণকেও রক্ষা করিতে তিনি বাধ্য। যে হেতু প্রজারক্ষাই রাজার, ধর্ম্ম। এই রূপ যুক্তি বাদের অবতারণায় বিধবাবিবাহের আইনও প্রচলিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এখন বালিকাগণকে রক্ষা করিবার জন্য মনোনিবেশ করিয়াছেন, এরপর বিধবাগণকে রক্ষা করিবার জন্য যে ভবিষ্যতে মনোনিবেশ করিবেন না, ইহাত কিছুতেই মনে হয় না। আজ হরিমোহন মাইতির মোকদ্দমা উপলক্ষে বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে বাল্য সহবাসের আইন হইল, ইহা দেখিয়া উৎসাহিত চিত্তে বাবুগণ ভ্রূণ হত্যার কোন মোকদ্দমা হইলেই তাহা লইয়া বিধবাবিবাহের আইনের জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে তুলুতামাল করিয়া তুলিবেন। সুতরাং হিন্দু সমাজ! ভাবিয়া দেখ কি সাঙ্ঘাতিক বিপৎপাতের সূচনা হইতেছে!! তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম, সামাজিক শান্তি, ইহ লোক পরলোক সমস্তই ভস্মসাৎ হইতে বসিয়াছে!! যে ধর্ম্ম তোমার প্রাণের সম্পত্তি, যে পরলোকের প্রতি তাকাইয়া এ ঘোর দুর্দ্দিনেও এ বিভীষণ কালরজনীর করালকুক্ষিগত হইয়াও তুমি আশার আলোক দেখিতে পাও, দেখ সে সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে বসিয়াছে। অন্তর হইতেও অন্তরতম প্রদেশের নিভৃত কোণে যে আশা ভরসা লুকাইত রাখিয়া ধার্ম্মিক আর্য্যসন্তান! তুমি জগতে বাঁচিয়া রহিয়াছ, আজ দেখ তাহার মূলদেশ উৎপাটিত হইতেছে। বাহিরে শত পদাঘাত শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও যে সামাজিক শান্তির সুশীতল ছায়ায় বসিয়া তুমি একটু জুড়াইবার অবকাশ পাইতে, আজ সেই শান্তিময়ী কল্পলতিকা চিরদিনের জন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইতেছে। হিন্দু! তোমার জীবন ভিতরে বাহিরে কণ্টকাকীর্ণ করিবার আয়োজন হইতেছে। এমন অবস্থায় আর অসাড় নিস্পন্দ নীরব থাকিও না। প্রতিবাদের বৈদ্যুতিক তেজে গবর্ণমেণ্টকে সচেতন করিতে হইবে। বুঝাইতে হইবে, কয়েকটি স্বেচ্ছাচারী বাবু লইয়া হিন্দুসমাজ নহে, কয়েকটি মুষ্টিমেয় উচ্ছৃঙ্খল বাবু লইয়া আপনাদের রাজত্বও নহে। এই রূপ সমাজিক ব্যাপারে হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থ যাঁহারা, তাঁহাদের কথাই শুনিতে হইবে। বাবুদের কথাই কেবল যদি শুনেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে লইয়াই সুখে রাজত্ব করুন, আমাদিগকে বিদায় দিউন।

কেবল সভা সমিতি হইতেই প্রতিবাদ করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। যাহাতে ভারতের হিন্দু রাজা মহারাজাগণ প্রতিবাদ করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের সকল সমাজই এই ধর্ম্মবিরোধী আইনের বিরোধী, তাহা নিশ্চিত কথা। তবে ভারতীয় সমাজ-শরীরের যে ২ অঙ্গ নিদ্রিত, তাঁহাদিগকে এই

বিপত্তির কথা বুঝাইয়া সজাগ করিতে হইবে। মহারাজ সিন্ধিয়া, মহারাজ হোল্‌কার, মহারাজ ভরতপুর আদি যে সমস্ত ধর্ম্ম পরায়ণ রাজা মহারাজা আছেন, ইঁহাদের দরবার হইতে প্রতিবাদ গেলে তাহা নিতান্তই নিষ্ফল হইবে না। স্বাধীন নেপাল দরবার হইতে প্রতিবাদ গেলেও অল্প ফল ফলিবে না। চেষ্টা চাই, উদ্‌যোগ চাই, রীতিমত ব্যবস্থা চাই। নিতান্তই নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। গবর্নমেন্ট যদি বুঝিতে পারেন, উক্তরূপ আইনের প্রতি দেশশুদ্ধ লোক বিরূপ, তাহা হইলে আইন নাও বিধিবদ্ধ হইতে পারে, কেননা গবর্ণমেণ্টের উক্ত রূপ আইন প্রচারে এমন কোন বিশেষ স্বার্থ নাই। এখানকার গবর্ণমেণ্টের কাছে যদি আমরা পরাস্ত হই, তবে বিলাতের পার্লেমেণ্ট পর্য্যন্ত চেষ্টা দেখিতে হইবে। এই ত চেষ্টা করিবার সময়। যাঁহারা নব্য হিন্দুধর্ম্মের প্রধান আন্দোলনকর্ত্তা, তাঁহাদের এই উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের সময়। সকলকেই তীব্রতেজে এখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। চেষ্টা যতদূর করা উচিত তাহা করিতে হইবে। ফল তাঁহার হস্তে। আমাদের পক্ষে যেন চেষ্টার ত্রুটি না হয়।

ধর্ম্মোৎসব।

ছাপরা।

বিগত ১০ই হইতে ১৪ই পৌষ পর্য্যন্ত ছাপরা ধর্ম্মসভার ৭ম বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন শ্রীসত্যনারায়ণের পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের "মূর্ত্তি পূজা ও কৃষ্ণাবতার" বিষয়িণী সুললিত বক্তৃতা হইয়াছিল। ৩য় দিন বনওয়ারি লালের ধর্ম্মশালা সরাইয়ে, ৪র্থ ও ৫ম দিন শ্রীযুক্ত কার্য্য সম্পাদক মহাশয়ের প্রাঙ্গনস্থ চন্দ্রাতপচ্ছায়ায় কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় কর্ত্তৃক "কর্ম্ম ও ধর্ম্ম," "রোগ ও চিকিৎসা," এবং "সংসার সমুদ্র পার" বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। ৪র্থ দিনের মহাসভায় "স্ত্রী সমাগম কাল" সম্বন্ধে পণ্ডিত, উকিল ও অন্যান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল, এবং যাহাতে এতদ্বিষয়ে রাজকীয় হস্তক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য সকলে একবাক্যে গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন পাঠাইলেন। সভার উৎসাহ ও উৎসব দেখিয়া সহৃদয় মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন। সাহেব ভিন্ন সমস্ত হাকিম, উকিল, ও অন্যান্য শিক্ষিত অশিক্ষিত মাত্রেরই সহযোগিতা এই সভায় দৃষ্ট হইল।

তেলেহাটী (জেলা হাবড়া)

১৯এ হইতে ২১এ পৌষ এই ৩ দিন তেলেহাটী আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার ৪র্থ বার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। এই উৎসবে মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ও কুমার-পরিব্রাজক মহোদয় ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা দ্বারা শত ২ ব্যক্তির ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপিত করিয়া দেশবাসী গণকে যৎপরোনাস্তি সুখী করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গুলি গ্রাম হইতে ও কলিকাতা হইতেও অনেক ভদ্র লোক ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই এই সভার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার যত্নে সভাটীর দিন ২ উন্নতি হইতেছে।

পাবনা ধর্ম্মসভার উৎসব বিগত ১২ই পৌষ হইতে ১৬ই পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২৭শে অগ্রহায়ণ হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট বাল্যাশ্রমের চতুর্থ বার্ষিক মহোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুকুলভূষণ মহাত্মা দ্বারবঙ্গাধীশ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই আমাদের বেদবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এবং এক কালীন দান ১২৫৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভারতের রাজা মহারাজা গণ ধর্ম্মার্থকার্য্যে এই রূপ মুক্তহস্ত হইলে আর কি ভাবনা থাকে? এই রূপ দানে পার্থিব রাজার কাছে কোন রূপ সম্মান লাভের আশা নাই বটে, কিন্তু যিনি রাজরাজেশ্বর, তাঁহার দরবারে আজ দাতার অধিকার অক্ষুন্ন হইল। বেদবিদ্যা স্বরূপিণী মা অন্নপূর্ণা মহারাজের সার্ব্বাঙ্গীন কুশল বিধান করুন। আশা করি দেশের অন্যান্য ধনীগণ এই সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

আমরা অদ্য গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত কালী প্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের ৺ কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি শিবলিঙ্গ-পূজা পদ্ধতি ও শ্রীমন্নারায়ন পূজা পদ্ধতি নামক পুস্তক দুই খানি মুদ্রিত করিয়া অনেককে বিতরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সাধারণের কাছে অপরিচিত নহেন। উক্ত মহাত্মা আজীবন এক জন অতি নিষ্ঠাবান আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। গত ১১শে পৌষ উক্ত মহাত্মা বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পাদন পূর্ব্বক পিণ্ডাদি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিবার জন্য বাটির বাহির হন। তাঁহার মস্তিষ্কের ব্যারাম ছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে আসিয়া তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হওয়ায় তিনি রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন। যাই বসিয়া পড়িলেন, আর অমনি মৃত্যু হইল। সঙ্গে কেহই ছিল না। রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। এমন সময় তাঁহার চাকর জল আনিতে আসিয়া প্রভুর মৃতদেহ দেখিতে পাইল। ডুলি করিয়া মৃতদেহ গৃহে লইয়া গেল। পিতৃতিথিতে ৺ পিতার শ্রাদ্ধ রূপ প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আজ উপযুক্ত পুত্র পিতার আহ্বানে পিতৃক্রোড়ে চলিয়া গেলেন! ধর্ম্মাত্মার মৃত্যু এই রূপই হইয়া থাকে। ইঁহার অভাবে ভারতবর্ষীয় আর্য্য সভা নিতান্তই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ইঁহার সাধু উদ্যম ও সাধু চেষ্টার জন্য সভা ইঁহার কাছে চির ঋণী হইয়া থাকিলেন।

নিম্ন লিখিত স্থান গুলির ধর্ম্ম সভা হইতে সহবাসের আইন সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া গবনরজেনেরল বাহাদুরের কাছে টেলিগ্রাম ও আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে।

৺ কাশীধাম, পাবনা, রামগোপালপুর, সিরাজগঞ্জ, বহরমপুর-সৈদাবাদ, কুমিল্লা, বীরভূম, রামপুর হাট, ২৪ পরগণা-নিবাড়গ্রাম, শ্রীহট্ট, কোচবেহার, শিলং, গঙ্গা, নবদ্বীপ, গয়া, বাখরগঞ্জ, বর্দ্ধমান, বারদ্রোণ, পাবনা।

ক্রমশঃ।

বেদ বিদ্যালয়ের অগ্রহায়ন ও পৌষ মাহার আয় ব্যয়ের হিসাব।

মুষ্টি ভিক্ষার আয়	মাস অগ্রহায়ণ	পৌষ
শ্রীভুবন কৃষ্ণ ঘোষ লক্ষ্ণৌ	৩।০	”
” দুঃখী বালক বাজিতপুর বর্দ্ধমান	৶০	।৶০
” দীননাথ পাত্র রামপুরহাট	৩॥৶০	৩৶০
” দ্বারকানাথ গুপ্ত মাহিগঞ্জ রংপুর	১৲	”
” উমেশচন্দ্র মহল্লানবিস করিমগঞ্জ	১।৶০	”
” মধুসূদন দাস গোয়ালপাড়া	৮৲	১১॥০
” বিপিন বিহারি রায় গয়া	৶০	৶০
” রাজিব লোচনদাস সেনা শ্রীহট্ট	৬৲	”
” নিত্যকিঙ্কর আঢ্য বর্দ্ধমান	॥০	”
” প্রসন্ন নারায়ন চৌধুরী নাটোর	৫৲	”
” হরিনারায়ণ চৌধুরী বারাণসী	৩৲	”
” রতিকান্ত গুহ কাড়খালি বরিশাল	৩৲	”
” কৃষ্ণনাথ সিংহ রায় নাকাসীপাড়া	২৸৶০	”
” তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সৈদাবাদ	৩৸৶০	”
কালীব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় গদাইপুর মুর্শিদাবাদ	॥৶০	”
” শ্রীনাথ শর্ম্মা দীনহাটা	৩৲	৩৲
” অক্ষয়চন্দ্র আচার্য্য কুমড়াবাদ দুমকা	৩৲	”
” কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়িয়া	৭৶০	৫৲
” শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী জালাইপুর	৫৲	”

" রমনীমোহন বসু দিনাজপুর	৮৸৶০	"
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় কুণ্ডলা বীরভূম	৯৲	"
" দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ঢাকা	"	২৲
" গুরুদয়াল চাকী দামোদরপুর রঙ্গপুর	"	৩॥০
" হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দাঁইহাট	"	১৪৲
" প্রাণকৃষ্ণ দে শিলকুঁড়	"	৩৲
" ভূপতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চাকলা ২৪ পং	"	১১॥০
" কালীনাথ বসু শ্রীনগর ঢাকা	"	৪।৶০
" বরদাশঙ্কর দাস গুপ্ত ডাঙ্গা ফরিদপুর	"	৫৲
" দীননাথ দাস পিরোজপুর বরিশাল	"	২৶০
" রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী দাঁড়কা বীরভূম	"	১৫
" হরলাল দাস গুপ্ত ধবড়ি	"	৯॥০
" কালীদাস চক্রবর্ত্তী আমদপুর	"	২৸০
" কাশীনাথ সাহা পাবনা	"	॥০
" শরচ্চন্দ্র রায়, পাঁচকোলা পাবনা	"	৪॥০
" রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাছাড়	"	৮৲
৺ কাশীধামের শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন কার্ত্তিক মাহার মুষ্টি ভিক্ষা	"	৫৪/০
শ্রীগৌর সুন্দর সেন ফতেপুর দুমকা	"	৩৶০
" নীলমনি মুখোপাধ্যায় সেন্ধা মুজাপুর	"	৩৸/০
" কৈলাশ চন্দ্র রায় বিটঘর ত্রিপুরা	"	৫।০
" কৃষ্ণচন্দ্রমা গুপ্ত জরিয়ন মুর্শিদাবাদ	"	৫।/০
" রামসুন্দর দে নেত্রকোনা	"	১৲
" হরিদাস সরকার ভেঁরয়াডেঙ্গি	"	॥০
" হরিমোহন দে রামসারহাট জলপাইগুড়ি	"	১॥০
" অটলবিহারি চক্রবর্ত্তি দুলবন সাগরদিঘি	"	৫৲
" দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল ভালুকা ময়মনসিংহ	"	৫৲
" গতিনাথ রায় কাকিনীয়া	"	১৲
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরীশাল	"	১৫৲

এককালীন দান প্রাপ্তি।

একটী দুঃখী বালক বাজিতপুর বর্দ্ধমান	৶০	"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইব্রাহিমপুর ত্রিপুরা	।৶৲	"
" মথুরানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ	॥০	"
" শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ	॥৶০	"
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর	১৲	১৲
" মোহিনী মোহন সেন গুপ্ত সিরাজগঞ্জ	৩৲	"
শ্রীযুক্ত মহারাজা দ্বারভাঙ্গাধীশ	"	১২৫৲
" গৌরীচরণ আদিত্য করিমগঞ্জ	"	১৲
" সুরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র গয়া	"	৶০
" জগন্নাথ প্রসাদ রায় কলিকাতা	"	১৲
৺ কাশীধামে প্রাপ্ত	"	।০

মাসিক সাহায্য।

শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী কাকিনীয়া, জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক মাসিক ১০৲ হিঃ।	৬০	১০৲
	১৪৯৶০	৩৩৲/৫

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাহার আয় ব্যয়।

অগ্রহায়ণের জমা		১৪৯৶০
পৌষের জমা		৩৩৲/৫
মোট		৪৮৭।৫
অগ্রহায়ণের খরচ		
দক্ষিণা ও বৃত্তিদান	৭৬৲	
ছাপাই খরচ	৩।০	
মাসুল খরচ	।৶০	
বৈদ্যবিদ্যালয় সভার বার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণকে বিদায় আদি	৬৩৶৫	১৪২॥৶৫
পৌষ মাহার খরচ		
দক্ষিণা ও বৃত্তি	৯০/০	
ছাপাই খরচ	॥০	
মাসুল খরচ	১।৶১০	
বাজে	২৮৸১০	
সেভিংবেঙ্কে জমা	১২৫৲	২৪৫।/০
		৩৮৮॥৫

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৩শ ভাগ | "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ। | শকাব্দা ১৮১১
১১শ সংখ্যা | শরীরেণ সমম্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥" | ফাল্গুন মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বলিকর্ম্ম স্বধাহোম স্বাধ্যায়াতিথিসৎক্রিয়াঃ।
ভূতপিত্রমরব্রহ্ম মনুষ্যাণাং মহামখাঃ॥

বলি বৈশ্বদেব, পিতৃশ্রাদ্ধ, তর্পণ, হোম, স্বাধ্যায়, অতিথিসৎকার এই পাঁচটি কর্ম্ম ক্রমানুসারে ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এই নামে অভিহিত হয়।

দেবেভ্যশ্চ হুতাদন্নাচ্ছেষাদ্ভূতবলিং হরেৎ।
অন্নং ভূমৌ শ্বচাণ্ডাল বায়সেভ্যশ্চ নিঃক্ষিপেৎ॥

দেবতাগণের হুতাবশিষ্ট অন্নদ্বারা ভূতবলি সম্পন্ন করিবে। কাক কুক্কুর চণ্ডালাদির জন্যও অন্ন ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত রাখিবে।

অন্নং পিতৃমনুষ্যেভ্যো দেয়মপ্যন্বহং জলম্।
স্বাধ্যায়ং চান্বহং কুর্য্যাৎ ন পচেদন্নমাত্মনে॥

পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রতিদিন অন্ন জল নিবেদন করিবে। অন্য মনুষ্যকেও অন্ন জল দান করিবে। প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করিবে। কেবল নিজের উদর পূর্ত্তির জন্য অন্ন প্রস্তুত করিবে না।

বালস্ববাসিনী বৃদ্ধ গর্ভিণ্যাতুর কন্যকাঃ।
সংভোজ্যাতিথি ভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনম্॥

বালক, বালিকা, পতিব্রতা স্ত্রী, বৃদ্ধ, আতুর ব্যক্তি, অতিথি ও ভৃত্য ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া দম্পতি সর্ব্বশেষে ভোজন করিবেন।

অতিথিত্বেন বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যানুপূর্ব্বশঃ।
অপ্রণোদ্যোতিথিঃ সায়মপি বাগ্ভূতৃণোদকৈঃ॥

যদি অতিথি গৃহে সমুপস্থিত হন, তবে গৃহস্থ বর্ণক্রমানুসারে অগ্রে তাঁহাকে অন্ন দান করিবেন। অর্থাৎ প্রথমে ব্রাহ্মণকে, তার পর ক্ষত্রিয়কে, পরে বৈশ্যকে তদনন্তর শূদ্রকে এই রূপ বর্ণ ক্রমানুসারে অতিথিকে সেবা করিবে। যদি সায়ং কালেও অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে অধিক সেবা করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও অন্ততঃ মধুর বাক্যে সম্ভাষণ, বাসস্থান তৃণাসন ও জল দানাদি দ্বারা অতিথিকে পরিতৃপ্ত করিবে।

সৎকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্যা সুব্রতায় চ।
ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে সখিসংবন্ধ বান্ধবান্॥—

যথোচিত আদর সৎকার পূর্ব্বক ভিক্ষুককে ও ব্রতনিষ্ঠকে ভিক্ষা দান করিবে। বন্ধু বান্ধবাদি ভোজন সময়ে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে।

ক্রমশঃ।

ভ্রম।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

ইংরাজীতে একটা প্রচলিত কথা আছে যে-

" Where ignorance is bliss
It is folly to be wise. "

অর্থাৎ যে স্থলে মূর্খতায় সুখ, তথায় জ্ঞানী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে খানে না দেখিলে, না শুনিলে না বুঝিলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, তথায় দেখা, শুনা বুঝার ব্যাপার উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর। কি বুঝি, কি বুঝিতে পারি না তাহা ভগবানই জানেন, তবে বুঝা পড়ার ভিতরে যাইলে গোলে পড়িতে হয়। এই দেখ না—পরিব্রাজক গাহিয়াছেন—

" ওরে কেউ গুরু হয়, কেউবা চেলা কেউ দুঃখী কেউ বা সুখী। আবার কেহ পিতা কেহ পুত্র কেউ সাধু কেউ পাতকী। "

আমি স্বচ্ছন্দতার প্রয়াসী। আমি যে কেন চিরদরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলাম তাহা কেহই আমাকে বুঝাইতে পারে না। আমি কর্ম্মিষ্ঠ, আমি বিদ্বান, আমি চতুরতা জানি, আমি প্রিয়ম্বদ, আমি চরিত্রবান, কিন্তু আমার কর্ম্মনিষ্ঠা, আমার বিদ্যাবত্তা, আমার চতুরতা, আমার প্রিয়বাদিতা এবং পবিত্রতা অবকাশাভাবে ফুটিতে পাইল না, আমার দীনতা গেল না—আমার দুঃখে শৃগাল কুক্কুরেও কাঁদিয়া থাকে। পক্ষান্তরে মহামূর্খ, মহাপাষণ্ড, অর্ব্বাচীন একজন কোটীশ্বর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কত বড় ২ পণ্ডিত, বুদ্ধিমান তাহার স্তুতিবাদ করিতেছে। পৈশাচিক ব্যবহারের অন্ত করিলেও ঐশ্বর্য্য তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, অভাব কি যে সে তাহা জানে না। আমাকে বুঝাইবার জন্য যদি বল যে সে সুখী নহে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে এই দারিদ্র্য এবং ঐশ্বর্য্যের বাটোয়ারা কে করিল? আমি অবশ্যই ইচ্ছা করিয়া দুঃখী হই নাই, এখন যদি কেহ প্রার্থনা করে তাহা হইলে অবলীলাক্রমে আমার ভিখারীর পরিচ্ছদ তাহাকে প্রদান করিতে পারি। বস্তুতঃ প্রার্থনা কেহ করিতেও পারে না, আমারও প্রার্থনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতাও নাই। গোলত এই খানেই। অথচ বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে সংসারের সম্বন্ধ সব ভুল, তুমি আমি কেহই কিছু নহে, দুদিনের জারি জুরি চক্ষু বুঁজিলেই সব ফাঁক।

কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া সুখের উপর আসিয়াই পড়িতেছে। সুখ কি তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। যদি বল উহা আনন্দ, কিন্তু আনন্দইত সুখ। চাল্ ভাজা আর ভাজা চাল এক কি ভিন্ন পদার্থ তাহা তুমিই জান। আমি কিন্তু কোনটাই বুঝিতে পারি নাই। ধরিয়া লওয়া যাউক যে সংসারের সুখ "দিল্লীর লাড্ডু", কারণ উহা যে পাইয়াছে সেই ঠকিয়াছে, যিনি পান নাই তিনিও ঠকিয়াছেন। সুতরাং বুঝিলাম সুখ প্রবৃত্তি-সাপেক্ষ। প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতে মনে হয় কি কুকর্ম্মই করিয়াছি, প্রবৃত্তির উগ্রতা ও তৃষ্ণা থাকিলে হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। প্রবঞ্চিতের ভাব দুই পক্ষেই আছে। কিন্তু প্রবৃত্তির কোন্ অবস্থাতে সুখানুভব হইয়া থাকে? যে দণ্ডে উহার নিবৃত্তি সেই ক্ষণেই ত দুঃখের সঞ্চার, এবং যে সময় হইতে উত্তেজনা, অভাব ও দুঃখ অনুভব ত সেই সময় হইতেই হইয়া থাকে। সুতরাং সুখী কখন হইলাম? পাগল বলিয়াছিল, নিদ্রায় সুখ কখন? নিদ্রার প্রথমাবস্থায় উহার চেষ্টা জনিত দুঃখ, তন্দ্রাকালে স্বপ্নজনিত বিরক্তি এবং দুঃখ, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞানতা জন্য সুখ দুঃখ দুই সমান, নিদ্রার অবসান সময়েও সুখ নাই, আলস্য আসিয়া জুটে। সুতরাং নিদ্রায় সুখ আছে যে বলে সে মিথ্যাবাদী। আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা করে যে প্রবৃত্তি সাপেক্ষ সুখ মিথ্যা কথা—প্রবঞ্চনা।

তবে সুখ কি? অলৌকিক কথা তুলিব না;—ঈশ্বরানুভূতিতে সুখ আছে। থাকিতে পারে, আপনারা

যদি এ উপায়ে সুখী হইয়া থাকেন, অঞ্জলি করিয়া আপনাদের পদধূলি মাথায় লইব। আমি কিন্তু উহা বুঝিতে পারি নাই সুতরাং পড়াপাখীর ন্যায় উহার অবতারণা বৃথা। প্রবৃত্তিময় সংসারের প্রবৃত্তির দাস আমি, তোমার—আমার লইয়াই আমি ব্যস্ত, জ্ঞান বৈরাগ্য আমি বুঝি না; পুত্রকে মৃত্যু শয্যায় দেখিলে আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য উন্মাদ হইয়া উঠি, স্বচ্ছল সংসারে অর্থের অভাব বুঝিলে অকূল চিন্তা সাগরে ডুবিয়া যাই. তখন আমার পূজা পাঠ, ভক্তি শ্রদ্ধা কোথায় উড়িয়া যায়. আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়ি। প্রবৃত্তি বাদ দিলে, সংসার পৃথক্ করিলে আমি কি? কিছুই নহে। সুতরাং প্রবৃত্তি শূন্য সুখ আমি বুঝিতে পারিব না, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীব কেহই বুঝিতে পারিবে না। তুমি যদি বল যে প্রবৃত্তি মাথাইয়া ঈশ্বর চিন্তা করিলে ত সুখী হওয়া যায় এবং অনেকেই ত এই প্রকারে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। উত্তরে আমি বলিব যে উহা সংসারচিন্তার চাটনি স্বরূপ। যখন ছেলে কোলে করিয়া মাতার পদ সেবা করিয়া, প্রণয়িনী পার্শ্বে বসিয়া, বন্ধু সঙ্গে ফিরিয়া তৃপ্তি হয় না; যখন শত চেষ্টা করিলেও মনের সাধ মিটে না; যখন অহঙ্কারী, প্রমত্ত জীব বুঝিতে পারে যে এই অসীম সংসার ক্ষেত্রে সে একটা পরমাণুও নহে, তখন ঔদাস্য ঘুচাইবার জন্য, প্রবৃত্তির ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবার জন্য একবার চক্ষু বুজিয়া "হে ভগবন্" বলিয়া ডাকিয়া থাকে, গললগ্নীকৃতবাস হইয়া শালগ্রাম শিলার সম্মুখে মাথা কুটিয়া থাকে। খানিকটা কান্না কাটির পর মনটা একটু স্থির হয়, দুঃখের বিস্মৃতি হয়—সুতরাং প্রাণে একটু প্রফুল্লতা দেখা দেয় আর অমনি আসন ত্যাগ করিয়া প্রবল প্রবৃত্তি সাগরে গিয়া ঝাম্প প্রদান করে। এই প্রচলিত ঈশ্বর-আরাধনাকে আমি সুখের উপাদান মনে করি না, কেবল প্রবৃত্তির "হাওয়া খাওয়া" বলিয়া মনে হয়।

তবে কি মূলেই ভুল—সুখ কি ফাঁকা কথা, ছেলে ভুলাইবার কথা। আমি সুখী নহি আমি দুঃখী, তুমি দুঃখী নও তুমি সুখী; বন্দবস্তই এই রকম। কি জানি-কেন আমার গুণ থাকিলেও উপযুক্ত হইলেও আমাকে দুঃখী দীনবেশে সংসারে আসিতে হইয়াছে, তুমি মহাপাষণ্ড হইলেও ধনকুবের হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। শুনিয়াছি যেখানে যেটি থাকিলে সুন্দর দেখায়, যাহার যাহা হইলে যোগ্য হয়, যিনি সাজাইয়াছেন তিনি তদনুযায়ী সাজাইয়াছেন। বাগানে কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কত শোভাই হইয়াছে। কিন্তু একটি কোরক ঊর্দ্ধে ফুটিয়া, সুপ্রসারিত হইয়া শোভা ছড়াইতেছে, তাহার নীচে আর একটি শাখাপল্লবে আবৃত হইয়া অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত অবস্থায় ম্লানমুখে অধো-বদনে রহিয়াছে কেন? দোষ কাহারও নহে, উপরের ফুলের নহে, শাখাপল্লবের নহে, ম্লানমুখী গোলাপ সুন্দরীরও নহে। তবে এ বৈষম্য কোথা হইতে আসিল, কে আনিল? যিনি বাগান পাতাইয়াছেন তিনি ত এত ভাবেন নাই, জানিতেনও না; ইচ্ছা করিয়া গোলাপকে গাছের আড়ালে লুকাইয়া রাখেন নাই। অথচ যে ভুগিবার সেই কষ্ট ভুগিতেছে। যদি বল যে অবশ্যই ইহা কাহারও ইচ্ছায় হইয়াছে, তবে যিনি ইচ্ছাময় তিনি হয় বড় দুষ্ট লোক, নচেৎ দুরন্ত বালক। দুষ্ট লোক, কেননা তিনি স্বেচ্ছায় আমায় দুঃখী করিলেন—বিনাপরাধে আমাকে যন্ত্রণার কূপে ফেলিলেন। দুরন্ত বালক, কেননা তিনি না ভাবিয়া, না চিন্তিয়া না বুঝিয়া আমাকে বিপাকে ফেলিয়াছেন। দুষ্ট ছেলে, খেয়ালের উপর, স্ফূর্ত্তির তাড়নায় বৃক্ষে উঠিয়া নীড় হইতে পক্ষিশাবক ভূমে নিক্ষেপ করে; তাহাদের কষ্ট, তাহাদের বিপত্তির কথা তাহার মনেও হয় না।

তুমি ইংরাজী পড়িয়াছ, তুমি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবে যে সংসারে প্রবল দুর্ব্বলকে চাপিয়া

রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, যে প্রবল সেই উপরে যে দুর্ব্বল সে নীচে। আমি হীনবল তাই আমি দুঃখী, আর তুমি প্রবল তাই তুমি সুখী। কিন্তু ইংরাজের রাজত্ব না হইলে অনেক বিখ্যাত প্রবল ঐশ্বর্য্যশালীকে ভয়ে বল্মীকস্তূপের পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইতে হইত। একটু ভাবিয়া, বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সংসারের উচ্চনীচের ব্যবস্থা কোন বিশেষ নিয়মের উপর সংস্থাপিত নহে। মনুষ্য বুদ্ধিতে নিদ্ধারিত করা অসম্ভব। জন্ম জন্মান্তরের কথা তুলিলে, সুকৃতি দুষ্কৃতির কথা উত্থাপন করিলে অনেক গোল মিটিয়া যায়, অনেক সংশয় নিরসিত হয়। ঋষিবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, অলৌকিক বলিয়া সে সব অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লই; কিন্তু বুঝিয়াছে কয় জনে, অনুভব করিতে পারে কয় জনে? বিশ্বাস করিলেও ত বালাই চুকিয়া যায় না! তুমি ধার্ম্মিক বিশ্বাসী, কপাল দোষে একে ২ সাত পুত্রকে তুমি জলে দিয়াছ, মাতা পিতা, ভাই, ভগিনীকে যমের মুখে ফেলিয়া আসিয়াছ, তোমার বাহ্যিক সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া লোকে বুঝিল তুমি মহাপুরুষ। কিন্তু যখন হৃদয়ের নিভৃত গুহ্য গর্ত্তস্থ শোকাগ্নি আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ন্যায় হঠাৎ ফুটিয়া উঠে, তখন বিশ্বাস পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, ঋষিবাক্য অভয়-বাণী জ্বালামালার সহিত কোথায় মিশাইয়া যায়, সে প্রবল প্রবাহ বিদ্যুৎগতিতে প্রত্যেক স্নায়ুতে ছুটিতে থাকে, পাষাণ প্রাণ গলিয়া নেত্রনীরের সহিত বহিয়া যায়—সে জ্বালা নিভাইবার জন্য সাগর ছেঁচিয়া জল ঢালিলেও তৃপ্তি হয় না, ইচ্ছা করে সংসারের বন্দোবস্ত পদাঘাতে চূর্ণ হউক। তবে এখন উপায়? এ অসন্তোষ মিটিবে কিসে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ বাগানের মালি এক দুরন্ত বালক, সুতরাং এখানে খেয়ালের প্রাধান্য। উচিত, অনুচিত নাই, সুখ দুঃখ নাই, উচ্চ নীচ নাই, ভাল মন্দ নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, আমার নাই, তোমার নাই, যখন যেমন খেয়াল তখন তেমনি কার্য্য। সে তোমার সহিত সমপ্রবৃত্তিক নহে, তোমার ব্যবস্থা তাহার চক্ষে অব্যবস্থা, তোমার বুদ্ধি তাহার কাছে দুর্ব্বুদ্ধি, তুমি যাহা বুঝ, যাহা দেখ, যাহা জান সে তাহা লক্ষ্যই করে না। পিপীলিকার বন্দোবস্ত আমাদের চক্ষে ছেলে খেলা বলিয়া বোধ হয়, কীটাণুপূর্ণ জগতে উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে আমরা কত জীব হত্যা করিতেছি, কত কোটীকে স্থানচ্যুত করিতেছি চিরদুঃখী করিতেছি, তাহার হিসাব কি আমরা রাখি, না তাহার জন্য চিন্তিত হই। তেমনি তাহার হিসাবে আমরা অণুপরমাণু হইতেও ক্ষুদ্রতর। কত কোটী ২ পৃথিবী তাহার প্রত্যেক রোমকূপে নিমজ্জিত রহিয়াছে, সে আমাদের হিসাব রাখিবে কেন? আমাদের জন্য চিন্তিত হইবে কেন? তাহার খেয়ালের রাজত্ব, খেয়ালের সংসার, খেয়ালের ঘর দুয়ার, খেয়ালের কেনা বেচা। তুমি খেয়াল বুঝ না খেয়াল জান না, খেয়াল তোমার ভাল লাগে না এ বিষম প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে তুমি পারিবে কেন? তাই দেখিয়া শুনিয়া ভাব গতিক বুঝিয়া পরিব্রাজক আবার গাহিলেন "ও মন, ধন্য সে জন যার এ সৃজন, ভোজের বাজি সব ফাঁকি। এখন আয় দেখি মন আমরা দুজন তাঁর প্রেমে ডুবে থাকি।"

মূলেই ফাঁকি, সুখ দুঃখ কিছুই নহে। অবস্থা ও শিক্ষা লইয়াই সব। এ দেশে অন্ধ অন্ধকে হাত ধরিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, পাগল উন্মত্ত গণকে সৎবুদ্ধি দেয়, সৎপথে পরিচালিত করে। আমি পাগলের কথায় ভুলিয়াছিলাম তাই পাগলামি করিয়াছি। আমি সুখী এ কথা যদি কেহ আমাকে তেমন করিয়া বুঝাইয়া দিত, তাহা হইলে আমি বুঝিতাম এবং মনেং ভাবিতাম যে আমি সুখী। নিজ ২ বিদ্যা বুদ্ধির পরিমাণে সকল কথা বুঝিতে গেলে কোন কালেই কোন কথা বুঝিতে পারা যাইবে না। অসন্তোষ-উদ্বেগ চিরদিনই রাবণের

চিতার ন্যায় হৃদয়ের ভিতরে জ্বলিতে থাকিবে। তাই প্রণমেই ত বলিয়া রাখিয়াছি যে আমাদের পক্ষে সত্যের আলোক বড় বালাই—চক্ষু ঝলসাইয়া যায়, মাথা ঘুরিয়া যায়। যে জন্মান্ধ, তাহার সম্মুখে তীব্র আলোক জ্বালিলে লাভের মধ্যে আলোকের উত্তাপে মাথা ঘামিয়া উঠে। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কেমন একটা শীতলতা আছে, কেমন একটা প্রশান্ত ভাব মাখান আছে। চারিদিকের কপাট বন্ধ করিয়া, নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া ভ্রমান্ধের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে এত কথার গোল মাল উঠে না। তাই চিরদিনই সাধুগণ বলিয়া আসিতেছেন যে যদি দেখিতে ইচ্ছা কর ত চক্ষু মুদিত কর, যদি বুঝিবার জন্য উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে ত মূর্খ হও, হস্তিমূর্খ হও।

জ্ঞানদেবচরিত।

আমরা জ্ঞানদেবের জীবনী পাঠক গণের সম্মুখে ধারণ করিলাম। এই মহাপুরুষের প্রভাবে এক সময় ভারতবর্ষ প্রভাসিত হইয়াছিল। ইহাঁতে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই বিদ্যমান ছিল। বাল্যাবস্থাতেই ইনি স্থির বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। বিঠ্‌ঠল দেব যখন সংসারের তীব্র যাতনায় দীপ্তশিরা হইতেন, জ্ঞানদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। যখন নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও বিঠ্‌ঠল দেব শাস্ত্রী মহাশয়দের নিকট হইতে শুদ্ধিপত্র পাইলেন না, এবং পুত্রদের যজ্ঞ-উপবীত দেওয়া সুদূর পরাহত হইল, জ্ঞানদেব তাঁহাকে বুঝাইলেন যে ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ—উপবীত বাহিরের চিহ্ন মাত্র। অতএব, এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হওয়াতে দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। জ্ঞানদেব যোগ সাধন করিয়া অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন. কিন্তু, এবম্প্রকার ক্ষমতা থাকিতেও তিনি অতীব নম্র ছিলেন। যখন তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল, তখন অনেকে তাঁহার প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ২ প্রকাশ্য রূপে তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। নিবৃত্তিদেবের মাণ্ডে নামক মিষ্টান্ন খাইবার ইচ্ছা হইলে, তাঁহার ভগিনী উহা প্রস্তুত করিবার জন্য এক জন কুম্ভকারের নিকট হইতে এক খানি মৃত্তিকার পাত্র সংগ্রহ করিলেন। পথি মধ্যে, বিসোবাচাটি নামক এক জন প্রতিবাসী ব্রাহ্মণের সহিত দেখা হইল। সে মুক্তাবাইয়ের সহিত কথোপকথন করিল, এবং সবিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র খানি গ্রহণ করত তাহা ভাঙ্গিয়া দিল, বলিল, সন্ন্যাসীর আবার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন কেন? মুক্তাবাই আর এক খানি পাত্র আনিবার জন্য গমন করিলে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর কুম্ভকারকে পাত্র দিতে বারণ করিলেন। মুক্তাবাই মনের দুঃখে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং জ্ঞানদেবকে সবিশেষ বলিলেন। জ্ঞানদেব ব্রাহ্মণটীর ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। একটী অদ্ভুত উপায়ের দ্বারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিঠ্‌ঠলদেবের বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিলেন। তিনি জ্ঞানদেবের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মনে২ লজ্জিত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি যে এত অত্যাচার করিলেন, জ্ঞানদেব তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না, এই অভূতপূর্ব্ব উদার ভাব তাঁহাকে পরাভব করিল। তিনি জ্ঞানদেবকে দেবতা বলিয়া মনে২ তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, কুটিলতা ত্যাগ করত তাঁহার নিকটে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জ্ঞানদেব নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া, ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে কৃতার্থ করিলেন। জ্ঞানদেব হিতবাক্যের দ্বারা অনেক দুরাচারীকে সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। ত্র্যম্বক পন্থ নামক এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী পার্ব্বতী দেবীকে অবজ্ঞা করত, এক শূদ্রা রমণীর সহিত অবস্থিতি করিতেন। পার্ব্বতী দেবী

মনের দুঃখে কাল যাপন করিতেন। ক্রমে তাঁহার যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি আর কোন উপায় না দেখিয়া, জ্ঞানদেবের শরণাগত হইলেন, তাঁহার কাছে মনের দুঃখ জানাইলেন। জ্ঞানদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং কএকটী আশাজনক বাক্যের দ্বারা পার্ব্বতীদেবীকে প্রবোধ দান করিলেন। পরে, জ্ঞানদেব ত্র্যম্বককে এবং শূদ্রা রমণীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং অতীব বিনম্র ভাবে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহারা তাঁহা কর্ত্তৃক শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করত তাঁহাকে বাধিত করেন। রমণীর মন স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ ও নমনশীল। কদাচারিণী হইলেও শূদ্রা রমণী জ্ঞানদেবের শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ত্র্যম্বকের কলুষিত মন জ্ঞানদেবের বাক্য অবহেলা করিল। সে সাধুশ্রেষ্ঠের বাক্য শুনিলনা বটে, কিন্তু তাহার প্রণয়িণীর অনুরোধে, ত্র্যম্বককে বাধ্য হইয়া উপদেশ শুনিতে হইল। মনুষ্যের হৃদয় স্ফটিকের ন্যায় স্বভাবতঃ স্বচ্ছ। আবিদ্যিক মলিনতা দ্বারা আবৃত হইলে তাহা নিষ্প্রভ হয়, কিন্তু জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধ বারির দ্বারা বিধৌত হইলে, সে তাহার স্বাভাবিক দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানদেব যখন দেখিলেন যে, উভয়ে প্রতিদিন অবাধে তাঁহার উপদেশ শুনিতেছে, তিনি একদা সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের প্রবোধের জন্য একটী বিশেষ কথার অবতারণা করিলেন। লোকে অজ্ঞান অবস্থাতে যে কত মন্দ কর্ম্ম করিতে পারে, এবং তাহার ফল কি প্রকার বিষময় হইয়া উঠে, নানা মত দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞানদেব তাহা বুঝাইয়া দিলেন। এই উপদেশ হইতে সুচারু ফল উদ্ভূত হইল। ত্র্যম্বক ও তাহার শূদ্রা প্রণয়িণী উভয়েই আপন ২ কৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল, এবং ক্রমে কুমার্গ ত্যাগ করিয়া সৎপথ অবলম্বন করিল। কুলটা রমণী ধর্ম্মপরায়ণা হইল, এবং পার্ব্বতী সতী উহার পতিকে প্রাপ্ত হইল।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মহাপুরুষদের তীর্থদর্শনের প্রয়োজন নাই। আপামর সাধারণের মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এমন কি, কোন ২ স্থান তাঁহাদের জন্ম কিম্বা লীলাভূমি হওয়াতে, তাহা তীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানদেবের জীবনে এই শাস্ত্রীয় বাক্যটী সফলতা লাভ করিয়াছে। নামদেব উত্তম রূপ কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। এই নিমিত্ত তীর্থযাত্রার সময়ে, জ্ঞানদেব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। নামদেব হরিকথামৃতের দ্বারা লোকের মানস ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করিয়া তুলিতেন। তাহার পর, জ্ঞানদেব সেই ক্ষেত্রে সদুপদেশ রূপ বীজ বপন করাতে, তাহা হইতে সুচারু ফল সকল উৎপন্ন হইত। তীর্থদর্শন উপলক্ষে, জ্ঞানদেব অনেক লোককে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কোন ২ স্থানে অধিক দিন অবস্থিতি করিয়া সাধারণের উপকারার্থে সদ্‌গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। সেই সকল গ্রন্থ নিহিত উপদেশাবলি প্রচার হইয়া আপামর সাধারণের মঙ্গল সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। তীর্থ দর্শন সমাপ্ত করিয়া, জ্ঞানদেব তাঁহার অবশিষ্ট জীবন আলান্দিতে যাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রত্যহ নিয়ম পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন ও সদুপদেশ দিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অতি অল্প লোকই পরমার্থলাভের জন্য তাঁহার কাছে আসিত। মহাপুরুষদের প্রকৃত মূল্য অতি অল্পলোকেই বুঝিতে পারে। এই পৃথিবীতে যাহারা বুজরুকি ও ভেল্‌কি দেখাইতে পারে, তাহারাই লোকের কাছে পূজা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানদেব পরম যোগী ছিলেন। তিনি যোগ-প্রভাবে অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকলও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষমতা দেখাইয়া লোককে চমকিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলনা। যেখানে এই ক্ষমতা প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছিল, সেই খানেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন খানে মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান কোথাও বা অহঙ্কারী ব্যক্তির দর্পচূর্ণ করিবার জন্য জ্ঞানদেব তাঁহার

যোগবল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ক্ষমতার বিষয় চারি দিকে প্রকাশ হইলে, লোকে দলে ২ তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। পার্থিব সুখলাভই তাহাদের উদ্দেশ্য থাকিত। কেহ ধনলাভ, কেহ পুত্রলাভ, কেহ বা কোন বিপদ হইতে উদ্ধার সাধন জন্য জ্ঞানদেবের শরণাপন্ন হইত। অতি অল্প লোকই পরমার্থের প্রার্থী ছিল। এই সকল স্বার্থপর লোক জ্ঞানদেবকে এতদূর পর্য্যন্ত বিরক্ত করিয়া তুলিল যে, তাঁহার মহদুদ্দেশ্য সাধন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। লোকের পার্থিব অভ্যুদয় সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে তাঁহার সমস্ত দিনই প্রায় অতিবাহিত হইত। শাস্ত্রব্যাখ্যা ও উপদেশ দানের সময় আর পাইতেন না। অবশেষে যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মহাব্রত সাধন হওয়া অসম্ভব হইল, তখন তিনি সমাধি গ্রহণ করত ভগবানকে চিন্তা করিতে ২ ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। জ্ঞানদেবের এই দেবোপম ভাবটী আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মহাপুরুষ গণ অদ্ভুত ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিবেন বলিয়া যোগ সাধন করেন না। মনের একাগ্রতা লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করা, এবং সেই আনন্দ আপামর সাধারণকে বিতরণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, আমাদের প্রাচীন কালের ঋষিগণের মহত্ত্ব মনোমধ্যে উদয় হয়, এবং তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য তাঁহারা কি পর্য্যন্তই না কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। পার্থিব ঐশ্বর্য্যকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া তাঁহারা ভগবানে প্রাণ মন অর্পণ করিতেন। কেহ ২ ফল মূল আহার করিয়াই জীবন যাপন করিতেন। যে অমৃত পান করিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হইতেন, তাহা অপরকে বিতরণ না করিলে তাঁহারা মনোমধ্যে আনন্দ পাইতেন না। এই জন্যই কত প্রকার সাধনার পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা নিরাকার ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে, তখন তাঁহারা মূর্ত্তি উপলক্ষ করিয়া উপাসনার পদ্ধতি প্রকাশ করিলেন। আবার যখন দেখিলেন যে, ইহাতেও লোকের মন ঈশ্বরের দিকে স্থির থাকে না, নানা প্রকার বিষয় চিন্তার উদয় হওয়াতে তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে তখন তাঁহারা প্রাণরোধ যোগের ব্যবস্থা করিলেন। এই যোগের দ্বারা মন বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হয় এবং ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। অবশ্য যতক্ষণ এই অবস্থায় থাকে, ততক্ষণই মন আনন্দ লাভ করে। কিন্তু, তাহা হইলেও, উপাসকের মন ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং বিষয় হইতে ক্রমে ২ অবসর গ্রহণ করে। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দেবপূজার পদ্ধতিতে, প্রাণরোধ যোগের একটী অঙ্গ নিবিষ্ট আছে। ইহাকে প্রাণায়াম কহে। ন্যাস করিবার সময়ে, সকলকেই এই ক্রিয়াটী সাধারণ করিতে হয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, এই উপাসনা-প্রণালীর তাৎপর্য্য কেহ অবগত নহে। গুরুদেব শিষ্যকে রীতি মত উপদেশ প্রদান করেন না, শিষ্যও ইহার তাৎপর্য্য জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। সুতরাং, ইহা এখন একটী অর্থশূন্য কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। নিয়ম রক্ষা করা আবশ্যক বলিয়া লোকে কএকবার নাক টিপিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যোগ অভ্যাসের দিকে অনেকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। কি আস্তিক কি নাস্তিক সকলকেই যোগ সাধন করিতে দেখা যায়। বলিতে কি, ইউরোপ ও আমেরিকা বাসীগণও ভারত বর্ষে আসিয়া যোগমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। ইহা আর্য্যদিগের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ করা যদি এই সাধকদের উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়। যোগক্রিয়ার সহিত ভগবানের প্রীতি ভক্তি না থাকিলে, মন্দ ফল ফলিয়া থাকে। মনকে একাগ্র

করিবার জন্যই যোগসাধনের আবশ্যক। ইহা একটী কৌশল মাত্র। কেবল ধার্ম্মিক ব্যক্তিই যে যোগক্রিয়া সমাধা করিতে পারেন এমন নহে। চেষ্টা করিলে যে কোন ব্যক্তি ইহা সাধন করিতে পারে। এই জীবনীরই এক স্থানে বিবৃত হইয়াছে যে, উজ্জয়িনীর রাজার সভাসদ্ বীরমঙ্গল এক সময়ে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলেন। একদা রাজা মৃগয়ার্থে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কারণে তাঁহাকে পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। বীরমঙ্গল জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, এবং রাজার এই বিশ্বাস ছিল যে তিনি গণনার দ্বারা লোকের মনের ভাব জানিতে পারিতেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মৃগয়ায় না গিয়া তিনি কি জন্য রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। এই প্রশ্ন করিয়া রাজা বলিলেন যে সাত দিনের মধ্যে ইহার প্রত্যুত্তর চাই, নতুবা তাঁহার জীবন যাইবে। বীরমঙ্গল বিশেষ ভাবিত হইলেন। রাজার মনের ভাব তিনি কি প্রকারে জানিতে পারিবেন? সুতরাং তাঁহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইল। এই রূপে চিন্তাকুল হইয়া তিনি নদীর দিকে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কোন বেশ্যা তাঁহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইলেন। কুলটা রমণী তখনই রাজার মনের ভাব তাঁহাকে জানাইল। বেশ্যার কথায়, প্রথমে বীরমঙ্গলের বিশ্বাস হয় নাই। যাহা হউক, তিনি রাজার কাছে উপস্থিত হইয়া বেশ্যা কর্ত্তৃক বিবৃত কথাটী তাঁহাকে শুনাইলেন। রাজা অতীব আনন্দিত হইয়া বীরমঙ্গলকে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করিলেন। বীরমঙ্গল পুরস্কৃত হইলেন বটে, কিন্তু যে রমণীর গুণে তিনি এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন, তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় আলোচনা করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং আপনাকে আপনি ধিক্কার দিলেন। পরে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বেশ্যার কাছে গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ আশ্চর্য্য ক্ষমতা সে কোথা হইতে পাইল। সে বলিল যে যোগবিদ্যার প্রভাবেই তাহার এই ক্ষমতা জন্মিয়াছে।

ক্রমশঃ।

সহবাস আইনের আন্দোলন।

যাহা ভাবিয়াছিলাম, কল্পনার চিত্রে যাহা আঁকিয়াছিলাম, আশার অযুতময় উচ্চ্বাসে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, আজি তাহা সম্মুখে উপস্থিত। সাধের সঞ্চিত বাসনা যে মধুর দৃশ্য দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজি তাহার দিব্য মূর্ত্তি নিবাচনকে সম্মুখে উদ্ভাসিত। সহবাসের আইন লইয়া আজ সমগ্র ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের তীব্র প্রবাহ ছুটিয়াছে, এমন আন্দোলন এমন ধর্ম্মোৎসাহের তুমুল ঝটিকা সমাজের এরূপ অদ্ভুত জীবনী শক্তি আর কেহ কখনও দেখিয়াছ কি? এমন নগর নাই, এমন গ্রাম নাই, এমন পল্লী নাই যেখানে সহবাস আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য সভা না হইতেছে। গড়পরতায় ধরিতে গেলে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিদিন একটি করিয়া আজকাল সভা হইতেছে, ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কত দেশ হইতে কত প্রতিবাদ যাইতেছে, তাহার তালিকা ধর্ম্মপ্রচারকের ক্ষুদ্র কলেবরে ধরিবে না, সুতরাং তালিকা দেওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। সমগ্রদেশ এই আইনের ভীষণ বিভীষিকায় বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রজার স্বার্থে আঘাত করিয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট কত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এমন তীব্র প্রতিবাদ আর কখনও হয় নাই, ইহা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। এই করভার পীড়িত দেশে প্রজার অনভিমতে গবর্ণমেণ্ট কত কর বসাইয়াছেন, কিন্তু সে সময়ে এত অন্তরের ব্যথা জানাইয়া এত মরমের কান্না কাঁদিয়া প্রতিবাদ হয় নাই। কিন্তু আজ সমগ্র ভারতবর্ষ ভবধ্বনিনাদক সকরুণ বিলাপে কেন দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইতেছে, বলিদানের জন্য খর্পরের নিকটে সমানীত ছাগশিশুর ন্যায় কেন সমগ্র ভারতবর্ষ আজ থরহরি কাঁপিতেছে, বলিতে পার কেন? আজ ইংরাজরাজ ভারতবাসী হিন্দুর অঙ্গে আঘাত করিতে উদ্যত নহেন, কিন্তু অর্থ হইতেও যাহা পরমার্থ, সেই ধর্ম্মধনে আঘাত করিতে চাহেন। বাহিরের ধন সম্পত্তি লইবার কথা নহে, অন্তরের যাহা সারসর্ব্বস্ব ধন, সেই পরম দুর্লভ ধর্ম্মধন কৌশলে লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সুতরাং হিন্দু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? বাহিরের ঐশ্বর্য্য বিভব যাহার তুলনায় হিন্দু তুচ্ছ করিতে পারেন, সেই চির সাধের সামগ্রী আজ হিন্দুকে ছাড়িয়া চলিল। রাজ আজ্ঞায় গর্ভাধান সংস্কার যদি যথাকালে হইতেই পারিল না, তাহা হইলে গৃহস্থের অন্যান্য সংস্কার ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। সত্যবাদিতা দয়া, পরোপকার ক্ষমা আদি

খুলিয়া বলিতে লাগিল, " দেখুন আমার বুক চিরিয়া, কি দারুণ দাবানল জ্বলিতেছে।"

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা।

বিগত শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটার পর বহুবাজারে জলের কলের সম্মুখে " ওয়েলিংটনস্কোয়ারে " অর্থাৎ সেই অনাবৃত সুবিস্তার মাঠের উপর বাগ্মিবর কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মহাশয় সমবেত প্রায় ৩।৪ সহস্র লোককে আপনার স্বভাব সিদ্ধ বাগ্মিতা ও অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগে প্রস্তাবিত " সম্মতি আইনের অপকারিতা " বুঝাইয়া দেন " রইস্ এণ্ড রাইয়ত " কাগজে ত্রুইফোড় স্মার্ত্তনামধারী প্রগল্‌ভবাদী বাবু যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য যে সব কথা লিখিয়াছিলেন, পরিব্রাজক মহাশয় তাহার প্রত্যেকটী খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। তিনি উর্দ্দু ভাষায় সমাগত মুসলমানগণকে বিলের অপকারিতা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। অনেক মুসলমান বলিয়াছিল,—" রাজা এমন আইন করিতে পারেন না। যাহাতে এ আইন না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিব। ১২ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রী ঋতুমতী হইলে কেহ সহবাস করিতে পারিবে না, এ যে বড় জুলুমী আইন।"

নাট-মন্দিরে সভা।

গত রবিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মহাশয় শোভাবাজার রাজবাটীর নাটমন্দিরে " হিন্দুয়ানী " সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নাট মন্দিরের উপর ও নিম্নতল জনসমাগমে পুরিয়া গিয়াছিল। এ দুর্দ্দিনে হিন্দু বহুদিন এমন ধর্ম্মরসামৃত পান করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরিব্রাজক মহাশয়ের মুখ-বিগলিত অমৃতোপম পরম পবিত্র ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া, সে দিন দেখিয়াছি, অহিন্দুভাবাক্রান্ত অনেক কুলাঙ্গারগণও ভাবার্ণবে ডুবিয়া গিয়াছিল হিন্দুর ত কথাই নাই। চক্ষের জল এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম পায় নাই। তর্কে যুক্তিতে মীমাংসা করিয়া, ভাল করিয়া বুঝিয়া শুঝিয়া তবে ধর্ম্মের শাসন মানিব, এ কথা বলিলে হিন্দুধর্ম্ম মানা হয় না। কোন কালে কোন ধর্ম্মরক্ষা হয় না। বুঝিতে বুঝিতে হয় ত সারাজীবন কাটিয়া যায়, বুঝা আর হয় না। হিন্দু ধর্ম্ম মানিতে হইলে, হিন্দুয়ানী বজায় রাখিতে হইলে, গুরুর উপদেশে এবং শাস্ত্রের শাসনে চলিতে হয়। এই কথা পরিব্রাজক সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। তিনি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অবিচ্ছেদে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার সারমর্ম্মও প্রকাশ করিবার স্থান আমাদের নাই। ইহাই বড় পরিতাপের বিষয়। তবে সংক্ষেপে এই কথা বলি, প্রকৃত হিন্দু কে এবং প্রকৃত হিন্দুর কি প্রয়োজন, তাহা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গণিত বুঝিতে হইলে যেমন গণিতপ্রণালী মতে তাহা বুঝিতে হয়, হিন্দু ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, তাহা হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে বুঝিতে হয়। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান হইতে রাত্রিকালে শয়ন পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রতি কার্য্য ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট। হিন্দুর মন্ত্রোচ্চারণাদি অব্যর্থ ফলপ্রদ। যাহারা মন্ত্রাদি বাঙ্গলা বা ইংরেজিতে অনুবাদ করিতে চাহেন, তাহারা নাস্তিক হইতে পারে। বীণাযন্ত্রে যে স্থান হইতে যে ভাবে যে স্বর উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে যে ফল লাভ হয়, অন্যত্র হইতে সে স্বর সে ভাবে উৎপন্ন হয় না; সুতরাং তাহার সেরূপ ফলও হয় না। শরীরগত স্নায়বীয় প্রক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। সেই স্বভাবানুসারে ভগবৎ-বাণীরূপ সিদ্ধ মন্ত্র গঠিত; সুতরাং তাহার ভাষান্তরে সে স্বাভাবিক ভাব থাকিবে কেন? তাহার ফলও তদ্রূপ হইবে না। অহি নকুল, সিংহশৃগাল প্রভৃতির উপর অবোধ্য বংশীরবের ক্রিয়া যেরূপ হইয়া থাকে, মানুষের উপর সিদ্ধ মন্ত্রের ক্রিয়া সেইরূপ হয়। হিন্দুর স্নান, হিন্দুর আহার, হিন্দুর বিহার, হিন্দুর পরিধান, হিন্দুর শয়ন, হিন্দুর হাঁচিটি পর্য্যন্ত যে হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ এবং তাহার প্রত্যেকটী যে ঈশ্বর প্রযোজিত, সুতরাং ধর্ম্মভাবাপন্ন; ইহা তিনি বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছেন। সহবাসসম্মতি বিষয়ক আইন সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে কিছু নাই বলুন, এবং সে দিনকার তাহা বক্তব্য বিষয় নাই হউক; তবুও যে হিন্দুর গর্ভাধান সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তিনি হিন্দুর সংস্কারাদি ব্যাখ্যাকালে স্পষ্টতঃ বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই হৃদয়োন্মাদকারিণী বক্তৃতা শেষ হইবার পর আমরা একটা অতি বড় লজ্জাকর ঘৃণিত বীভৎসকাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। বিলের প্রকৃত পক্ষপাতী লোক আপনাকে বিলের বিপক্ষবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকগুলি লোকের স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছিলেন। একটি বুদ্ধিমান্ লোক স্বাক্ষর করিতে গিয়া বাবুদের আবদার ধরিয়া ফেলেন। দুই একজন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নাম কাটিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে পক্ষপাতী মহোদয়গণের অন্তর্দ্ধান।

[বঙ্গনিবাসী হইতে]

১৫ই মাঘ, মঙ্গলবার।

এই তারিখে সুবিখ্যাত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে এক সভা আহূত হইয়াছিল। স্বধর্ম্মপরায়ণ সহস্র সহস্র হিন্দু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ কর্ত্তৃক এই সভার সূচনামাত্র হইয়াছে। বারান্তরে আরও সমারোহে—আরও উৎসাহের সহিত এই সভার অধিবেশন হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রাজুয়েটগণ কর্ত্তৃক আলবার্ট হলে একটী সভা আহূত হইয়াছিল; কিন্তু বিরুদ্ধবাদী শত্রুপক্ষীয়গণের অন্যায় অত্যাচারে সে সভার উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং সে দিন ইহারা অনন্যোপায় হইয়া, গোলদিঘীর মাঠে সভার কার্য্য একরূপ সম্পন্ন করেন। অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয় এদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলবার্ট হলে সমবেত সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই দিনে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে মনোনীত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লন। এখানে হৃদয়হীন বিপক্ষদলের ভ্রূকুটী টিট্‌কারী, উপহাস দম্ভবিকাশ—পঁহুছিতে পারে নাই,—সুতরাং তাঁহাদের অনুপস্থিতে সভার কার্য্যও সুশৃঙ্খলরূপে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্টের সুযোগ্য উকীল, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় দুইটীমাত্র প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সেই দুইটী প্রস্তাবই সারগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবিত লোমহর্ষণ আইনখানি পাস করিলে দেশের যে কি মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত হইব, হিন্দুর ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজে, মর্ম্মস্থানে—যে কি ভয়ঙ্কর

আঘাত পড়িবে, তাহার সম্যক্ আলোচনা করাই এই প্রস্তাব দুইটীর উদ্দেশ্য। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ প্রথম প্রস্তাবটী উত্থাপিত করেন এবং বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র সেন, বি, এ, ও বাবু মন্মথনাথ সরকার বি, এ, কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়। বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ দ্বিতীয় প্রস্তাবটী উত্থাপিত করেন এবং বাবু গিরীশচন্দ্র সান্যাল, এম, এ কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত হয়; অধিকন্তু, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, ও বাবু সন্তোষনাথ রায় বি, এ, এই প্রস্তাবটীর সমর্থন করেন। সমবেত প্রায় চারি সহস্র লোক মুক্তকণ্ঠে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে সভার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়িলে হিন্দু কেমন কাঁদিতে পারে, মর্ম্মবেদনায় হিন্দু কিরূপ ব্যাকুল হয়, টাউন হলের রঙ্গমঞ্চ এই সভায় তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। সভার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ পরিব্রাজক কুমার কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই আকস্মিক আবির্ভাবে শত সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলী এককালে আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। সভার বল যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। গ্রাজুয়েটগণের বক্তৃতাদি সম্পন্ন হইলে, সভাগণ সকলেই কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সভাপতি মহাশয়ও সাধারণের অভিপ্রায় লইয়া কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। পরিব্রাজক মহাশয় দণ্ডায়মান হইবামাত্র চারিদিক্ হইতে পুনরায় অবিশ্রান্ত আনন্দকোলাহল ও করতালি পড়িয়া গেল। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সেই অনির্ব্বচনীয় ভগবদ্ভক্তি, সেই জ্বলন্ত বাগ্মিতার আবেগে শ্রোতৃমণ্ডলী নির্ব্বাক—নিস্পন্দ হইয়া একাগ্রমনে তাহা শুনিতে লাগিলেন। প্রস্তাবিত আইন খানি পাস হইলে হিন্দুর কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার সে মর্ম্মস্পর্শী উক্তিগুলি শ্রোতৃবৃন্দের অন্তস্তল যে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত আইনখানি পাস হইলে হিন্দু পরিবার যে কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা যখন তিনি আভাসে প্রকাশ করিলেন, তখন অনেকেই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বারংবার আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন,—"অনেকের বিশ্বাস ছিল এবং হয়ত আমিও এরূপ মনে করিতাম যে, ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু সন্তান স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ততটা যত্নবান্ নহেন,—এ সকল বিষয়ে তাঁহারা একরকম উদাসীন বলিলেই হয়। কিন্তু আজিকার এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া, আমার যে বিশ্বাস এককালে লোপ পাইল, সকলেরই যে পাইবে, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ সাধু উদ্যম ও আন্তরিক যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।" অতঃপর তিনি প্রস্তাবিত আইনখানির পুনরুল্লেখ করিয়া কহিলেন,—"গবর্ণমেণ্ট সহবাস সম্মতির বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া কহিতেছেন যে, ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্মে কর্ম্মে আঘাত পড়িবে না,—এই নূতন আইনে হিন্দুর উপকার বৈ অপকার হইবে না—ইত্যাদি।" এখানে আমার সাবিত্রী সতীর গল্পটী মনে পড়িল;—সাবিত্রী যখন কিছুতেই যমরাজের নিকট মৃতপতির পুনর্জ্জীবন বর পাইলেন না, তখন কৌশলে কহিলেন,—আপনি তবে আমায় এই বর দিন, যেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যমরাজও 'তথাস্তু' বলিয়া সত্যবানের জীবাত্মা লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাহার ফল কি হইল?—না, সতীনারীর বাক্যকৌশলে সত্যবান পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ এই প্রস্তাবিত আইন খানি (ভগবান্ করুন, যেন এ মহা অমঙ্গল না হয়) পাস করিলে প্রকারান্তরে হিন্দুর হিন্দুত্ব ও ধর্ম্মলোপ হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।" যথাসময়ে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর সভা ভঙ্গ হয়।

কাশীধামের বিরাট সভা।

বিগত ১৩ই মাঘ ৮ কাশীর ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার প্রযত্নে এখানে সহবাস আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার উৎসাহী সভ্য, এখানকার প্রধান রইস্ বাবু গোকুলচন্দ্র ও জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের বিশেষ যত্নে সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেকেই বলিতেছেন সামাজিক ব্যাপারের আন্দোলনার্থ এরূপ মহতী জনসাধারণ সভা আর কখনও হয় নাই। কাশীর শিবকুমার শাস্ত্রী আদি হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণ ও কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি আদি বাঙ্গালি পণ্ডিতগণ সকলেই সভায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতসমাজের তরফ হইতে ধর্ম্মপ্রচারক সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন মহাশয় উৎসাহময়ী জলন্ত ভাষায় উক্ত আইন যে ধর্ম্ম বিঘাতক, তাহা প্রমাণিত করিলেন। উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইলে ভারতসমাজে যে সমস্ত কুফল প্রসূত হইবে তাহার বিভীষিকাময় চিত্র তিনি যখন শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন সকলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তরফ হইতে বাবু রঘুনন্দন লাল বি, এ উক্ত আইনের অবৈধতা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। অনন্তর দয়ানন্দী সংস্কারক সম্প্রদায়ের একজন লোক সভায় কিছু বলিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের কাছে অনুমতি চাহিলেন। তিনি অম্লান বদনে অনুমতি দিলেন। একজন আর্য্যসমাজী অল্পবয়স্ক উদ্ধত যুবা নিজ সমাজসংস্কারময়ী ভাষায় আইনের পক্ষপাতী হইয়া বক্তৃতা সুরু করিলেন। তাঁহার বালচাপল্যে চটিয়া অনেকেই তাঁহাকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু এইরূপ জনসাধারণ সভায় সকলের মত শুনা উচিত বলিয়া, তাঁহাকে বলিবার অবসর দেওয়া হইল। অনন্তর অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আইনের প্রতিকূলে তীব্রস্বরে বক্তৃতা করিলেন। নানাবিধ তর্ক বিতর্কের পর অনুকূলবাদী ও প্রতিকূলবাদী সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "উক্তরূপ আইন দ্বারা বালিকার সম্ভোগকালের দ্বাদশবর্ষরূপ একটা সীমা বাঁধিয়া দিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে। কেননা, উক্ত আইনের বলে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্যা ঋতুমতী হইলে গর্ভাধান সংস্কার করিবার উপায় থাকিবেনা, সুতরাং উক্তরূপ আইন আমরা চাহি না।" অনন্তর প্রেসিডেণ্ট মহাশয় দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে কন্যা ঋতু হইলে, গর্ভাধান সংস্কার করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা সভায় পাঠ করিলেন ও হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। পরিশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে উক্ত ব্যবস্থাপত্র ও সভার মন্তব্যপত্র বড়লাট বাহাদুরের কাছে প্রেরিত হউক। উক্ত ব্যবস্থাপত্রের প্রতিলিপি নিম্নে লিখিত হইল।

পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র।

প্রশ্ন। দ্বাদশ বর্ষাৎ প্রাগেব স্ত্রিয়ঃ প্রথমর্ত্তু দর্শনে গর্ভাধানস্য দারোপগমনপ্রধানস্য সংস্কারস্যাবশ্যকত্বমাস্ত নবেতি চিন্তনীয়ং।

উত্তর। উচ্যতে অস্তীতি তদাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। "গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা। ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তো মাস্যেতে জাতকর্ম্ম চ।"

জ্যোতিঃ সারে

ঋতৌ তু প্রথমে কার্য্যং পুরুষাখ্যে শুভে দিনে।

মঘা মূলাস্ত্য পক্ষাস্তং ত্যক্ত্বা চন্দ্র বলে সতি।

প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান কর্ত্তব্য। পুরুষ সংজ্ঞক নক্ষত্রে শুভ দিনে মঘা ও মূলা নক্ষত্রের শেষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রাদিক্যে উক্ত অনুষ্ঠান করিবে।

এমন স্পষ্ট প্রমাণের পর যাঁহারা এখনও বলিবেন, প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান করিতে হইবে ইহা শাস্ত্রে বিহিত নাই, তাঁহারা নিতান্তই অমানুষ।

শক্তিসম্ভব কাব্য নামক এক খানি পুস্তক আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার প্রণেতা। মহিষাসুরবধ অবলম্বন করিয়া পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন পুরাণের কাহিনী আজকালকার ভাব ও ভাষায় অনুরঞ্জিত করিয়া যিনি ধর্ম্ম সাহিত্য ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। বিহারি বাবু পুস্তক খানিতে নিজের কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

ভারত ধর্ম্ম মণ্ডলের অধিবেশন আগামী বারে কাশীধামেই হইবে। সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল সে দিন কাশীর মানমন্দিরে এ বিষয়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ কাশীনরেশ ভারত ধর্ম্ম মণ্ডলের অধিবেশন সম্বন্ধে যথাসামর্থ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা আশা জনক সম্বাদ।

বেদ বিদ্যালয়ের মাঘ মাসের আয় ব্যয়।

মুষ্টি ভিক্ষার মূল্য।

শ্রীকালী চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়িয়া	২১৷০
" ঈশান চন্দ্র রায় লক্ষ্মীপুর ময়মনসিংহ	৪৵০
" রমনী মোহন বসু দিনাজপুর	৪৸৶০
" রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়-জিন্দুর রামপুরহাট	১৷০
" জনৈক দুঃখী আর্য্য বালক বাজিতপুর-বর্দ্ধমান	৷০
শ্রীরাজেন্দ্র মোহন বসু আজিমগঞ্জ	৪৷৷৵০
" মতিলাল ভাণ্ডারী টালাবাগান কলিকাতা	৩৲
" গোবিন্দ চন্দ্র সুর সাহেবগঞ্জ বরিশাল	৩৷৷৵০
" মধুসূদন দাস গোয়ালপাড়া	৬৲
" বিপিন বিহারি রায় গয়া	৵০
" হরিমোহন সেনগুপ্ত কাছাড়	৭৷৶০
" হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস কুচবিহার	১৬৲
" লালনচন্দ্র নিয়োগী বেদাজামতৈল পাবনা	২৲
" কাশীনাথ সাহা পাবনা	৷৵০
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী গোয়ালপাড়া	১২৲
" লোকনাথ শর্ম্মা নয়াসড়ক শ্রীহট্ট	১২৲
" গুরুচরণ সেন গুপ্ত পাটুয়াখালি বরিশাল	৪৷৷০
৺ কাশীধামের মাহ অগ্রহায়ণ পৌষ	২৫৷৵১০
	১২৮৸৵১০

এক কালীন দান প্রাপ্তি।

শ্রীগোপীপ্রসন্ন রায় রামপুরহাট	৷৶০
" শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাজিতপুর বর্দ্ধমান	৴০
" যদুগোপাল মিত্র ঐ ঐ	৴০
" কৃষ্ণদাস বসু ঐ ঐ	৷০
জনৈক আর্য্য সন্তান কুচবিহার	১৲
কোনাচদার্য্য সন্তানেন দাঁইহাট	১৲
শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র গয়া	৵০
" হরি মোহন সেনগুপ্ত হরিসভা কাছাড়	১৲
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ভবানিপুর	১৲

মাসিক বৃত্তি।

৺ লবঙ্গ সুন্দরী বৃত্তি কাকিনার মহারাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত	১০৲
শ্রীশিববকস বগলা	১০৲
	২০৲
মোট আয়	১৫৩৷৷৴০

ব্যয়

আচার্য্যগণের দক্ষিণা ছাত্র বৃত্তি ও ছাত্রাবাস খরচ	৮৯৸৴১৫
ছাপাই খরচ	১৲
মাশুল খরচ	১৸৴১০
বাজে খরচ	৩১০
	৯৬৲৫
বাকী	৫৭৷৷১৫

শ্রীতারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

লেখাধ্যক্ষ।

নিম্নলিখিত পুস্তকাদি "বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে" প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুস্তকের নাম।	ডাকমাশুল সহ মূল্য
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরিটীকা, রামানুজ ভাষ্য, স্বামীকৃত টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর টীকা, কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত বঙ্গানুবাদ ও 'গীতার্থ সন্দীপনী' নামক উপাদেয় ভাষাতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত।	৭৲
ভক্তি ও ভক্ত (৩য় সংস্করণ) ...	॥৴০
নিত্য কৃষ্ণেন্দু কৌমুদী (২য় সংস্করণ)	৸০
স্বপ্ন তত্ত্ব (২য় সংস্করণ) ...	৶০
রাম গীতা (মূল ও অনুবাদ) ...	।০
মনিরত্ন মালা (মূল ও অনুবাদ) (৩য় সংস্করণ)	৴০
শ্রাদ্ধতত্ত্ব (৩য় সংস্করণ)	৴১০
হরের্নামৈব কেবলম্ (২য় সংস্করণ)	৴১০
সন্ন্যাসী	৶০
পরিব্রাজকের সঙ্গীত ১ম২য়৩য়৪র্থ ভাগ (২য় সংস্করণ)	৶০
গীতা মাহাত্ম্য (মূল ও অনুবাদ) ...	৴১০
একতারত কাব্য ...	৶০
নীতিরত্ন মালা ...	।০
বক্তৃতা (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত) ...	।৵০
অন্নপূর্ণাদির স্তোত্র (২য় সংস্করণ)	৴১০
গৌড় পাদীয় আগম (বঙ্গানুবাদ সহ)	।৵০
যোগ মকরন্দ (পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ) ...	।৵০
ধর্ম্ম প্রচারক (মাসিক পত্র)	
উত্তম কাগজে মুদ্রিত ... বার্ষিক	৩।৵০
মধ্যম ঐ ঐ	২।৵০
সাধারণ ঐ ঐ	১।৵০
পঞ্চামৃত	।৴০
শিবলিঙ্গ-পূজনবিধি (২য় সংস্করণ)	১।০
শ্রীমতি ও সুমতী উপাখ্যান (গাঁহা ৫২ তাঁহা ৫৩)	৴১০
গীতাঞ্জলি	।০
তন্ত্রতত্ত্ব	৩৲
৺ অন্নপূর্ণার ছোট ছবি (কার্ডের উপর সুন্দর রূপে চিত্রিত—৫০খানির অধিক লইলে ডাকমাশুল লাগিবে না)	৶০
মহ... ...স্বামীর ফটোগ্রাফ	।৵১০
ষট্‌চক্র	॥০

চিঠি লিখিবার পাচরঙ্গা কাগজ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও প্রণাম শ্লোক সহিত

প্রত্যেক প্যাকেটে ৫ দিস্তা।

বড় আকারের মূল্য ।১০ ডাক মাশুল—৴১০ মোট—।৵০
ঐ স্বর্ণের জল দেওয়া মূল্য ।৵১০ মাশুল ৴১০ মোট—॥০
কিছু ছোট আকারের মূল্য ৶১০ মাশুল ৴০ মোট—।১০
ঐ স্বর্ণের জল দেওয়া মূল্য ।১০ মাশুল ৴০ মোট—।৴১০
মূর্ত্তি হীন কেবল পাচরঙ্গা ৫ দিস্তা প্যাকেট
বড় আকারের মূল্য ৶০ মাশুল—৴১০ মোট—।১০
ছোট আকারের মূল্য ৵১০ মাশুল ৴০ মোট—৶১০

নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

যন্ত্রাধ্যক্ষ

কাশী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে পাওয়া যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১৩শ ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১১
১২শ সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	চৈত্র মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রতিসম্বৎসরং ত্বর্ঘ্যাঃ স্নাতকাচার্য্যপার্থিবাঃ।
প্রিয়ো বিবাহ্যশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যৃত্বিজঃ পুনঃ॥

প্রত্যেক বর্ষের মধ্যে গৃহস্থ একবার স্নাতক, আচার্য্য, মিত্র, জামাতা এবং রাজা ইহাদিগের যথাসামার্থ্য সৎকার করিবে। ঋত্বিক্‌কে বর্ষের মধ্যে যজ্ঞাদি প্রত্যেক পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রারম্ভে অর্ঘ্যাদি পুরঃসর পূজা করিবে।

অধ্বনীনোতিথির্জ্ঞেয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।
মান্যাবেতৌ গৃহস্থস্য ব্রহ্মলোকমভীপ্সতঃ॥

পথিক এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণ এই উভয়েই ব্রহ্মলোকেচ্ছু গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ সম্মানযোগ্য।

পরপাকরুচির্ন স্যাদনিন্দ্যামন্ত্রণাদৃতে।
বাক্‌পাণিপাদচাপল্যং বর্জয়েচ্চাতিভোজনম্॥

যে নিমন্ত্রণ অনিন্দনীয়, তাদৃশ স্থল ছাড়া পরের বাড়িতে ভোজন-স্পৃহা নিতান্তই দূষিত। অতিরিক্ত বাচালতা এবং হস্ত ও পদের চাঞ্চল্য ও অতিভোজন পরিত্যাগ করিবে।

অতিথিং শ্রোত্রিয়ং তৃপ্তমাসীমান্তমনুব্রজেৎ।
অহঃশেষং সমাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ॥

বেদপারগ ব্রাহ্মণ যদি অতিথি হন, তবে গৃহস্থ তাঁহাকে যথাবিধি ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। তাঁহার গমন কালে গ্রামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গৃহস্থ তাঁহার অনুগমন করিবেন। দিনাবসানে ইষ্ট মিত্র বন্ধু বান্ধবাদির সহিত একত্রে বসিয়া বার্ত্তালাপ করিবেন।

উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বাগ্নীংস্তানুপাস্য চ।
ভৃত্যৈঃ পরিবৃতো ভুক্ত্বা নাতিতৃপ্ত্যাথ সংবিশেৎ॥

সায়ং সন্ধ্যা, অগ্নিতে হোম ও তাহার উপাসনা এই সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া অনতিরিক্ত ভোজন করিবে। তদনন্তর ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক চতুষ্পার্শ্বে রক্ষিত হইয়া শয়ন করিবে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদাত্মনো হিতম্।
ধর্ম্মার্থকামান্ স্বে কালে যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥

সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত প্রাক্‌কালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া নিজের হিতজনক বিষয় চিন্তা করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গকে যথাসময়ে পরিত্যাগ করিবে না।

বিদ্যাকর্ম্মবয়োবন্ধুবিত্তৈর্ম্মান্যা যথাক্রমম্।
এতৈঃ প্রভূতৈঃ শূদ্রোপি বার্দ্ধকে মানমর্হতি॥

বিদ্যা, কর্ম্ম, অবস্থা, বন্ধু এবং ধন এই সমস্তের সাহচর্য্যেই মনুষ্য মাননীয় হয়। উক্ত বিদ্যাদির যদি

প্রচুর রূপে অধিকারী, তিনি শূদ্র হইলেও বৃদ্ধাবস্থায় মাননীয় হন।

ক্রমশঃ।

যোগশক্তি।

যোগের প্রভাবে কেবল যে লোকের মনের ভাব জানা যায় তাহা নহে। ইহার দ্বারা আরো আশ্চর্য্য ক্ষমতা লাভ করা যায়। যথা, ইচ্ছামত দেহকে স্থূল ও সূক্ষ্ম করণ, অপরের দেহে প্রবেশ করা, ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করা, ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য করা, ইচ্ছার প্রভাবে আশ্চর্য্য ব্যপার সকল সম্পন্ন করা। যে বিদ্যার প্রভাবে এই সকল অদ্ভুত কার্য্য সমাধা হইতে পারে তাহা লাভ করিবার জন্য যে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিবে তাহা বিচিত্র কি? এই জন্যই ত দেখা যায় যে, অনেক অল্প বয়স্ক ব্যক্তি যোগরহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, কেহ শিব সংহিতা পাঠ করিয়া যোগ সাধন করিতেছেন, কেহ বা কোন ক্রিয়াশীল ব্যক্তির উপদেশ মত কার্য্য করিতেছেন। আর একটী প্রলোভনও নবীন যোগী দিগকে এই ক্রিয়ার দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা স্বাস্থ্যভোগ ও দীর্ঘজীবন লাভ। প্রাণায়ামের অন্তর্গত পূরক, কুম্ভক এবং রেচক ব্যতীত কএকটী মুদ্রাপ্রণালী আছে। যথাঃ— [১] বিপরীত-করণী মুদ্রা, অর্থাৎ, মস্তক ভূমিতে রাখিয়া উপর দিকে পদ উত্তোলন করা। এই অবস্থায় শ্বাসরোধ করিতে হয়। ইহার দ্বারা বার্দ্ধক্য শীঘ্র আসিতে পারেনা। [২] ভুজঙ্গমুদ্রা, অর্থাৎ ধরাশায়ী হইয়া অল্প মুখ ব্যাদান করতঃ সর্পের ন্যায় বায়ু গ্রহণ করিতে হয়। ইহা দ্বারা দীর্ঘজীবন লাভ হয়। (৩) খেচরী মুদ্রা, অর্থাৎ একটী প্রক্রিয়ার দ্বারা রসনাকে এরূপ বৃদ্ধি করিতে হয় যে তাহার দ্বারা মুখের ছিদ্ররোধ করা যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা যোগী পুরুষ বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়েন, তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা থাকে না, কোন প্রকার পীড়া হয় না, জরা তাঁহাকে অধিকার করে না। অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, সর্পের বিষ তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। তিনি এই অবস্থাতে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা নূতন২ অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করেন, আবার কর্ণের দ্বারা মধুর স্বর শ্রবণ করেন এবং রসনার দ্বারা মধুর আস্বাদন গ্রহণ করেন। এই ভাবে অবস্থিতি করিয়া যোগী দীর্ঘজীবন ভোগ করেন। যোগ দ্বারা যে এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে তৎপক্ষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এ প্রকার যোগীকে অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময় এক জন যোগীর পরীক্ষা হইয়াছিল। এক জন ইংরেজ এই পরীক্ষা লইয়াছিলেন। এই যোগীকে একটী গুহার মধ্যে রাখা হইয়াছিল। গুহার দ্বার একেবারে বন্ধ করা হইয়াছিল এবং ইহার চারি দিকে প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কএক মাস পরে, গুহার দ্বার ভগ্ন করিয়া এই মহাপুরুষকে বাহিরে আনা হয়। সকলে দেখিল যোগিবরের দেহের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তাঁহার লাবণ্যযুক্ত দেহ সকলকে আনন্দ বিতরণ করিল তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাহাদিগকে বিস্ময়ান্বিত করিল। কিছু কাল পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের সুন্দরবনে এক জন যোগী ধ্যানস্থ ছিলেন। তাঁহাকে খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজবাটীতে আনা হইয়াছিল। তাঁহার জীব উল্টানো ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ এই মহাপুরুষটীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল।

যোগসাধন দ্বারা যে উত্তম ফল ফলিয়া থাকে তাহা দেখা গেল এবং প্রাচীন কালের ঋষিগণ যে আমাদের মঙ্গলার্থে এই সাধন প্রণালীটী প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎ পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রণালী হইতে মন্দ ফলও ফলিয়া থাকে। ঋষিগণও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সাধকগণকে সাবধান করিয়াও দিয়াছেন। দত্তাত্রেয় সংহিতায় এই প্রকার বিবৃত হইয়াছে—

যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেৎ বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ।
তথৈব সেবিতো বায়ুরন্যথা হন্তি সাধকং ॥
প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবে
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বরোগসমুদ্ভবঃ ॥

অর্থাৎ, সিংহ, গজ এবং ব্যাঘ্রকে যেমন অল্পে ২ বশে আনিতে হয়, নতুবা তাহারা রক্ষককে বিনাশ করে, সেই প্রকার বায়ুকেও অল্পে ২ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে হয়, নতুবা ইহা সাধকের সংহারের কারণ হইয়া উঠে। নিয়ম পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে সকল রোগের ক্ষয় হয়, কিন্তু অবৈধ অভ্যাসের দ্বারা সকল প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যোগ অভ্যাস করিবার জন্য যাঁহারা ব্যগ্র, তাঁহাদের এই কএকটী কথা উত্তম রূপে বিবেচনা করা উচিত। আর সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ইহা কত দূর উপযোগী তাহাও একবার আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ সদ্গুরু আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, নিঃস্বার্থ ভাবে শিষ্যের উপকার সাধনে তৎপর এমন গুরু কোথায়? আর, সদ্গুরু পাইলেও, সকলে কি তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিতে পারে? কোন্ পরিমাণে বায়ু গ্রহণ, কোন্ পরিমাণে তাহা পরিত্যাগ এবং কতক্ষণ তাহা দেহ মধ্যে ধারণ করা আবশ্যক এ সমস্ত শিষ্যের ক্ষমতা ও তাহার শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃত্যুর সম্ভাবনা তাহা কি অবলম্বন করা উচিত? বিশেষতঃ যিনি গুরু ভার লইয়া সংসার মধ্যে আছেন, যাঁহার উপর পরিজন গণের প্রতিপালন করিবার ভার, তাঁহার পক্ষে যোগ সাধন কত দূর পর্য্যন্ত সঙ্গত, তাহা একবার বিবেচনা করা উচিত। একথা উঠিতে পারে যে, ঈশ্বরের জন্য কি না ত্যাগ করা যায়। কিন্তু ঈশ্বরকে পাইবার উপায় কি? যোগ সাধনই কি উপায়। যে প্রণালী প্রকৃতির বিপরীত, যাহার দ্বারা শরীরে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা আপামর সাধারণের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। অবশ্য, যাঁহার সংসারে কেহ নাই, তিনি যদি পরহিত ব্রতে ব্রতী হইয়া, আপন জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করত যোগ সাধন দ্বারা অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, এবং এই সাধনের ফলে যদ্যপি আর্ত্তগণের দুঃখ দূর এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনকে সার্থক বলিতে হইবে। এবম্প্রকার কয়েক জন মহাত্মা যদ্যপি গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন না করিয়া, পরহিত-ব্রত জীবন যাপন করেন, এবং যোগ সাধন করিতে২ যদ্যপি তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দেহ নাশ হয়, তাহা হইলে আমাদের কোন কথা বলিবার নাই। কারণ, পর উপকারে আত্মত্যাগই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে নব্যযোগীর দল প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহারা ত সংসার-ত্যাগী নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কতক গুলি ছাত্র, কতক গুলি কর্ম্মচারী। সাধকগণ বলেন যে, যোগসাধনের ফল চারিটী—স্বাস্থ্যসুখ ভোগ, দীর্ঘ জীবনলাভ, অদ্ভুত ক্ষমতা প্রাপ্তি এবং দেবদর্শন। প্রথমটী লাভ করিতে গিয়া সাধক মৃত্যুমুখে পড়িতে পারেন। যিনি সাধনে সিদ্ধ-কাম হয়েন তিনই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, যোগীদের দীর্ঘ জীবন কাহাকে বলে? ইহা কি সেই ভূকৈলাসের রাজবাটীতে আনীত যোগীর দীর্ঘ জীবনের ন্যায় নহে? এ জীবন লাভের ফল কি? যে জীবন পর উপকারে না আসে সে জীবন-ধারণের প্রয়োজন কি? সাধক বলিতে পারেন যে, এ অবস্থায় যোগী ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, এবং ইহা অপেক্ষা আর বাঞ্ছনীয় কি হইতে পারে? অবশ্য, আমরা যোগীকে এ আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করি না। তবে একথা অবশ্যই বলিব যে, এ যোগীর জীবন আমাদের কোন উপকারে আসে না সুতরাং, সংসার আশ্রমীর পক্ষে এ জীবন প্রার্থনীয় নহে। যোগ সাধনের তৃতীয় ফল, অদ্ভুত ক্ষমতা প্রাপ্তি। এরূপ ক্ষমতা পাইয়া যদি কোন যোগী তাহা পরহিত কার্য্যে

প্রযোগ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার জীবন সার্থক বলিয়া পরিগণিত হইবে। নতুবা, যদি নিজের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য, অথবা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এই ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে ইহা লাভ করা বাঞ্ছনীয় নহে। যোগ সাধনের আর একটী ফল দেবতা-দর্শন। প্রাণায়াম কিম্বা কোন মুদ্রা অভ্যাস করিলে যদ্যপি দেবতাকে দর্শন করা যায়, তাহা হইলে এ ক্রিয়া অবলম্বন করা যে প্রার্থনীয়, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি? তাহা হইলে সংসারে প্রয়োজন কি? পরিজনগণকেও এই প্রণালী শিখাইয়া সকলে একত্রে দেবদর্শন করিতে ২ যদ্যপি ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় তাহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু, এত সহজে দেবদর্শন কি সম্ভব? কোন একটী প্রক্রিয়ার দ্বারা কি দেবদর্শনের আশা করা যাইতে পারে? মন নানা প্রকার কুবৃত্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে। এ অবস্থায় কি অন্তঃকরণমধ্যে ভগবানের আবির্ভাব সম্ভাবনা? সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার"? কোন ২ প্রক্রিয়ার দ্বারা এক প্রকার জ্যোতি দেখা যায় এবং কোন ২ বিচিত্র দৃশ্যও নয়নগোচর হয়। কিন্তু সে সমস্তই মানসিক কল্পনা মাত্র। আজ কাল এই সকল ব্যাপার দেবদর্শন বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে এই রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে—"যে ব্রহ্মানন্দানুভূতি নির্ব্বিকল্প সমাধিগম্য, ইন্দ্রিয়গণ সহিত মনের সম্পূর্ণ বিলয় হইলে যে তুরীয় পদার্থের অনুভব হয়, আজ তুমি আমি সংসারের কীট ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস সেই আনন্দ অনুভব করিবার কি অধিকারী? শাস্ত্রে আছে বটে ব্রহ্ম রসস্বরূপ—আনন্দ স্বরূপ, কিন্তু তাই বলিয়া সংসারিক আনন্দ—শারীরিক আনন্দ আর ব্রহ্মানন্দ কি এক জিনিষ? এক রূপ মুদ্রা আছে, চক্ষু বুজিয়া তাহা করিতে হয়। চক্ষুকে রগড়াইলে চক্ষুর ভিতরে যে এক রূপ আলো দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাতেও ঐ শ্রেণীর একটী আলোক দর্শন হয়। গুরু তোমাকে বুঝাইলেন উহাই ব্রহ্মজ্যোতিঃ। তুমি যোগ সম্বন্ধে নূতন ব্রতী। ইংরাজি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইলেও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে তোমার হাতে খড়ি, সুতরাং গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিতে তোমার দ্বিধা নাই" এ সম্বন্ধে আর কিছু অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। লোকে যেন ভ্রমে পতিত না হয়েন, কাঁচকে কাঞ্চন বলিয়া গ্রহণ না করেন। বিশেষতঃ অস্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা শরীরে অনিষ্ট সাধন না করেন এবং যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য মনুষ্য ধরাধামে আসিয়াছে অর্থাৎ ভগবচ্চরণে ভক্তি ও তাঁহার উপাসনা, তাহার প্রতি অবহেলা না হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। যোগজীবন লাভ কাহার না প্রার্থনীয়? যিনি ইহার প্রার্থী, তিনি অবশ্য আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু, তাহা পাইবার জন্য প্রকৃত পথ অবলম্বন করা আবশ্যক—এ হীন জীবনকে পবিত্র করা উচিত।

যোগ সম্বন্ধে, মহাযোগী মহাদেব কি প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলের জানা আবশ্যক বিবেচনায় শিবউপনিষৎ হইতে কএকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বাহ্যযোগং হঠং প্রাহুরান্তরং রাজনামকম্।
বাহ্যযোগাদ্দেহপুষ্টিরান্তরাদাত্মনস্তথা॥ ১৩—২

অর্থাৎ বাহ্য-যোগ হঠযোগ এবং আন্তর যোগ রাজযোগ বলিয়া অভিহিত হয়। বাহ্যযোগের দ্বারা দেহপুষ্টি, এবং অন্তর্যোগের দ্বারা আত্মার পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

আত্মপুষ্টিঃ পরং পুষ্টিঃ দেহপুষ্টির্নবৈ তথা।
পাশবীং বৃত্তিমাহুস্তে কেবলং দেহপোষণম্॥ ১৩—৩

অর্থাৎ, আত্মার পুষ্টিই পরম পুষ্টি, দেহের পুষ্টি পুষ্টির মধ্যেই গণ্য নহে। কেবল দেহের পুষ্টিকে পণ্ডিতগণ পশুবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নির্ব্বাণং লভতে নৈব মানবো যদি শঙ্করি॥

পশুনা সহিতং তস্য পক্ষিণা কিং ভিদা বদ॥ ১৩—৪

অর্থাৎ, হে শঙ্করি! মনুষ্য যদি নির্ব্বাণ লাভ না করে তাহা হইলে পশু ও পক্ষীর সহিত তাহার কি প্রভেদ বল।

আহার নিদ্রাং দেবেশি! তস্মাৎ সংযম্য যত্নতঃ।
সাধয়েৎ পরমং মার্গং ব্রহ্মপ্রাপ্তিসতো ভবেৎ॥ ১৩-৫

অর্থাৎ, হে দেবি! আহার ও নিদ্রা যত্নপূর্ব্বক সংযত করিয়া যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় সেই পথ অবলম্বন করিবে।

পূরকং রেচকং কুম্ভং ত্রিবিধং মার্গমুত্তমম্।
গুরূপদেশবশ্যেন সাধ্যশ্চৈব যথাবিধি॥ ১৩—৬

অর্থাৎ, পূরক রেচক এবং কুম্ভক, যোগের এই তিনটী পথ উৎকৃষ্ট। গুরুর উপদেশ লইয়া যথাবিধি ইহার সাধনা করিবে।

স্বয়ংসাধ্য প্রবৃত্তশ্চ বিঘ্নযোগঃ পদে পদে।
রোগাশ্চ বিবিধা নিত্যং নাস্তি কার্য্যবিচারণা॥ ১৩—৭

অর্থাৎ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া গুরুর সাহায্য না লইয়া এই ক্রিয়া সাধন করিলে, পদে ২ বিঘ্ন হয়, নানা রোগের উৎপত্তি হয় এবং কার্য্য সমাধা হয় না।

জিতনিদ্রো জিতাহারো জিততন্দ্রস্তথৈব চ।
নির্লোভো নিস্পৃহশ্চৈব নিঃসঙ্গো যোগমাবসেৎ॥ ১৩-৮

অর্থাৎ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আহারকে জয় করিয়া, এবং লোভ ও স্পৃহাহীন হইয়া সঙ্গ ত্যাগ করত যোগাসনে বসিবে।

ইন্দ্রিয়াণি বশে যস্য রিপবশ্চ বশে তথা।
স যোগী পণ্ডিতৈঃ প্রোক্তো নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি॥ ১৪১

অর্থাৎ, হে পার্ব্বতি! ইন্দ্রিয় সকল ও রিপুগণ যাহার বশীভূত, নিশ্চয় জানিও পণ্ডিতেরা তাহাকেই যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাদেবের এই উপদেশ বাক্য গুলি আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, মুক্তিলাভই যোগসাধনের উদ্দেশ্য। শরীরের পুষ্টিসাধন, দীর্ঘজীবন, কিম্বা যোগ সিদ্ধি সম্বন্ধে কোন প্রলোভন বাক্য থাকা দূরের কথা, দেহের পুষ্টিকে অতি অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আর, যে যোগের দ্বারা আত্মার পুষ্টি হয়, অর্থাৎ, রাজযোগ, তাহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। প্রাণায়ামকে উৎকৃষ্ট পথ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তৎপ্রক্ষে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুরুর উপদেশ ব্যতীত এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, রোগের উৎপত্তি হয়, একথা মহাদেব পরিষ্কার রূপে বলিয়াছেন। এই উপদেশ হইতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, যোগসাধন গৃহী ব্যক্তির উপযোগী নহে। মহাদেব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে যোগাসনে বসিতে হইলে, আহার ও নিদ্রাকে জয় করা, লোভ পরিত্যাগ করা এবং সঙ্গহীন হওয়া আবশ্যক। এ সকল কি গৃহী ব্যক্তির দ্বারা সমাধা হইতে পারে? অবশেষে, তিনি পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় সকল ও রিপুগণ যাহার বশীভূত, সেই প্রকৃত যোগী।

যাঁহারা পার্থিব সিদ্ধি লাভের জন্য যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, অহঙ্কার তাঁহাদের একটী প্রবল রিপু হইয়া উঠে। অন্যের কথা আর কি উল্লেখ করিব, জ্ঞানদেব স্বয়ং এক সময়ে এই রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া ছিলেন। যখন মুক্তাবাই চাঙ্গদেবের আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিলেন, জ্ঞানদেব বলিলেন, মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করা আর বিস্ময়জনক কি? তোমাকে আমি মৃত সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিতেছি, ইহার প্রভাবে তুমিও এই রূপ ব্যাপার সমাধা করিতে পারিবে। অহঙ্কারের প্রভাব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ধর্ম্মসাধনের পক্ষে ইহা একটী প্রধান বিঘ্ন। এই জন্য মোক্ষার্থী ব্যক্তির কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া উচিত নহে। সাম্প্রদায়িকতা, অহঙ্কারকে বিশেষ রূপে প্রশ্রয় দিয়া থাকে। এক সময়ে, আমাদের উদার হিন্দুধর্ম্ম নানাশাখে বিভক্ত হইয়া অতি হীন ভাবে প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিছু কাল পূর্ব্বে, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কি সামান্য বিদ্বেষ ভাব ছিল?

শাক্ত বৈষ্ণবের প্রতি এবং বৈষ্ণব শাক্তের প্রতি, কি সামান্য অত্যাচার করিত? এই অত্যাচার যে কেবল মনুষ্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। বৈষ্ণব শাক্তের দেবতাকে এবং শাক্ত বৈষ্ণবের দেবতাকে নিন্দা করিত। ইহা অপেক্ষা আর সমাজের অধিক হীনতা কি হইতে পারে? ভিন্ন২ সম্প্রদায়ের কি ভিন্ন২ দেবতা আছে! ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু, বিদ্বেষ বুদ্ধিতে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে, আর এ প্রকার ভাব দেখা যায় না। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর এবং গাণপত্য, এই যে কএকটী সম্প্রদায়, যাহা এক সময়ে বিস্তীর্ণ হিন্দুধর্ম্মকে সংকীর্ণ করিয়াছিল, তাহা এখন বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন ত সকলেই পঞ্চ উপাসক। এখন যিনি কৃষ্ণ, তিনি কালী, যিনি হরি, তিনি হর, এই ভাবটী হিন্দু মাত্রেই গ্রহণ করিয়াছে। এমন উদারতার সময়ে, কোন নূতন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কথা শুনিলে মনে বড় বেদনা হয়।

আজ কাল কএকটী যোগীসম্প্রদায়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা আপন ২ দল পুষ্টি করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইঁহাদের কার্য্য সকল গোপন ভাবে সমাধা হইয়া থাকে। আমাদের হিন্দুধর্ম্ম অতি উদার। ইহার মধ্যে যোগী ও তপস্বী, সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী, সকলেই স্থান পাইয়া থাকেন। যাঁহার যেমন ক্ষমতা, যাঁহার যে রূপ অধিকার, তিনি সেই মত ধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন। আমাদের পূজনীয় ঋষিগণ, সকল বিষয় অতি উদার ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন বিষয় গোপন রাখেন নাই। যোগশাস্ত্র অপ্রকাশিত নাই। ইচ্ছা করিলেই তাহা অধ্যয়ন করা যায়। তবে গুরু উপদেশ ব্যতীত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়া তাঁহারা বারম্বার সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সকলে আপন আপন ক্ষমতা বুঝিয়া কার্য্য করুন, তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি হইতে পারে না। পুণ্যতোয়া গঙ্গা চারি দিকে প্রসারিত হইয়া, পাপী, তাপী, সাধু, অসাধু, পণ্ডিত, মূর্খ, নর, নারী সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু, তাঁহার বক্ষে চড়া পড়িতে দেখিলে কাহার মন না ব্যথিত হয়? সেই প্রকার, গঙ্গার ন্যায় উদার হিন্দুধর্ম্ম, সম্প্রদায় রূপ চড়া কর্ত্তৃক সংকীর্ণ ভাব ধারণ করিতে দেখিলে মনে বড় ক্লেশ হয়। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধ ভারতকে উচ্ছিন্ন করিয়াছে। বিগত ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া জ্ঞান লাভ কর। সকলে এক মত অবলম্বন কর, এক পথে ভ্রমণ কর। নিজ ২ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য ভূমিতে বিচরণ কর। সাধারণের শুভ কার্য্যে সকলে বদ্ধপরিকর হও। আর্য্যদের সকলই গিয়াছে, কেবল এক সনাতন ধর্ম্ম আছে। এ ধর্ম্ম অতি উদার, ইহাকে আর সংকীর্ণ করিওনা।

ক্রমশঃ।

সাধনা ও তর্ক।

সংসারে সকল পদার্থেরই দুইটি পৃষ্ঠ। ধর্ম্মেরও দুইটি পৃষ্ঠ আছে। একটি সাধনা, অপরটি তর্ক। একটি অনুষ্ঠান, অপরটি মত। একটি কার্য্য, অপরটি ধর্ম্মপ্রসঙ্গালাপ। ধর্ম্মকার্য্যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত কথা। ধর্ম্মের বার্ত্তালাপেও পুণ্য হয়, কিন্তু অপুণ্যও হইতে পারে। ধর্ম্মের সুতর্ক সাধুকে সুপথে লইয়া যায়, ধর্ম্মের কুতর্ক অসাধুকে অপথে লইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মের তর্ক আশঙ্কাশূন্য নহে। সাধনা ধর্ম্মের বিজ্ঞান রূপ অংশ, তর্ক ধর্ম্মের দর্শন রূপ অংশ। বিজ্ঞান কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করে। দর্শন কেবল চিন্তা লইয়া লীলা করে। যাহারা দার্শনিক, তাহারা প্রায়ই কার্য্যপরায়ণ হয় না, হাতে হেতেলে কোন কার্য্য করিতে পারে না। যাহারা কার্য্যশীল শিল্পনৈপুণ্যপরায়ণ বৈজ্ঞানিক, তাহারা দার্শনিকের মত চিন্তাশীল হইতে পারে না। কার্য্যশীল অথচ চিন্তাশীল শিল্পী অথচ দার্শনিক,

এমনতর লোক জগতে বড়ই বিরল। অথচ এই রূপ লোক দ্বারাই জগতের উন্নতির আশা করা যায়। যাঁহার দর্শন বিজ্ঞানের চরণচুম্বন না করে, যাঁহার দর্শনপক্ষী উচ্চ চিন্তার আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া বিজ্ঞান শিল্পময় কার্য্যক্ষেত্রের পিঞ্জরে আবদ্ধ না হয়, তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে জগতের বিশেষ উপকার সাধিত হয় না। সেই রূপ যাঁহার ধর্ম্মতর্ক, ধর্ম্মবিচার সাধনার পদরেণু শিরোধার্য্য না করে, তাঁহার তর্ক সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। সাধনা ও তর্ক পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যখন অনুকূল পথে চালিত হয় তখনই কল্যাণলাভ হইবার সম্ভাবনা। কেবল ন্যায়শাস্ত্রের কূটতর্কে ধর্ম্ম জগতের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল বৈষ্ণব বাবাজির কর্ত্তাভজা ধরণের গোঁড়ামিময় সাধনা লইয়া আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা নাই। ন্যায়ের তর্ক ও বৈষ্ণবের সাধনা পক্ষীর দুই পক্ষের মত এক যোগে এক ভাবে মিলিত হইলে তবে ধর্ম্মসাধক ধর্ম্মের উচ্চ আকাশে উড্ডীন হইতে পারেন। ধর্ম্মের সাধু তর্ক বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করে, ধর্ম্মের সাধনা হৃদয় প্রস্তুত করে। বিকৃত হৃদয়ে অধর্ম্মময় প্রবৃত্তির তরঙ্গ উঠিলে ধর্ম্মের মননময় তর্ক তাহা নিবারণ করিতে পারে, ধর্ম্মের হৃদয় কিন্তু প্রস্তুত হইলে তাহাতে অধর্ম্মবিকারের বুদ্বুদ উঠিতেই পারে না। সুতরাং তর্ক ও সাধনা দুইই চাই। সাধনা হৃদয়ের নিজস্ব, তর্ক বুদ্ধিবৃত্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা পাতাইয়া থাকে। হৃদয় ও বুদ্ধি এই দুইটিকে পরিষ্কৃত করিতে হইলে সাধনা ও তর্ক দুইই চাই। সাধনায় হৃদয় শতবার বিধৌত হইলেও তীব্র প্রবৃত্তির তাড়নায়--বলীয়ান্ প্রলোভনের বেগে তাহা যখন বিচলিত হইয়া উঠে, তখন তর্কের—বিচার বুদ্ধির চরণে শরণ লইতেই হইবে। মহাদেবের ন্যায় মহা-যোগীন্দ্র পুরুষের চিত্ত যখন পার্ব্বতীকে সম্মুখে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সাধনামার্জ্জিত বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পুনরায় সংযমশক্তিকে আহ্বান করিয়া মহাদেবকে চিত্তপ্রকৃতিস্থ করিতে হইয়াছিল। কুন্তীর মত পরমসুন্দরী মাতাকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের হৃদয় বিচলিত হইত। কিন্তু ললাটফলকে অঙ্কিত জল-রেখার ন্যায় তাঁহার বিবেকবুদ্ধিমার্জ্জিত হৃদয়ে তাহা ক্ষণমধ্যে বিলীন হইয়া যাইত। সুতরাং দুর্ব্বল হৃদয়কে বলবৎ করিবার জন্য বিচার-বুদ্ধিরও আবশ্যক।

কিন্তু সাধনাবিরহিত যে বিচার-বুদ্ধি, তাহা ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রশস্ত নহে। তাহা কেবলই তর্ক। সাধনাকে সঙ্গিনী করিয়া যে বিচার-বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহারই ফল অমৃতময়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে কেবল দার্শনিক তর্ক লইয়া যাঁহারা সাধনাময় আর্য্যধর্ম্মকে টলাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। দার্শনিক তর্কে সাধনার ধর্ম্ম কখনও উড়িতে পারে না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রসূত তর্ক দ্বারা একজন হিন্দুশাস্ত্রের পণ্ডিত বিচলিত হইতে পারেন, কিন্তু একজন হিন্দুধর্ম্মের সাধক তাহাতে বিচলিত হইবেন কেন? মিষ্টান্নের মধুর রস যে নিজে আস্বাদ করিয়াছে, তাহাকে, মিষ্টান্ন অম্লরসপূর্ণ, একথা শত তর্ক যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেও সে তাহাতে বিশ্বাস করিবে কেন? আর্য্যধর্ম্ম কেবল চিন্তা বা তর্কের ধর্ম্ম নহে, ইহা সাধনার ধর্ম্ম—অনুভবের সামগ্রী। ধর্ম্মতত্ত্বের গুহ্য প্রহেলিকা উন্মেষ করিতে গিয়া আজ হয় ত তোমার চিন্তায় কুলাইয়া উঠিল না, কিন্তু সেই চিন্তাচক্ষুকে সাধনারাগরঞ্জিত করিয়া লইলে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধীরে ২ উদ্ভাসিত হইয়া আসিবে।

চিন্তা কখনও সাধনাকে পরাজিত করিতে পারে না। দর্শন কখনও বিজ্ঞানকে হঠাইয়া দিতে পারে না। দর্শন যুক্তি আঁকিয়া যে সত্যের প্রতিবাদ করিবে, বিজ্ঞান আঁকে আসলে হাতে হেতেলে যন্ত্র তন্ত্রে প্রস্তুত করিয়া সে সত্যকে যদি আবিষ্কৃত করে, তবে দর্শনকে বিজ্ঞানের কাছে মাথা হেঁট করিতেই হইবে। তোমার বিশুষ্ক মস্তিষ্কের চিন্তা আজ ধর্ম্মের যে সত্যকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিল, সাধক সাধনার বলে আজ যদি

সে সত্যকে জীবন্ত জাগ্রত করিতে পারেন, তবে তোমার চিন্তা নিতান্তই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। চিন্তা আনুমানিক, সাধনা প্রত্যক্ষ। অনুমিতি অপেক্ষা প্রত্যক্ষের বল বেশী। অনুমিতি বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষকে উড়াইয়া দিতে পারে না। বরং প্রত্যক্ষ দ্বারাই অনুমিতি বাধিত হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যাপার সাধনাকে অনুমিতি রূপ চিন্তা কখনই উড়াইয়া দিতে পারে না। তাই চিন্তা বা তর্ক অপেক্ষা সাধনা বলীয়সী।

সাধনাবিরহিত যে চিন্তা বা দর্শন শাস্ত্র, তাহাতেই নাস্তিকতা আসে। বর্ত্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষায়, ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চায় বেশীর ভাগ নাস্তিকতারই মূলে জল সিঞ্চন হয় কেন? সাধনার সংস্পর্শ নাই বলিয়া। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে—দার্শনিকতার সঙ্গে সাধনার যোগ থাকিলে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হয়। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই অপূর্ব্ব সংযোগের পরিণাম। তিনি যেমন দার্শনিক পণ্ডিত, তেমনই সাধক ছিলেন। তিনি যেমন তার্কিক সেই রূপ অনুভূতিমান্ জ্ঞানীও ছিলেন। তাই তাঁহার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্ম্ম দার্শনিক যেমন মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন, সাধক সেই রূপ হৃদয় ভাণ্ডার ভরিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধগণের পাণ্ডিত্যে কিছুই ত্রুটি ছিল না, তর্ক বিতর্কে সামর্থ্যের কিছুই অভাব ছিল না, তথাপি তাঁহাদের পতন হইল কেন? সাধনার অভাব হইয়াছিল বলিয়া। তাই বলিতেছি, সাধনাবিরহিত চিন্তা ধর্ম্মরাজ্যে প্রশস্ত নহে।

সাধকের সাধনাকৌশলের কাছে তার্কিকের তর্ক দাঁড়াইতে পারে না। কুস্তিবাজের সামান্য কৌশলে বীরমল্লকেও পরাজিত হইতে হয়। সাধকের কথা অন্তর্ভেদিনী। মর্ম্মতলে গিয়া সে কথা আঘাত করে। তার্কিকের তর্ক কিছু ক্ষণের জন্য মস্তিষ্ককে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক চমকের ন্যায় তাহা নিমেষের মধ্যেই কোথায় বিলীন হইয়া যায়। সাধকের বজ্রগম্ভীর ভাষায় পাষণ্ডকেও দমিয়া যাইতে হয়। তিনি যে দেশের গুপ্ত সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে অপার্থিব ধামের অপূর্ব্ব মাধুরী তাঁহার আত্মায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই তেজ, সেই ভাব, সেই আলোকে তিনি যাহা বলেন, তাহা অন্যের পক্ষে হিতকর আপ্তবাক্য হইয়া উঠে, তিনি যাহা অনুষ্ঠান করেন, তাহা অন্যের পক্ষে আদর্শ হইয়া উঠে। তিনি যে স্থানে বাস করেন, তাহা তীর্থস্থান হইয়া উঠে। তাঁহার প্রতি নিশ্বাসে আকাশ পবিত্র হয়, তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপে ধরিত্রী ধন্যা হয়। আর্য্যধর্ম্ম এই সাধকের ধর্ম্ম বলিয়াই এত দিন টিকিয়া রহিয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের সাধনাংশ যেমন সাধকের ধন, ইহার দর্শনাংশও সেই রূপ তার্কিকের যুদ্ধক্ষেত্র। আর্য্যধর্ম্মের সাধনাংশই প্রাণ, তর্ক তাহার বাহ্য শরীর। সাধনা আর্য্যধর্ম্মের গৃহলক্ষ্মী, দর্শন তাহার পরিরক্ষক অভেদ্য দুর্গ। আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সাধনা ও তর্কের এই রূপই সম্বন্ধ।

আইন পাস হইল।

সিলেকট কমিটি সহবাসের আইন পাস করিয়া দিয়াছেন। শীঘ্রই বড়লাটের সহি হইয়া আইন কার্য্যে পরিণত হইবে। ইংরাজরাজ আমাদের আন্দোলন গ্রাহ্য করিলেন না। আমাদের এত চীৎকার এত আর্ত্তনাদ এত সকরুণ বিলাপ এ সমস্তের উপর গবর্ণমেণ্ট একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। আইন পাস হইবার সময় বড়লাট বলিয়াছিলেন এ আইনে ধর্ম্মে আঘাত পড়িবেনা। আমরা অকাট্য শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছি গর্ভাধান রূপ অবশ্যকরণীয় ধর্ম্মে বিষম আঘাত পড়িবে। আইন-মন্ত্রী স্কোবল সাহেব ডাক্তারদের প্রবল মত আইনের পক্ষে যেমন খাড়া করিয়াছিলেন, সেই রূপ আইনের বিপক্ষেও কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের মত প্রদর্শিত হইয়াছে। আইনে বালিকার উপকারের পরিবর্ত্তে বিষম অপকার হইবে, সমাজে

ইষ্টের পরিবর্ত্তে ভীষণ অনিষ্ট হইবে, ইহা সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায় আইনের পক্ষপাতী। কিন্তু দেশের গণ্য মান্য শিক্ষিত গণ দেশের চারিদিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আইনের বিরুদ্ধে সভা সমিতি করিয়া সে কথা যে নিতান্তই অলীক, তাহা বারম্বার প্রমাণিত করিয়াছেন। ইংরাজরাজ ভোটের খাতির করিয়া থাকেন, এই ভোটপ্রথার উপরিই বর্ত্তমান ব্রিটিশরাজের রাজনীতির মূলতত্ত্ব অবস্থিত। অধিকাংশ লোকের যাহা মত, তাহাই ব্রিটিশ দরবারে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই মূলনীতির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই দেশের অধিকাংশ লোকই যে আইনের বিরোধী, তাহা দেখইবার জন্য কলিকাতা গড়ের মাঠে অভূতপূর্ব্ব জনসাগরের সৃষ্টি হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের কোন আইন প্রতিবাদ করিবার জন্য এমন সভা আর কখনও হয় নাই ইহা বিপক্ষগণও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং উদ্যোগ, আয়োজন প্রযত্ন চেষ্টা যত দূর করিতে হয়, তাহা হইয়াছে, কোন দিকে কিছু মাত্র ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু হায়! এমন সার্ব্বজনিক প্রতিবাদের উপর, প্রজামণ্ডলীর এমন দারুণ হৃদয়বিদারক ক্রন্দনের উপর ইংরাজরাজ একটিবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। এ রোরুদ্যমান দীন দুঃখী প্রজাকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া গবর্ণমেণ্ট আশ্বাসের কণিকা মাত্রও প্রকাশ করিলেন না। প্রজামণ্ডলীকে দারুণ মর্ম্মযন্ত্রণার জ্বালামালায় পোড়াইয়া গবর্ণমেণ্ট আইন পাশ করিয়া দিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বে এমন অত্যাচার আর কখনও হয় নাই।

ন্যায় যুক্তি তর্ক বিচার বিবেকের ভিতর দিয়া সুমীমাংসা করিয়াইত আইন প্রণীত হইয়া থাকে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টকেত এই আইনের প্রণয়নে কোন রূপ ন্যায়, যুক্তি বিচার আশ্রয় পূর্ব্বক সুমীমাংসা করিতে দেখিলাম না। গবর্ণমেণ্ট আইন পেশ করিবার সময় আইনের অনুকূলে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা ত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই তীব্র আন্দোলনে আইন সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাহার ত কিছুই সদুত্তর পাইলাম না। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্‌। কেবল একতরফা যুক্তি লইয়া নিজের মনোমত যাহা খুসি সিদ্ধান্ত করার নামই ত স্বেচ্ছাচার। সুতরাং স্কোবল সাহেবের এ আইন "স্বেচ্ছাচার" ছাড়া ত আর কিছুই নহে। এই রূপ স্বেচ্ছাচারকে আইন শব্দে অভিহিত করা হয় কেন? এই রূপ স্বেচ্ছাচার বিধিবদ্ধ করাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তবে লোক জনকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ইহার জন্য সিলেক্টকমিটি কেন? ইহার বিচারের জন্য আবার সিলেক্টকমিটিকে ছয় সপ্তাহ সময় দেওয়া কেন? স্বেচ্ছাচারের আবার বিচার কি? স্বেচ্ছাচারের সহিত ন্যায় যুক্তি তর্ক বিতর্কের আবার সম্বন্ধ কি? এ সমস্তই লোক দেখান মাত্র। ইহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী নাই।

গবর্ণমেণ্টের কাছে আমরা পরাজিত হইয়াছি, আমাদের আন্দোলন গবর্ণমেণ্টকে টলাইতে পারে নাই ইহা সত্য, কিন্তু আমাদের এ পরাজয়ে লাভ ভিন্ন লোকসান কিছুই হয় নাই। পরাজিত হইলে লোকে বলহীন হইয়া থাকে। আমাদের কিন্তু এ পরাজয়ে একতার বল শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। সহস্র গুণ শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। বঙ্গ, বোম্বাই মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রদেশ হইতে হিন্দু মাত্রেই ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া সমস্বরে আইনের প্রতিবাদ করিয়াছে। সকলেই একভাবে এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পর সহানুভূতির সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া এই ধর্ম্মনাশক আইনের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়াছে। এই আইনের সূচনা

হইয়াছিল বলিয়াই আজ ভারতের লক্ষ ২ হৃদয় ধর্ম্মের অমৃতময় বন্ধনে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ভারতের লক্ষ ২ প্রাণ মিলিত হইয়া এক মহাপ্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষা ভাব আচার ব্যবহারের পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মরক্ষার্থ উন্মুখ হইয়া আজ হিন্দুস্থানী বাঙ্গালি পঞ্জাবী ও বোম্বাইবাসী সকলে, ভাই ২ মিলিত হইয়া আইনের বিরুদ্ধে একতানে সমবেদনার মর্ম্মগাথা ঘোষিত করিয়াছে। কংগ্রেসের মত শত রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাণের ভিতর হইতে যে সহানুভূতির পবিত্র উৎস বহাইতে পারে নাই, এই মহা-আন্দোলন তাহা করিয়াছে। অন্তস্তল উদ্‌ভিন্ন করিয়া সহানুভূতির পবিত্র স্রোতস্বতী আজ দিগ্‌দিগন্ত ভাসাইয়া দিয়াছে। আজ বোম্বাই হইতে সম্বাদ আসিল, ভাই বঙ্গবাসী! আইনের বিরুদ্ধে আমরা যে প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা এখানকার দৈনিক ইংরাজি পত্র সমূহ মুদ্রিত করিতে চাহে না, তোমরা আমাদের প্রতিবাদ মুদ্রণ বিষয়ে সাহায্য কর। যাই এ সংবাদ পৌঁছিল, আর অমনি সাপ্তাহিক অমৃত বাজার পত্রিকা দৈনিক আকারে পরিণত হইলেন, দেশের প্রতিবাদবার্ত্তা গাহিবার জন্য পত্রিকা কলেবর বৃদ্ধি করিলেন। দেশের এক কোণে যে সুরে তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, সেই সুরে সুর দিয়া সেই তালে তাল দিয়া সমগ্র দেশের হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিতেছে, ইহা কি কম শুভ লক্ষণ? এক প্রদেশ হইতে যে সমবেদনার ধ্বনি উঠিতেছে, সহস্র কণ্ঠে ভীমভৈরব নির্ঘোষে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি দিয়া দিগন্ত প্রান্তর কাঁপাইতেছে, ইহা ভাবিতেও প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। সুতরাং আইন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কাছে পরাজিত হইয়াও আমরা লাভবান্ হইয়াছি। যে আইনে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে স্ত্রী পুত্রবতী হইলে স্বামী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইবে, এই রূপ জুলুমী আইন কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যৎ বলিতে পারে। পূর্ব্বেকার দশম বৎসরের সহবাস আইনের যে দশা হইয়াছে ইহারও সেই দশা হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যদ্ গর্ভে নিহিত। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত গর্ভে এই আইনের ফল যাহাই কেন নিহিত থাকুক, ইহার বর্ত্তমান ফল কিন্তু মঙ্গলময়। যে আইনের ফলে বহুদিনের বিচ্ছিন্ন পৃথগ্‌ভূত জাতি পুষ্পমালার ন্যায় এক সূত্রে গ্রথিত হইল, যে আইনের ফলে বহুদিনের বিস্মৃত পুরাতন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধ পুনর্নবীন হইয়া সতেজে জাগ্রত হইয়া উঠিল, সে আইন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কাছে পরাজিত হইয়াও আমরা একরূপ বিজয় লাভ করিয়াছি। সুতরাং আন্দোলনে আমাদের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় নাই। শক্তিক্ষয়ের পরিবর্ত্তে প্রভূত শক্তির বৃদ্ধিই হইয়াছে। আইন পাস হইলে এই শক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইবে। বিপদ্ নহিলে মনুষ্য জাগ্রত হয় না, অভাব না হইলে মনুষ্য চেষ্টাপরায়ণ হয় না। আজ এই আইন রূপ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই সমগ্র ভারতবর্ষ জাগিয়া উঠিয়াছে, অচেতন ভারতবর্ষ সচেতন হইয়াছে। সুতরাং এ বিপদ্ হয় ত বিধাতা আমাদের মঙ্গলের জন্যই আনিয়াছেন। কে এখন শপথ করিয়া বলিতে পারে, ইহার পরিণামে কেবল অমঙ্গলই হইবে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রথমে যাহাকে বিপদ্ বলিয়া মনে করে, হয় ত পরিণামে তাহাতেই মহতী সম্পত্তির আবির্ভাব হয়। ইহাই ত বিধাতার বিচিত্র লীলা। দুঃখই এক সময় সুখের কারণ হইয়া উঠে, আপাতত অমঙ্গলই এক সময়ে ভাবী মঙ্গলের নিদান হয়। আমাদের ধারণার বহির্ভূত প্রদেশেই বৈধ নিয়ম ক্রিয়া করিয়া থাকে। সুতরাং নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। প্রতিবাদের উদ্‌যোগ আয়োজন শতগুণ বাড়াইতে হইবে। বিলাত পর্য্যন্ত চেষ্টা দেখিতে হইবে। সে চেষ্টা যে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহারই মধ্যে হিন্দু-ভাবে জাহাজাদির আয়োজন করিয়া বিলাত যাত্রার প্রস্তাব হইয়াছে। আমরা জানি দেশের মান্য গণ্য

রাজা মহারাজগণ সওদাগর আদি ধনিগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ রূপে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। যে জাতিকে অর্থডক্স্ বলিয়া স্থিতশীল—প্রাচীন ভাবের পক্ষপাতী বলিয়া নিরুৎসাহ নিশ্চেষ্ট জড় বলিয়া শত্রুরা ঘৃণা করিয়া থাকে, আজ সেই জাতির উদ্যোগ উৎসাহ কার্য্যকুশলতার বিরাট ঘটা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইবে। জগৎ দেখিবে, ঘোর নিশ্চেষ্টতার স্তূপের মধ্যে কি জ্বলন্ত জীবনী শক্তি এত দিন বিরাজ করিতে ছিল, নিবিড় জড়তার প্রস্তরময় আবরণের ভিতর অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় তড়িৎশক্তি কি সূক্ষ্ম ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। আজ নিরুৎসাহের ভস্মস্তূপ ভেদ করিয়া উৎসাহের অগ্নিময়ী জ্বালামালার এ সহসা বিকাশ দেখিয়া জগৎ বিস্মিত হইবে। ধর্ম্মে আঘাত লাগিলে আর্য্যজাতি কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠেন, দাবদহন-দগ্ধ মৃগবৃন্দের ন্যায় কিরূপ ইতস্ততঃ ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন আজি তাহার অগ্নিপরীক্ষা দিবার জন্য হিন্দু প্রস্তুত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন আইন পাস করিয়া সকল লেঠা চুকিয়া যাইবে। এ আন্দোলনের প্রবল ঝটিকা নিঝুম মারিয়া যাইবে, আর কেহই তখন উচ্চ বাচ্য করিবে না। কিন্তু আমরা যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি, তাহাতে প্রতিবাদ আরও সহস্র-ধারে বাড়িয়া উঠিবে। বঙ্গদেশে যেমন প্রতিবাদ হইতেছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও দ্বিগুণ প্রতিবাদাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় প্রায় নয় দশ লক্ষ লোক একত্রিত হইবে। এই মহামেলাতেও আইনের তীব্র প্রতিবাদ হইবে। সংসারাসক্ত গৃহস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অনাসক্ত সাধু সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সকলেই তুমুল প্রতিবাদে যোগ দিবেন। কুমার পরিব্রাজক মহামেলাক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বভাবসুলভ বাগ্মিতা বলে সাধারণকে উৎসাহিত করিবেন। দেশের লোকে যতই আইনের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিবে, ততই উত্তেজনা দিন ২ বাড়িয়া উঠিবে। তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নগর-শালায় নবদৃশ্য।

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারি শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় অত্রত্য নগরশালায় (কলিকাতার টাউন হলে) কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। ২ টা না বাজিতে২ সমুদায় চেয়ার অধিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ৩ টার পূর্ব্বেই জনস্রোত এত বেশী হইয়াছিল, যে বিশেষ নিমন্ত্রিত গণের আসন আর রাখা গেলনা। মঞ্চ হইতে সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় হল লোকাকীর্ণ। বিপুল জনতা। কিন্তু সকলে স্তব্ধ, ও উৎকণ্ঠিত। বহু কষ্টে জনস্রোত ঠেলিয়া ৪টা বাজিতে ১৫ মিনিটের সময় বক্তা, ও সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত দামোদর বর্ম্মণ প্রভৃতিকে স্ব স্ব আসনে সমাসীন করা হইল। অমনি বজ্রনির্ঘোষে করতালি পড়িতে লাগিল। তখন সভাপতি সকলকে উচ্চরবে পরিব্রাজক মহোদয়ের পরিচয় অনাবশ্যক হইলেও নিজ তৃপ্তি জন্য দুই চারি কথায় বলিলেন, সন্ন্যাসী অনেকেই হয়, কিন্তু ঈশ্বর প্রেমের সঙ্গে সমগ্র মানব জাতির জন্য এত ভালবাসা কার? এই জন্য ইনি ধন্য পুরুষ। আরও বুঝাইলেন বক্তব্য বিষয়টী সার্ব্বভৌমিক; সুতরাং প্রত্যেকেরই পক্ষে উপযোগী। ঘন ২ করতালির মধ্যে তিনি উপবেশন করিলেন। তখন বক্তা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার সমক্ষে যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, কলিকাতা নগরবাসীর অদৃষ্টে সেরূপ কমই ঘটিয়া থাকে। তাঁহার সম্মুখে বামে দক্ষিণে, পশ্চাতে ভিত্তিদেশ পর্য্যন্ত লোকে লোকে পুরিয়া গিয়াছে, দাঁড়াইবারও স্থান আর নাই; অথচ সকলেই তাঁহার বচনামৃত

পান জন্য লালায়িত, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বাক্ এবং উদ্গ্রীব। বারম্বার করতালি বর্ষণের বিশ্রাম হইলে বক্তা ভগবানের স্তোত্র পাঠ করিয়া স্বীয় বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই নিস্তব্ধ জনশ্রেণী ভেদ করিয়া তাঁহার হৃদয়গ্রাহী, ওজস্বী, যুক্তি ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতাধ্বনি স্নিগ্ধ গম্ভীরতার মধ্য দিয়া চারিদিকে অমৃত স্রোত বিস্তার করিতে লাগিল। লোকসমূহ যেন মন্ত্রমুগ্ধ। তিনি ঈষৎ হাসিলে অমনি চারিদিকে হাস্যের তরঙ্গ বহিয়া যায়; উচ্চ অঙ্গের চিন্তাপ্রসূত কথার অবতারণা করিলে গাম্ভীর্য্য ছড়াইয়া পড়ে, আবার তাঁহার ভগবৎ প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিলে প্রেমাশ্রু মন্দাকিনীর বিমল ধারা চারিদিক প্লাবিত করিতে থাকে। মাননীয় স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র ও সভাপতি মহোদয় দ্বয় অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। সে চিত্র অভাবনীয়, স্বর্গীয়, বিমল। বিষয় ছিল, মানবের সারসম্পত্তি। ইহার সারসংগ্রহ পুস্তকাকারে শীঘ্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা, তাই বক্তৃতার বিশেষ বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। "বঙ্গবাসী" অনেকটা ইহার বিবরণ দিয়াছেন। বক্তা বুঝাইয়া ছিলেন মানবের মানবত্ব যে সকল বিশেষ২ শক্তির গুণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত অনুশীলন হইলে মানব, প্রাণী, জগতের এমন কি প্রকৃতি রাজ্যের, প্রকৃত রাজা হইতে পারেন। তখন তাঁহার রাজ্য প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়; অহিনকুল, মৃগ মৃগরাজ তখন বিদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি কাহারও তখন ক্লেশের কারণ না হইয়া অভয়ের কারণ হয়েন। উদাহরণ স্থলে শিবজীর দীক্ষা প্রসঙ্গে, রামদাস স্বামীর নিকট শিবজীভীত পক্ষিগণের আশ্রয় গ্রহণ বৃত্তান্ত বুঝাইলেন। এই সকল শক্তির কিরূপে অনুশীলন ও বিকাশ করিতে হয় তাহা বুঝাইতে২ প্রসঙ্গ ক্রমে ধীবরের সাধুসঙ্গফল, এবং শঙ্করাচার্য্যের মাতার বৈকুণ্ঠলাভ উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং শিক্ষা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার স্ত্রীপ্রকৃতি গঠন ও সংরক্ষণের অনুপযোগিতা ও তাহার প্রতীকারোপায় ব্যাখ্যা করিলেন। সর্ব্বশেষে সেই সকল শক্তির চরম বিকাশে কিরূপে গৌণী ভক্তি, জ্ঞান, দর্শন, এবং ভগবৎকৃপা দৃষ্টি পরে২ লাভ হইলে পরা ভক্তি রূপিণী "সারসম্পত্তির" অধিকার হয় বিশদরূপে তাহা বুঝাইলেন। পরা ভক্তি ব্যাখ্যা কালে ভক্তি হিল্লোলে সকলেরই প্রাণ সুশীতল হইয়াছিল। হরি হরি ধ্বনি হলের আকাশ মণ্ডল বারম্বার ভেদ করিয়া সহস্র কণ্ঠের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছিল। ধন্য পরিব্রাজক! তোমার জয় হউক! আবার অবিশ্রান্ত করতালি; বক্তা উপবেশন করিলেন। তখন সভাপতি আবার উঠিয়া সকলকে বুঝাইলেন, "বাঙ্গলাভাষায় এমন ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা হইতে পারে তিনি জানিতেন না। বঙ্গভাষার শত্রুগণের নিকট এ ভাষার এই শক্তির পরিচয় করিয়া দিয়া তিনি মাতৃভাষাকে কৃতার্থ করিলেন। তিনি সার্থকজন্মা, এত কষ্টে স্থানাভাবে যুবক মণ্ডলী নিস্তব্ধ ভাবে বক্তৃতামৃত পান করিয়া বুঝাইলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী, এ সম্বন্ধেও তাঁহার ভ্রম অপনীত হইল। তাঁহার অমূল্য উপদেশ গুলি সকলে যেন চিরকাল হৃদ্গত করিয়া রাখেন ও যাইবার পূর্ব্বে আবার হরিধ্বনি বারম্বার করেন ইহাই তাঁহার শেষ প্রার্থনা"। হরিধ্বনি অমনি সহস্র২ কণ্ঠ ভেদ করিয়া উঠিল। সভাপতি বসিলেন। শ্রীযুক্ত দামোদর বর্ম্মন তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। সভার নিঃস্বার্থ উদ্যোগী গণ বিশেষ ধন্যবাদার্হ। টাউনহলে বাঙ্গলা বক্তৃতা, এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও হরি ধ্বনি প্রচার এই প্রথম। রমেশ বাবু বক্তার সহিত কথোপকথনে, এরূপ বক্তৃতা যে বাঙ্গলা ভাষায় হয় তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই বলিলেন। সকলেই পরিব্রাজক মহোদয়ের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম পুষ্কর তীর্থে বাবু মূলচাঁদ ও বাবু রাধেলাল নামক সওদাগর মহোদয় দ্বয়ের আর্থিক সাহায্যে সাধু সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি সংস্কৃত পাঠশালাও স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আশুতোষ পাণ্ডা ও গম্ভীরানন্দ স্বামী মহাশয়ের আন্তরিক অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসনীয়।

আগামী চৈত্র সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে যে দ্বাদশবার্ষিকী মহাকুম্ভমেলা হইবে, তদুপলক্ষে ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের উদ্যোগে মহর্ষিমণ্ডলের এক অধিবেশন হইবে। ৺ কাশীধামের বিখ্যাত পরমহংস শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী উক্ত মণ্ডলের সভাপতি হইবেন। মেলায় পাঁচ ছয় লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইবে। তাঁহাদের পবিত্র সমাগমে মহর্ষিমণ্ডল এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় আড়াই মাস কাল কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানে প্রায় ৪০।৫০ টি বক্তৃতা করিয়া ৺ কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই হরিদ্বারের কুম্ভমেলোপলক্ষে যাত্রা করিবেন।

বেদ বিদ্যালয়ের ফাল্গুন মাহার আয় ব্যয় শঃ ১৮১২

মুষ্টি ভিক্ষা।

শ্রী নাই চরণ ভট্ট কাছাড়	১৷০
" হরলাল সেন গুপ্ত ধুবড়ি	৮৷৷/০
" মথুর নাথ সেন গুপ্ত কবিরাজপুর ফরিদপুর	৪৷৷০
" কুঞ্জবিহারি মুখোপাধ্যায় ধানকুরা ঢাকা	৸৶০
" চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুমকা	১৲
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট	৪৸৶১৫
" কালীপদ পাল ঐ শ্রীফলা	৷১৫
" হরিদাস সরকার জেরয়াডেঙ্গি পূর্ণিয়া	১৲
" বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত মাটবেড়িয়া বরিশাল	১৷৷০
" বিপিন বিহারি রায় গয়া	৶০
" পাঁচকড়ি সরকার মহম্মদবাজার বিরভূম	৩৫৲
" অক্ষয় চন্দ্র আচার্য্য কুমড়াবাদ দুমকা	৩৸০
" প্রসন্নকুমার দাস দত্ত শিলচর	২০৲
" যোগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস কলিকাতা	।০
" ভুবন মোহন সেন আমিনপুর ঢাকা	৩৷৶০
" কালী নাথ বসু শ্রীনগর ঢাকা	৫৸৶০
" জয়রাম দাস গোয়ালপাড়া	৬৷৷০
" মধুসূদন দাস ঐ	৮৲
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশাল	১৫৲
" কালীকুমার ভট্টাচার্য্য সাহানগর মুর্শিদাবাদ	৫৷১৫
" পঞ্চানন্দ দাস ঐ ঐ	২৸৶৫
" নবীনচন্দ্র দে হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট	৩/০
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়িয়া	৫৷৶০
শ্রী কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় কুণ্ডলা বীরভূম	১৯৲
" রাখাল দাস সেন গুপ্ত জামালপুর	২৷৶০

এককালীন দান।

ষ্টেশন মাষ্টার সকরগলি	২৲
শ্রী গোলকচন্দ্র শিলচর	১৲
জনৈক দাতা ৺ কাশীধাম	৪৲
শ্রী জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় যশহর	১৲
" জনার্দ্দন সিংহ যশহর	১৲
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর	১৲
" তারকনাথ দ্বিবেদী গড্ডা	।/১
" বিনোদ গোপাল চট্টোপাধ্যায় গোয়ালপাড়া	২৲
" রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৺ কাশীধাম	৫৲
" সুরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র গয়া	৶০

মাসিক বৃত্তি।

শ্রীযুক্ত মহারাজা দ্বারভাঙ্গা	২৯৲১০
৺ লবঙ্গ সুন্দরী দেবীর বৃত্তি কাকিনীয়া	১০৲
	২৫৬৸৶১৫

খরচ।

বৃত্তি দক্ষিণা ও ছাত্রাবাস	৬৩৸১৲
ছাপাই খরচ	৷০
মাশুল খরচ	।৶১০
বাজে খরচ	২৸৶০
	৬৭৷৷৶৫
মজুদ তহবিল	১৮৯।/১০

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়